সন্ধেবেলার মানুষ

সমরেশ মজুমদার

যিনি বলেছিলেন লাবণ্য না থাকলে সৌন্দর্য পূর্ণতা পায় না, তিনি একটু কম জানতেন। কুন্তী সুন্দরী একথা ওঁর কুকুর মদনও জানে। কুন্তী যে লাবণ্যবতী তা আয়নাগুলো সোচ্চারে জানিয়ে দেয়। আর এরকম সুন্দরী লাবণ্যবতী এই শহরে অন্তত আট হাজার একুশজন আছেন অথবা থাকতে পারেন। তবে কিনা ওইসব রূপসীদের অধিকাংশই বোকা বোকা অথবা স্বার্থপর। আর সেই স্বার্থপরতা আড়াল করার কোনও কায়দাও তাঁদের জানা নেই। কুন্তী এই ভিড় থেকে অনেক দূরের। তাঁর সৌন্দর্য আছে, লাবণ্য তো আছেই, সেই সঙ্গে জড়িয়ে আছে অহংকারের হালকা প্রলেপ। আর এটাই তাঁকে একদম আলাদা করে রেখেছে মিছিল থেকে।

অহংকার মানেই সবজান্তাপনা নয়, নাক তোলা কিন্তু আকাশে রেখে দেওয়া নয়। ওঁর অহংকার একটা হালকা পারফিউমের মতো, শরীর জড়িয়ে থাকে কিন্তু ঠিক কোনখানে তার উৎস সেটা টের পাওয়া যায় না। সেই রসজ্ঞের দুর্ভাগ্য যিনি কুন্তীকে দ্যাখেননি।

এখন কুন্তী পঁয়তাল্লিশ। ফিল্মস্টাররা যে বয়সটায় পৌঁছলে আর আড়াল খোঁজার চেষ্টা করেন না সেই বয়স। যে বয়সের মহিলাকে এককালে বৃদ্ধা বলা হত, দু'দশক আগে প্রৌঢ়া বলে চিহ্নিত করা হত সেই বয়সে পৌঁছনো কুন্তীকে দেখে শ্বাস ভারী হয়, এই যা। চট করে যুবতী বলতে নিশ্চয়ই বাধবে কিন্তু প্রৌঢ়া কিংবা বৃদ্ধা নয়, বাংলায় এর কোনও সঠিক শব্দ না থাকার জন্যে আফসোস হবে। কুন্তী নিজের পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি শরীরটাকে যত্নে রেখেছেন।

একটুও ধুলো নয়, আগাছা জন্মাতে দেবার সুযোগই নেই, সার এবং জলের সঙ্গে যত্ন সর্বত্র ছড়ানো। আর এই কারণেই সমবয়স্কাদের সঙ্গ কুন্তী এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন।

খামোকা কোনও নারীকে ঈর্ষান্বিত করে কষ্ট দিয়ে কোনও লাভ নেই। পৃথিবীতে যে যার মতো থাকুক।

কুন্তীর ভোর হয় ভোর হবার অনেক আগে। তখনও তাঁর এই আট

www.boiRboi.blogspot.com

তলার ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে কলকাতাকে ভুতুড়ে দেখায়। সারা রাত জ্বলে থাকা আলোগুলো নিভে যাওয়ার জন্যে ছটফটিয়ে মরে। সেই আলো না মরা ভোরেই কুন্তী হাঁটতে বের হন। শার্ট প্যান্ট জুতো পরে লিফট চালিয়ে নীচে নামতেই দারোয়ান সেলাম করে গেট খুলে দেয়। গুরুসদয় রোড ধরে বালিগঞ্জ সার্কুলারে পড়ে চক্কর দিয়ে ফিরে আসাটা এখন অঙ্কের মতো হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম সময় কমানোর চেষ্টা করতেন রোজ। এখন করেন না। দু-একবার হঠাৎ উৎসাহী কোনও পুরুষ তাঁকে বিরক্ত করলেও বৃষ্টি না হলে এইভাবে হেঁটে যাওয়া থেকে তিনি বিরত হননি।

মাটিতে রোদ নামার আগেই ফ্ল্যাটে ফিরে আসা, একটু বিশ্রাম। তারপর মিনিট পনেরো আসন। প্রতিদিন আসন করার সময় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো জানিয়ে দেয়, আমরা ঠিক আছি, ঠিক আছি। আর সেটা জানতে পারলেই মন ভাল হয়ে যায়। তারপর স্নান, বেশ সময় নিয়ে আরাম করে। বিন্তি লেবু চা আর সেঁকা পাঁউরুটি এনে দেয় খবরের কাগজের সঙ্গে। সকাল আটটা পর্যন্ত কুন্তী টেলিফোন ধরেন না।

এই ফ্ল্যাটটিতে কুন্তীর সারা সময়ের সঙ্গী বিন্তি। মাত্র সতের বছর বয়সে বিন্তির ইউটেরাসে টিউমার হবার জন্যে ওটাকে বাদ দিতে হয়েছিল। এ জীবনে আর মা হতে পারবে না বলে ও বিয়ে করেনি। সঠিকভাবে বলতে গেলে কেউ বিয়ে করতে চায়নি। এ ব্যাপারে বিন্তিরও রাখঢাক নেই। চেহারা-পত্তর ভাল বলে যে সব পুরুষ বিন্তির দিকে এগোয় তাদের সে সাফ বলে দেয় তার অঙ্গ-হানির কথা। বিন্তির এখনও ধারণা পুরুষরা মেয়েদের কামনা করে শুধু সন্তানের বাবা হবে বলে।

কুন্তীর কাছ থেকে এই ব্যাপারটাকে ঘেন্না করতে শিখে গিয়েছে সে। তার শিক্ষায় এমন অনেক কিছু ব্যাপার ঢুকে গিয়েছে যে যার ফলে অন্য কারও বাড়িতে কাজ করা সম্ভব নয়।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এবাড়িতে কাজের লোক কখনই বঞ্চিত হয় না। কিন্তু কী খাওয়া-দাওয়া? কুন্তী লাঞ্চ করেন অফিসে। বাড়ি থেকে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ঠিক নটায় বেরিয়ে যান। সেই ব্রেকফাস্টে থাকে একটা ডিমের পোচ আর দুটো ফল। লাঞ্চে একটা চিকেন স্টুই তার

www.boiRboi.blogspot.com

কাছে আসে। ছুটির দিনে একরাশ স্যালাড, চার চামচ ভাত, দু-টুকরো মাছ অথবা মাংস এবং ফল। রাত্রে ফলটা বাদ যায় বদলে আসে সেঁকা মাংস। এই খেয়ে খেয়ে বিন্তিরও অভ্যেস তৈরি হয়ে গেছে। কুন্তীর কাছে সে জেনেছে বাঙালিরা অপ্রয়োজনে বেশি খায়।

শরীরে যা প্রয়োজন তার বহুগুণ জিভের আরামের জন্যে ভেতরে ঠেসে দেওয়া হয়।

বিন্তি সেটা এখন ভাল করে বুঝে গেছে। এই ফ্ল্যাট বাড়ির অন্য যে কোনও কাজের লোকের চেয়ে তার ফিগার ঢের ঢের ভাল। কুন্তী বাড়িতে যখন থাকে না তখন তার সময় চমৎকার কাটে টিভির সামনে বসে। কেব্‌লে সিনেমা তো আছেই, বিবিসি, স্টার টিভির খুঁটিনাটি এখন তার মুখস্থ। আর এসব কারণেই ডায়মণ্ডহারবারের গ্রামের বাড়িতে যেতে হলে দিনে দিনেই ফিরে আসে সে।

এই হল কুন্তীর সংসার। সারাদিন একরকম, সন্ধের পর একটু আলাদা। অন্তত বিন্তির চোখে তো তাই। বাড়ি ফিরে স্নান সেরে এক কাপ লেবু-চা আর চিকেন স্যাণ্ডুইচ খেয়ে কুন্তী কোনদিন টিভির সামনে বসলেন অথবা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টালেন। বন্ধুরা কেউ এলে টেবিল সাজানো হয়। সেইরাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে বিন্তি। দিদি-মণির আড্ডা ভাঙতে কখনও বারোটা অথবা কাছাকাছি। কেউ না এলে ঠিক দু-গ্লাস মদ্যপান করেন কুন্তী। বিন্তির প্রথম প্রথম পছন্দ হত না, এখন আর কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। এক দুপুরে একলা বাড়িতে সে জিভে ঠেকিয়ে অবাক হয়েছিল। এমন বিশ্রী গন্ধওয়ালা জিনিস মানুষ কী করে আনন্দের সঙ্গে খায়!

আজ সকাল থেকেই ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি। দিনটা ছুটির বলেই মনে আলস্য এল। ব্যালকনির বেতের চেয়ারে বসে খবরের কাগজ নামিয়ে রেখে চোখ থেকে চশমা সরাল কুন্তী। প্লাস ওয়ান পয়েণ্ট ফাইভ। সামনের আকাশে ময়লাটে মেঘের ভিড়। হঠাৎই নিজেকে নিঃসঙ্গ বলে মনে হতে লাগল তাঁর।

পৃথিবীতে একটা কাছের মানুষ নেই যাকে বলা যায় দ্যাখো তো আমার পিঠে কী হয়েছে?

বিন্তি আছে অবশ্য। কিন্তু এই একাকিত্ব বিন্তিকে দিয়ে পূর্ণ হবে না কোনওদিন।

www.boiRboi.blogspot.com

একজন পূর্ণ পুরুষের জন্যে প্রচণ্ড টান অনুভব করলেন তিনি।

বাইশ বছর বয়সে মৃণালের সঙ্গে ভালবাসা এবং বিয়ে। ভাবপ্রবণতার বেলুনে সমস্ত পৃথিবী তখন আড়ালে। মা বাবা বাধা দেননি। বস্তুত ওঁরা কখনই কুন্তীর কোনও কাজে বাধা দেননি। কিন্তু তিনবছর যেতে না যেতেই মৃণালের চরিত্রের অনেক অসংগতি তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। ওর কোনও সমস্যা নিয়ে জানতে চাইলে বিরক্ত হয়ে বলত, এসব তুমি বুঝবে না। মুখে না বললেও বুঝিয়ে দিত মহিলাদের সম্পর্কে তার ধারণা কী! তখন চাকরি করতেন না কুন্তী। আর না চাইলে টাকা দিত না মৃণাল। টাকার জন্যে হাত পাততে পারতেন না কুন্তী। মৃণালের কিছু বন্ধুবান্ধব এমন বোকা বোকা কথা বলত যে প্রকাশ্যেই তাদের সমালোচনা করতেন তিনি।

এইসব ব্যবধান বাড়তে বাড়তে একসময় বাক্যালাপ বন্ধ হল। তারপর আলাদা হয়ে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত ডিভোর্স। এখন এতদিন বাদে মৃণাল সম্পর্কে তাঁর কোনও স্পষ্ট ভাবনা নেই। কিন্তু তাঁর জীবনের প্রথম পুরুষ। শরীরের আনন্দ নিয়ে কথা উঠলেই তাই মৃণালের কথা মনে পড়ে।

তিরিশে পৌঁছে রঙ্গন এল। এতদিন জীবন পাল্টে গিয়েছে অনেক। ছেলে বন্ধু ছিল কয়েকজন কিন্তু রঙ্গন এসে সবাইকে আড়াল করে দিল। রঙ্গন কম কথা বলে এবং মেয়েদের স্বাধীনতায় হাত দেয় না। সে ব্যবসায়ী। বিদেশ থেকে মুদ্রা আসায় ভারত সরকারের প্রিয় পাত্র। সকালে ইচ্ছে হলে দুপুরেই দিল্লি হয়ে সিমলা চলে যেতে পারে।

একটু আনপ্রেডিকটেবল, কিন্তু রঙ্গনকে স্বামী হিসেবে পেয়ে ভাল লেগেছিল কুন্তীর।

মদ্যপানের অভ্যেসটা রঙ্গনের কাছ থেকে পাওয়া। ফাইভ স্টারের মেনুকার্ড যার মুখস্থ সে এক রবিবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল বনগাঁর দিকে। ঝাঁ ঝাঁ রোদে গ্রামের একটা মেঠো দোকানে ভাত ডাল তরকারি খেল শালপাতায়, কুন্তীকেও খেতে হয়েছিল বলা ঠিক হবে না, কুন্তী নিজেই খেয়েছিল। রঙ্গন বলেছিল, ইচ্ছে না হলে খেয়ো না, গাড়িতে পার্কস্ট্রিটের খাবার আছে। রঙ্গনকে রোমান্টিক বলা যায় যদি কেউ তার সঙ্গে জীবন যাপন করে। কিন্তু ক্লাবে, পার্টিতে সে গম্ভীর, উদাসী। বাড়িতে গেস্ট এলে কিছুক্ষণ বাদে হাই তুলে ঘুমোতে চলে যায়। আবার

www.boiRboi.com

সকালে উঠেই পাশপোর্ট নিয়ে ভিসা করতে ছুটে যায় নায়াগ্রার রামধনু দেখবে বলে। রঙ্গন তাঁকে অনেক দিয়েছে। এই বিত্ত, কর্তৃত্ব, বিশাল ব্যবসা এবং জয়ন্তীকে। তের বছরের জয়ন্তী শান্তিনিকেতনে পড়ছে। মায়ের চেহারা আর বাপের স্বভাব পেয়েছে।

জয়ন্তীর যখন চার আর কুন্তীর ছত্রিশ তখন আটত্রিশ বছরের রঙ্গন এক সকাল বেলায় ঘুরে আসছি বলে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং আর ফেরেনি। যাওয়ার সময় ও পার্সটাও নিয়ে যায়নি। সাত লক্ষ টাকা যে আয়কর দেয় তার পরনে ছিল পাজামা এবং পাঞ্জাবি। যত রকমের খোঁজ খবর সম্ভব সব বিফলে গিয়েছে, পুলিশ শেষপর্যন্ত হার মেনেছে, মানুষটা উধাও তো উধাও। কেন রঙ্গন এভাবে না জানিয়ে চলে গেল তার উত্তর আজও পাননি কুন্তী।

সত্যি কথাটা হল, রঙ্গনের অভাব তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না এখন। ব্যাপারটা মনে এলে জ্বালা আসে। কতখানি স্বার্থপর হলে মানুষ এইভাবে চলে যেতে পারে। তাঁকে তো বটেই মেয়েকেও এক ফোঁটা গুরুত্ব দিতে চায়নি রঙ্গন। টেবিল, চেয়ার, খাট, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, শেয়ার, ইউনিট ট্রাস্ট অথবা ব্যবসার মতো তাঁদেরও ফেলে যেতে পেরেছিল অনায়াসে। সবচেয়ে আফসোস হয় যখন মনে পড়ে চলে যাওয়ার ঠিক আগের রাত্রে চূড়ান্ত মদ্যপান করে শরীরের আনন্দ খুঁজতে চেয়েছিল রঙ্গন। ও ব্যাপারে সে কখনই দক্ষ ছিল না, সেই রাত্রেও আলাদা কিছু হয়নি। আর পরদিন সকালে চা খেয়ে কাগজ পড়ে লোকটা চলে গেল। কেউ কেউ সন্দেহ করেছিল এর পেছনে কোনও অপরাধচক্র আছে, কিন্তু সেটা প্রমাণিত হয়নি, কেউ বলেছে রঙ্গন সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, সেটাও একধরনের সান্ত্বনা।

কিন্তু রঙ্গনের কথা মনে এলে অপমানবোধ আসে। কুন্তী এটা এড়াতে পারেন না! ন'টা বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল। মাঝে মাঝে একাকিত্ব প্রবল হলে বাঁধ ভাঙার বাসনা হয়। রঙ্গনের উধাও হওয়ার পরবর্তী পর্যায় নিয়ে আইনজ্ঞরা তাঁকে সুপরামর্শ দিয়েছেন। সেগুলো ঠিকঠাক মানতে গিয়ে তাঁকে সংযত থাকতেই হয়েছে।

কুন্তী উঠলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল দিন গড়ালে মেঘের দুপুর এলে যন্ত্রণা তীব্রতর হবে।

এইসময় কেউ যদি তাঁকে সঙ্গ দিত! কাকে বলা যায়! চোখের

www.boiRboi.blogspot.com

সামনে পরিচিত পুরুষদের মুখ ভাসল। এদের বেশিরভাগই বিবাহিত।

বিবাহিত অথচ কুন্তী সম্পর্কে আগ্রহী। এদের কেউ কেউ বিদ্বান, স্মার্ট, অর্থবান অথচ কুন্তীর সামনে এলেই মদনের মতো লেজ নাড়তে থাকে। বোকা বোকা স্বভাবের পুরুষদের তিনি দুচক্ষে দেখতে পারেন না। আবার কেউ কেউ অতিরিক্ত স্মার্ট। মেয়েদের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে শরীরে মেদ জমতে দেন না। এই ওপর চালাক লোকগুলো কাছে এলেই তাঁর অ্যালার্জি হয়। ওদের ভেতরের ফাঁপা বেলুনটাতে পিন ফুটিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। তৃতীয় দলের পুরুষরা আসেন গম্ভীর মুখে। হুঁ হাঁ ছাড়া শব্দ বাড়ান না। যেন এই পৃথিবীর সব কিছু তাঁরা জেনে বসে আছেন! এঁদের দেখতেই কেষ্ট বলে মনে হয়। আর নয় বছর ধরে এইসব থকথকে কাদার মধ্যে পাঁকাল মাছ হয়ে বেঁচে থেকে তিনি যে বর্ম বানিয়ে ফেলেছেন তা হুট করে আজ খুলে ফেলবেন কী করে?

টেলিফোনটা বাজল। বিন্তি গিয়ে রিসিভার তুলল। কথাবার্তা বলে এসে জানাল, 'নাম বলল অণিমা, তোমার বন্ধু ছিল নাকি!'

অণিমা! কে অণিমা? হঠাৎ এক তরুণীর মুখ মনে এল। ফর্সা ঝকঝকে, চোখে চশমা।

ওঁদের ক্লাসের প্রথম হওয়া মেয়ে। অণিমা সেন। সেনই তো। সে এতদিন পর হঠাৎ?

কুন্তী আবিষ্কার করলেন তাঁর খুব ভাল লাগছে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে বললেন, কুন্তী বলছি। আমি ঠিক—;' ইচ্ছে করেই থামলেন তিনি। ওপাশের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, 'কুন্তী, আমি অণিমা, আমরা একসঙ্গে পড়তাম প্রেসিডেন্সিতে। অনেক কাল হয়ে গেল অবশ্য, চিনতে পারা যাচ্ছে কি?'

'ও ব্বাবা! তুমি!' কুন্তী এবার বোঝালেন তিনি চিনেছেন, 'কী খবর বল? হঠাৎ?'

'তেমন কিছু নয়। চৈতিকে মনে আছে?

আমাদের সঙ্গে পড়ত, ইন্টার কলেজ ড্রামায় বেস্ট অ্যাকট্রেস হয়েছিল, হ্যাঁ চৈতি বলেছিল তুমি নাকি এখন বিশাল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্ত্রী। ক্ষমতায় থাকলে চাও বা না চাও লোকে তোমার নাম জানবেই। আমার এক দেওর সাংবাদিক। তাকে বলতে সে তোমার অফিস আর

www.boiRboi.blogspot.com

বাড়ির ফোন নম্বর এনে দিল।'

'ভদ্রলোকের নাম ?'

'সর্বজিত সেন।'

কুন্তীর মনে পড়ল। খুব ঝকঝকে চেহারার মধ্য তিরিশের এক সাংবাদিক। অর্থনীতি নিয়ে ভাল কাজ করছেন। কয়েকবার লোকটাকে দেখেছে সে। দেখা অবধি! সাংবাদিকদের নিয়ে তাঁর কোনও কালে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সেই লোকটা অণিমার দেওর!

'তোমার দেওর দেখছি দারুণ করিৎকর্মা।'

'তা বলতে পার। ওয়াশিংটনে একটা বড় কাজের অফার পেয়েছে অথচ বলছে যাবে না। যাহোক, তুমি বিরক্ত হচ্ছ না তো ?'

'বিন্দুমাত্র না। কী করছ এখন ?'

'যা কপালে ছিল। ছাত্রী পড়াই আর সংসার চালাই। তোমার স্বামীর···।'

'ওটা এখন ইতিহাস।' ঝটপট থামিয়ে দিলেন কুন্তী।

'ও! আসলে আমি একটা মেয়েকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছি।'

'মেয়ে ?'

'হ্যাঁ। বছর তিরিশ বয়স হবে। বেশি পড়াশুনাও নেই। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য ওর চাকরি দরকার। এখনই। কলেজে পড়ালে চাকরি দেবার ক্ষমতা থাকে না। তোমাকে যদি অনুরোধ করি তাহলে কি অন্যায় হবে ?'

সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়ে গেলেন কুন্তী।

প্রয়োজন ছাড়া যে এই টেলিফোন নয় জানার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা শেষ হয়ে গেল। তিনি নিচু গলায় বললেন, 'আমার না বলা উচিত। চাকরি করার যোগ্যতা মেয়েটির আছে কিনা তাও যাচাই করার প্রয়োজন এই মুহূর্তে আমার নেই। কিন্তু তুমি বলেই সেটা বলতে বাধছে।'

'অনেক ধন্যবাদ ভাই। ওকে কবে পাঠাব ?'

ঝুলিয়ে রেখে লাভ নেই। আজকের এই অলস দিনটার কিছু সময় না হয় অতীতের দায় মেটাতেই কাটুক। কুন্তী বললেন, 'আজই। দুপুরে।' বলে রিসিভার রেখে দিলেন। তাঁর মনমেজাজ আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

www.boiRboi.blogspot.com

দশটা নাগাদ দ্বিতীয় টেলিফোন এল, 'কেমন আছ ?'

কুন্তী কথা না বলে রিসিভার কানে ঠেকিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইলেন ! ওপাশে কিছুক্ষণ অপেক্ষা, তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন, কথা বলতে ইচ্ছে না করলে রিসিভার নামিয়ে রাখতে পার !'

'আমি ভাবতে চেষ্টা করছিলাম অজস্র কণ্ঠস্বরের থেকে তোমারটা কত আলাদা ! হ্যাঁ, বল।

'ভাল নেই। একদম ভাল নেই।'

'কেন ?'

'উত্তরটা বোকার মত শোনাবে। তোমার বউ কোথায় ?'

'পাশের ঘরে।'

'ওকে নিয়ে চলে এসো এখানে।' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন কুন্তী। এবং তারপরেই আবার ডায়াল করলেন। বেছে বেছে আরও তিনজন পুরুষকে আমন্ত্রণ জানালেন সস্ত্রীক তার ফ্ল্যাটে আসতে। শেষপর্যন্ত আয়নার সামনে বসে বিন্তিকে ডাকলেন, 'আজ একটু বেহিসাবি হব। তুমি বাজারে যাও। ইলিশ মাছ নিয়ে এসো।'

'ইলিশ ?' বিন্তির চোখ বড় হল। এতদিনে সে জেনেছে ইলিশ শরীরের কিছুই উপকার করে না, 'তুমি ইলিশ খাবে ?'

'হ্যাঁ। একদিন না হয় খেলাম। অনেকটা আনবে। আরও আটজন খাবে। মাথা পিছু চার পাঁচ পিস। পেটি দেখে নেবে। আর খিচুড়ি বানাবে।'

'খিচুড়ি ?' হাঁ হয়ে গেল বিন্তি এবং পরক্ষণেই বলল, 'আমি খাব না।'

'কেন ?'

'এমনি।'

টাকা দেওয়াই থাকে। বিন্তি চলে গেলে নিজেকে সাজালেন কুন্তী। সাজতে বসলে তাঁর মন ভাল হয়ে যায়, আজও হল। বিন্তির কথা ভেবে তিনি হেসে ফেললেন। তাঁর এই বেহিসাবি খাওয়া মেয়েটা মানতে পারছে না।

একদিনই তো !

সাজ শেষ হয়ে গেলে সেলারে গেলেন তিনি।

প্রচুর বিদেশি মদ থরে থরে সাজানো।

www.boiRboi.blogspot.com

ভদকাও আছে। দুপুরে ভদকা এবং বিয়ার।

বিয়ারের বোতল আরও কয়েকটা আনানো উচিত। টাকা বের করে বাইরের ঘরে গিয়ে আবদুলকে হুকুমটা দিয়ে দিলেন। আবদুল রঙ্গনের আমলের কুক কাম বেয়ারা। এখন বৃদ্ধ কিন্তু মোগলাই রান্নার মাস্টার। কিন্তু এ বাড়িতে আজকাল ওকে রাঁধতে হয় না।

বারোটা নাগাদ অতিথিরা এসে গেল।

জোড়ায় জোড়ায়। দুপুর বলেই সবাই হালকা পোশাকে এসেছে। মহিলারা ফ্ল্যাটে ঢুকেই কুন্তীর প্রশংসায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর। কুন্তী যেন দুহাতে ফুল কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন অথচ মুখে নির্লিপ্তের হাসি ওঁদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছিল। ট্রলিতে ভদকা বরফ জল এবং বোতলে বিয়ার। আবদুল পরিবেশন করে যাচ্ছে। বিন্তি ফিরে এসেছে দুজোড়া ইলিশ নিয়ে। বাইরে টিপটিপিয়ে বৃষ্টি চলছে। এই সময় অমিত জানতে চাইল, 'এই হঠাৎ আমন্ত্রণের কারণ জানা যাক?'

সোফায় বসা কুন্তীর দুহাতে গ্লাস, মুখ ওপরে তোলা, ঠোঁটে ঈষৎ কুঞ্চন, 'এখন নয়, আরও পরে। তোমাদের ফিরে যাওয়ার আগে।'

এসব আড্ডা জমে গেলে হোস্ট এবং গেস্টের আলাদা কোনও ভূমিকা থাকে না। কিছুক্ষণ পরেই কুন্তী আলাদা হয়ে যেতে পারলেন।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তিনি অতিথিদের দেখছিলেন। এই চারজন পুরুষই মোটামুটি সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী। কিন্তু এঁরা এমন অনেক ইঙ্গিত দিয়েছেন যাতে স্পষ্ট তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ অসীম। সঙ্গে স্ত্রী নিয়ে এসে এরা পোষমানা শেয়ালের মতো আচরণ করছে। অমিতকে তিনি স্বচ্ছন্দে বলে দিতে পারতেন, আজ সকাল থেকে নিজেকে খুব একা লাগছিল। পেনফুল একাকিত্ব। মনে হচ্ছিল একজন পুরুষ মানুষকে সঙ্গী হিসেবে দরকার।

তোমাদের যে কোনও একজনকে এক ডাকলেই সেটা পেয়ে যেতাম। কিন্তু সেই পাওয়ায় চুরি-চুরি অনুভূতি। তোমরা মদ্যপান করো।

নেশা হোক। তারপর তোমাদের স্ত্রীদের সামনে যদি উত্তরটা ছুঁড়ে দিই তখন দেখতে হবে কী আচরণ করো। ওই দেখার জন্যেই এই আমন্ত্রণ।

দুপুর যখন মাঝপথে, বিয়ার এবং ভদকা যখন অনেকটাই পেটে তখন

www.boiRboi.blogspot.com

আবদুল এসে জানাল একটি মেয়ে দেখা করতে এসেছে। আবদুলের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে কুন্তী তাতে অণিমার নাম পড়লেন। তাড়িয়ে দিতে গিয়েও পারলেন না।

অতিথিদের কাছ থেকে কয়েক মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে তিনি ড্রইং—রুমে চলে এলেন।

একটি কালো রোগা মেয়ে ছাপা শাড়িতে শরীর জড়িয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মেয়েটার মুখে একটা মিষ্টি ছাপ ছাড়া হাতে নিঃসঙ্গ শাঁখা দেখতে পাওয়া গেল। কুন্তীকে দেখা মানে যে দেবীদর্শনের কাছাকাছি তা ওর চাহনিতে বোঝা যাচ্ছিল। কুন্তী বললেন, 'ইয়েস!'

'দিদি টেলিফোনে—!'

'হুঁ? কতদূর পড়েছ?'

'স্কুল ফাইন্যাল।'

'কী চাকরি করবে?' 'যে কোনও চাকরি করতে গেলে যে যোগ্যতা দরকার তা তোমার আছে?'

মেয়েটি মাথা নিচু করল।

'টাইপ জানো? শর্টহ্যান্ড? তাহলে কী জানো?'

মেয়েটি চোখ তুলল, 'লিখতে পারি!'

'লিখতে পার? কী লেখা?'

'গল্প।'

'মাই গড! তুমি গল্প লেখ নাকি?' কুন্তী বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।'

'হ্যাঁ।'

'কাগজে ছাপা হয়?'

মাথা নাড়ল মেয়েটি 'না। ওরা ফেরত দেয়।'

'কেন?'

'জানি না। কেউ বলে না তো কী হয়েছে। অবশ্য দিদি বলেছেন।'

'কী বলেছেন?'

'আমি নাকি পুরনো দিনের মতো গল্প লিখি। আসলে আমার বাবার দোকানে যে সব বই ছিল তাই পড়ে শিখেছি তো। তবে এখন নতুন দিনের মতো লিখব।'

www.boiRboi.blogspot.com

'তোমার বাবার কিসের দোকান ? বই-এর ?'

'না, মুদির। ছোট দোকান '

'কোথায় ?'

'বনগাঁয়।'

'আচ্ছা ! তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায় ?

মাথা নিচু করল মেয়েটি, 'সোনারপুরে।'

'সেখানেই থাক ?'

'না। বনগাঁয়।'

'কেন ?'

চুপ করে রইল মেয়েটি !

কুন্তী বিরক্ত হল, 'দ্যাখো, তোমাকে দেবার মতো কোনও চাকরি আমার হাতে নেই। তুমি তোমার দিদিকে একথা বলবে।'

'আমি জানতাম।' বিড়বিড় করল মেয়েটি।

'তুমি জানতে একথা বলব ?'

'হ্যাঁ, বড়লোকদের চরিত্র এমন হয়। গল্পে পড়েছি। লিখেছিও। কিন্তু বড়মহিলারা কি রকম হন তা জানতাম না। আপনি রাগ করবেন না, আমি আসি।'

'দাঁড়াও। তোমার তো সাহস কম নয়। অণিমার সঙ্গে কি করে আলাপ ?'

'আমাদের গ্রামের এক মাসি ওঁর বাড়িতে কাজ করে। আমাদের গ্রামের সবাই জানে যে আমি লিখি। মাসি গিয়ে দিদিকে আমার কথা বলেছিল—?'

মেয়েটির গলার স্বরে চমৎকার দৃঢ়তা লক্ষ্য করলেন কুন্তী। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি বনগাঁ থেকে এখানে আসছ আজ ?'

'হ্যাঁ। দিদির বাড়িতে গিয়েছিলাম স্টেশনে নেমে।'

'কখন বেরিয়েছ বাড়ি থেকে ?'

'ভোর পাঁচটায়।'

'কিছু খাওয়া হয়েছে ?'

'না।'

'বসো।' হুকুম করলেন কুন্তী। মেয়েটি সঙ্কোচ নিয়েই বসল।

'পছন্দ করে বিয়ে করেছিলে ?'

www.boiRboi.blogspot.com

'অ্যাঁ? না, না। পছন্দ করার মতো কোনও ছেলে আমাদের গ্রামে ছিল না। বাবা সম্বন্ধ ঠিক করতেন কিন্তু,' মেয়েটি থামল, 'আমি আমাকে নিয়েও একটা গল্প লিখেছি, জানেন?'

'সেটা কি ছাপা হয়েছে?'

'না। আমার হাতের লেখা ভাল। আপনি পড়বেন? না, আপনার সময়ই হবে না।'

'তোমার কাছে গল্পটা আছে?'

মেয়েটি ব্যাগ খুলে ভাঁজ করা কাগজগুলো দিল। প্রথম পাতায় লেখা, 'শবরীর প্রতীক্ষা', লেখিকা—নমিতা দেবী।

কুন্তী বিন্তিকে ডাকলেন। মেয়েটিকে কিছু খাবার দিতে বললেন। কিন্তু মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'না দিদি, আমার হাতে সময় নেই।' এমনিতেই বৃষ্টি পড়ছে, কখন বাড়ি পৌঁছতে পারব জানি না। 'আপনি এই ডাক টিকিট লাগানো খামটা রাখুন। পড়া হয়ে গেলে এই খামে লেখাটা ঢুকিয়ে পোস্টবাক্সে ফেলে দেবেন।

হ্যাঁ?'

কুন্তী কিছু বলতে পারলেন না। মেয়েটি একটা স্ট্যাম্প লাগানো খাম টেবিলে রেখে তাঁকে নমস্কার করে যাওয়ার সময় বলল, 'দিদি, একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'আপনি না খুব সুন্দর। সিনেমার মতো সুন্দর। সিনেমায় নামেননি কেন?'

'নামলে উঠতে পারতাম না, তাই।'

'মানে?'

'তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে বললে না?'

মেয়েটি বুঝল। বুঝে চলে গেল।

হয়তো ওই লেখা, ওই কয়েকপাতার গল্প পড়তেন না কুন্তী, কিন্তু গোল বাধাল অমিত। ঘরে ফেরা মাত্র বলে বসল' 'কী ব্যাপার ভাই? আমাদের ঘরে বসিয়ে বাইরে কাকে সময় দিচ্ছিলে? মূল্যবান মানুষটি কে?'

কুন্তী না বললে সেটাই তাঁর চরিত্রের সঙ্গে মানাত। কিন্তু বললেন, 'তিনি এক লেখিকা।'

www.boiRboi.blogspot.com

'লেখিকা ? কী নাম ?' অমিতের স্ত্রী জয়ী জিজ্ঞাসা করল।

'নমিতা দেবী।'

ইন্দ্রজিত অবাক, 'নমিতা দেবী ? নাম শুনিনি তো। আমি অবশ্য বাংলা সাহিত্যের খবর ঠিক রাখি না। তবে আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবীর নাম শুনেছি।'

শোভন বলল, 'ছেলেবেলায় মায়ের কাছে পত্রিকা দেখতাম। তখন দেবীদের লেখা ছাপা হত। এই নমিতা দেবীর নাম তখন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে ইন্দ্রজিত। কোথায় তিনি ?'

'চলে গেছেন। যাওয়ার আগে এই গল্প দিয়ে গেছেন।' কুন্তী বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে হৈচৈ পড়ে গেল। হয়তো ভদকা কিংবা বিয়ারের প্রভাব অথবা আলোচনার নতুন কোনও বিষয় না থাকায় সবাই গল্প শুনতে চাইল। আর কুন্তীকেই সেটা পড়তে হবে।

এও এক মজা। কুন্তীর মনে হল স্কুলের স্পোর্টসে গো অ্যাজ ইউ লাইকের মতন ব্যাপারটা। সারাজীবন যা করব না তা একদিন টুক করে করে ফেলা।

সস্তায় কেনা কাগজ। লাইন টানা। হাতের লেখা গোটা গোটা। বোঝাই যায় যত্ন করে লেখা হয়েছে। আটটি মানুষ কুন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে। কুন্তী পড়া শুরু করলেন।

'আমার নাম শকুন্তলা। সে যুগের নয়, এ যুগের। এ রকম নাম কেন যে আমার রাখা হয়েছিল তা বাবা মাকে প্রশ্ন করেও জানতে পারিনি।'

'এক মিনিট।' ইন্দ্রজিত বাধা দিল।

'ভদ্রমহিলার নাম নমিতা না ?'

জয়ী বিরক্ত হল, 'আঃ, লেখিকা কি নিজের নামে নায়িকার নাম লিখবে ? দ্যাখো, পড়ার সময় কেউ কথা বলবে না।'

কুন্তী এগিয়ে দিলেন কাগজগুলো 'জয়ী, তুমিই পড়ো।'

জয়ী খুশি হল। কুন্তী যেন রক্ষে পেলেন।

আমরা খুব গরীব। আমার বাবা একটা সাধারণ দোকান চালান গ্রামে। দিনে কিরকম বিক্রী হয় তা জানিনা। আমি কোনওমতে থার্ড ডিভিশনে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে বাড়িতে বসে ছিলাম। তবে ঠিক

www.boiRboi.blogspot.com

বসে থাকা বলে যা বোঝায় তা নয়। আমি রোজ চারপাতা লিখি। এটা আমার অনেকদিনের অভ্যেস।

আমি যে গল্প লিখি তা অনেকেই জানে। এমন কি আমাদের সবচেয়ে বুড়ি মানদাঠাকুমাও সেদিন বলেছিল তার গল্প আমাকে লিখতে হবে। কিন্তু তার আগেই বুড়ি মরে গেল।

আমি দেখতে ভাল নই। রোগা, কালো, স্বাস্থ্যটাস্থ নেই তবে হাইট আছে। পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। আমি দেওয়ালে দাগ দিয়ে রেখেছি। সংসারের কাজ পারি, তবে করতে ইচ্ছে করেনা। বাবার দোকানে মাসিক পত্রিকাও বিক্রী হয়। কোনও মাসে সেটা না বিকোলে আমি নিয়ে আসি। গোগ্রাসে পড়ি আর তার ঠিকানায় লেখা পাঠাই। এসব করতেও পয়সা লাগে। বাবা দিতে চায় না বেশিরভাগ সময়।'

অমিত হাই তুলল, 'একটু বোরিং মনে হচ্ছে।'

জয়ী বলল, 'শাট আপ! কেমন সরল সরল কথাবার্তা চুপ করে থাকো।'

'আমার বোঝা বাবা নামাতে চাইল। পাত্র পক্ষ আসে। জিজ্ঞাসা করে এটা পারি, ওটা পারি কিনা! আমি গান জানিনা, সেলাই জানিনা। রান্না একটু আধটু জানি আর জানি লিখতে।

অনুরূপা দেবী বা নিরুপমা দেবীর মত শকুন্তলা দেবীরও একদিন নাম হবে বলে আমার বিশ্বাস। আর লিখতে জানি শুনলেই পাত্রপক্ষের মুখ কেমন হয়ে যেত। তাঁরা অদ্ভুত চোখে তাকাতেন। ফিরে গিয়ে আর সাড়া দিতেন না। শেষপর্যন্ত বাবা আমাকে শাসালেন, কাউকে বলা চলবে না আমি লিখি। যেন লিখতে পারাটা পাপ। বাঙালি মেয়ের যেমন অনেক কিছু করা পাপ তেমনি লেখাও। আর এই করতে করতে সোনারপুরের হরিপদ বিশ্বাসের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। ছেলের বউদি এসেছিল দেখতে। বিধবা বউদি। বয়স পঁয়তাল্লিশ হবে শুনে মা বিশ্বাস করতে চায়নি। লম্বা চওড়া, শরীর একটুও টসকায়নি। আমার মা ওঁর চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছিল না। ওঁর স্বামী মারা গেছে পনেরো বছর বয়সে। ষোলতে শাশুড়ির ছেলে হয়।

একবছরের ছেলেকে বিধবা বউমার কাছে রেখে তাঁরা গঙ্গাসাগর করতে গিয়েছিলেন আর ফেরেননি। নৌকোডুবি হয়েছিল। সেই থেকে ইনি একবছরের দেওরকে মানুষ করেছেন। বিয়ে থা করেননি। দেওরই

www.boiRboi.blogspot.com

ধ্যানজ্ঞান। বিষয় সম্পত্তি আছে। দেওরকে একটা স্টেশনারি দোকান করে দিয়েছেন।

আমাকে খুঁটিয়ে দেখলেন। সংসারের কাজ পারি কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। গান জানি না সেলাই, নাচ জানি না আঁকা, এসব প্রশ্ন না করে ফস করে জিজ্ঞাসা করলেন আমার ভেতরের জামার সাইজ কি! ভয়ে ভয়ে বত্রিশ বলতে তিনি মাকে বললেন, 'আপনার মেয়েকে আমার ভারি পছন্দ হয়েছে। ওকে জা করে নিয়ে যাব।'

বাবা যা পারলেন দিলেন। বর এল বিয়ে করতে। স্বাস্থ্যবান যুবক। গায়ের রঙ কালো হলেও স্বভাবে লাজুক। বাসর ঘরে একটিও কথা বলল না। সবাই যখন বিশ্রাম নিতে গেল তখন সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একটা কথা বলব?'

তিনি বললেন, 'ইচ্ছে হলে বল।'

'আমি না লিখি। মানে গল্প-টল্প। বিয়ের পর লিখলে আপত্তি আছে?'

তিনি অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকালেন।

তারপর বললেন, 'সারাদিন রাত বসে থাকতে হবে। ঘরে বসে যা ইচ্ছে করতে পার। তবে মাসে দশটাকার বেশি হাত খরচ পাবে না এইটা মনে রেখ।'

সেই রাত্রে ওই অবধি। কিন্তু আমার চেয়ে সুখী বোধহয় পৃথিবীতে কোনও মেয়ে ছিল না। দশটাকায় যত কাগজ পাওয়া যাবে তা তো সারা মাসে লিখে ফুরোবে না।

শ্বশুর বাড়িতে এলাম। শ্বশুর শাশুড়ি নেই, বউদিই সব। ফুল-শয্যার রাত্রে তিনি আমাকে বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলছি। হরি-পদর শরীর ভাল নেই, ওকে বিরক্ত করবে না।'

মেয়ে হয়ে মানে বুঝতে পারব না তা কি করে হয়। রাত্রে তিনি যখন শুতে এলেন তখন জিজ্ঞাসা করলাম, 'শরীরে কি হয়েছে?'

'কি হবে আবার? কিস্যু হয়নি। ঘুমাও।'

সকালে উঠেই তিনি বেরিয়ে যেতেন দোকানে। দুপুরে খেতে এলে বউদি যত্ন করে তাঁকে খাওয়াতেন। খেয়ে দেয়েই আবার দোকানে ছোটা। ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। তখন স্নান শেষ করে রাত্রের খাওয়া খেয়ে নিয়ে সিগারেট খেতে বাইরে যেতেন। ফিরতেন কখন টের পেতাম না।

www.boiRboi.blogspot.com

এত ঘুম পেত যে জেগে থাকতে পারতাম না।

বিয়ে হল, শ্বশুর বাড়িতে এলাম কিন্তু যেসব ঘটনা এইসময় ঘটে তার কিছুই আমার ক্ষেত্রে ঘটল না। দ্বিরাগমনে গ্রামে ফিরে গেলে বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে কি জবাব দেব? এখন আমি সকালে উঠি। ঘর গোছাই। বউদির নির্দেশে রান্না করি। তারপর সারাদুপুর লিখি আর লিখি। দুপুরের পর বউদি সেজেগুজে বেরিয়ে যান। তখন একা। আর এই সময় পাশের বাড়ির বউটা আসে আমার কাছে। আমি লিখছি দেখে চোখ কপালে তোলে। আমার বিরক্ত লাগলেও কিছু বলিনা। বউটা নানান কথা জানতে চায়। স্বামী আমাকে কীরকম আদর করে, তাও! ওসব ঘটনা ঘটেনি বলে দিয়েছিলাম। শুনে মুখ গম্ভীর করে বলেছিল, 'জানতাম।'

এসব চরিত্রের কথা আমি জানি। ঘর ভাঙ্গতে এদের জুড়ি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রও এঁদের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেই রাত্রে মনে হল স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা দরকার। তাঁর সত্যি হয়তো অসুখ আছে। অসুখটা কি? অসুখ থাকলে কেউ অত পরিশ্রম করতে পারে! তাহলে বউটাও বা বলবে কেন, জানতাম!

রাত্রে স্বামী এলেন। খাওয়া-দাওয়া হল। বউদি তাঁকে জানিয়ে দিলেন নিয়ম মানতে আগামীকাল আমাকে নিয়ে বনগাঁয়ে যেতে হবে দ্বিরাগমনে। তবে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলেই হবে। রাত কাটাতে হবেনা। স্বামী কিছু বললেন না।

স্বামী সিগারেট খেতে বাইরে গিয়েছেন। আমি আজ কিছুতেই ঘুমাবো না। আটঘণ্টা এক ঘণ্টা চলে গেল। রাত বাড়ছে। সব চুপচাপ। এখনও তিনি ফিরছেন না কেন? শেষ পর্যন্ত ওঁকে খুঁজতে বাইরে বের হলাম। লম্বা বারান্দা। পরিষ্কার উঠোন। উঠোনে চাঁদের আলো। তিনি নেই। কোথাও। উঠোন পেরিয়ে দরজায় গেলাম। রাস্তা দেখা যাচ্ছে ছবির মত। এরকম বর্ণনা আমার একটা গল্পে আছে। তাঁকে দেখতে পেলাম না। হঠাৎ আমার ভয় করতে লাগল। কিছু হয়নি তো তাঁর। মনে হল বউদিকে ব্যাপারটা জানাই। কিছু হলে তিনিই আমাকে দুষবেন না জানানোর জন্যে। বউদির ঘরটা ওপাশে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বুঝলাম ওটা ভেতর থেকে বন্ধ নয়! ঠেলতেই পাল্লাদুটো খুলে গেল। আর আমি যেন অন্ধ হয়ে গেলাম। এক ছুটে ফিরে এলাম

www.boiRboi.com

নিজের ঘরে। বিছানায় উপুর হয়ে শুয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম। তারপর একটু সামলে উঠে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলাম। চোখের পাতায় দৃশ্যটা যেন এঁটে আছে। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো পড়েছিল খাটে। বউদি এবং আমার স্বামী পরস্পরকে সাপের মত জড়িয়ে অদ্ভুত চাপা শব্দ করে যাচ্ছিলেন। মানুষ খুব যন্ত্রণা পেলে মুক্তির জন্যে এমন শব্দ করতে পারে! কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল ওই শব্দগুলো আমার বুকটাকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। চোখ থেকে ঘুম উধাও। শরীর থেকে শক্তি। ওই ভাবে পড়ে থাকতে থাকতে একসময় টের পেলাম পাশের বিছানায় স্বামী এসে শুয়ে পড়লেন।

তারপর ভোর হল। সারারাত আমার ঘুম নেই। স্বামী জাগলেন এবং রোজকার মত বেরিয়ে গেলেন। আমি ঘর থেকে বের হচ্ছিলাম না। এমনকি কলতলাতেও নয়। বউদি এলেন, 'তৈরি হয়ে নাও।'

আমি মাথা নিচু করলাম।

তিনি কিছু ভাবলেন। তারপর এগিয়ে এসে খাটের পাশে দাঁড়ালেন 'আমার ঘরে শব্দ না করে ঢুকে তুমি অন্যায় করেছ।'

আমি কথা বললাম না।

'তোমাকে একটা কথা বলি। অল্প বয়সে বিধবা হবার পর অনেক প্রলোভন এসেছিল। শরীর আমার এমনিতেই পুরুষের মাথা ঘোরায়। কিন্তু আমি সংযত ছিলাম। কেউ আমার নামে কোনও দুর্নাম দিতে পারবে না। শরীরে ভরা যৌবন অথচ ব্যবহার করতে পারছি না, এ যে কী যন্ত্রণা তা আমিই জানি। তোমার স্বামী তখন ছোট। তাকে মানুষ করছি দরদ দিয়ে। আমি খাওয়ালে খাওয়া, শোওয়ালে শোওয়া। আস্তে আস্তে সে বড় হচ্ছিল। কিন্তু আমাকে ছেড়ে শুতে চাইত না। আমারও ভাল লাগত। সেই ভাবে কাটিয়ে কখন একদিন আমার সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেল আমি নিজেই জানিনা। তার কাছে আমিই সব। মা বল তো মা, সঙ্গিনী বল তো সঙ্গিনী। আমার কাছে ও যা পেয়েছে তা পৃথিবীর কোনও মেয়ে ওকে দিতে পারবে না।'

'তাহলে ওঁকে বিয়ে দিলেন কেন?'

'না দিয়ে পারিনি। সত্যি বলতে কি আমি দিতে চাইনি। কিন্তু পাড়ার লোকজন যে আমাদের সম্পর্কটাকে সন্দেহ করছে তা টের পেলাম। আমার বয়সের সঙ্গে মানিয়ে যদি শরীর ভাঙ্গত, চুল পাকত, তাহলে কেউ

www.boiRboi.blogspot.com

সন্দেহ করত না। তাই ঠিক করলাম ওর বিয়ে দেব। বিয়ে দেব এমন মেয়ের সঙ্গে যার শরীরে আকর্ষণ নেই। যার কোন গুণ নেই। অনেক খোঁজ করে তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। এমনিতেই তোমার বিয়ে হত না। এখন এখানে এসে ভালই তো আছ। এভাবেই সারাজীবন থাকতে পারবে যদি ইচ্ছে কর। আর কাল যা দেখেছ তা যদি কাউকে জানাও তাহলে নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মারবে।'

উনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন তখন আমি কেঁদে ভাসাচ্ছিলাম। কান্না ছাড়া তখন আমার কিছুই করার ছিল না। উনি আমার পাশে বসলেন, 'এত কান্নাকাটির কি হয়েছে? ষোল থেকে তিরিশ আমি বঞ্চিত ছিলাম সেটা জানো? আর মেয়েদের ব্যাপারটা মেয়ে বলেই আমি জানি। সব মেয়ে এসবের জন্যে কষ্ট পায় না। তোমার মত রোগা ছেলেছেলে মেয়ের তো কষ্ট হবার কথাই নয়। তুমি এখানে থাকো, খাওয়া-দাওয়া সাজগোজ সব কর আমি আপত্তি করব না। তবে হ্যাঁ, তুমি নাকি কিসব লেখালেখি কর, এইসব কথা লেখা চলবে না বলে দিলাম।'

হুকুম হয়ে গেল। একটা লেখায় পড়েছিলাম রাজা ইচ্ছে হলে লেখকের লেখা বন্ধ করে দিতে পারতেন। লেখকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতেন। পরে সরকার সেই কাজ করেছেন, কিন্তু লেখকেরা লেখা থামাননি। মনে মনে স্থির করলাম আমিও হার মানব না। আমার স্বামী আমাকে বনগাঁতে পৌঁছাতে এলেন। সারাপথে একটা কথা নয়। রওনা হতে দেরি হওয়ায় আমরা পৌঁছেছিলাম প্রায় বিকেল বিকেল। বাবা মা জোর করে তাঁকে ফিরতে দিলেন না তখনই। বললেন রাত কাটিয়ে যেতে হয়।

নিজেদের বাড়িতে এতকাল আমার আলাদা শোওয়ার ঘর ছিল না। আজ রাত্রে সেই ব্যবস্থা হল। রাত্রে তাঁর পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি কি করব?'

তিনি ঘুমাবার চেষ্টা করছিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ কি?'

'আমাকে তোমার একটুও পছন্দ হয়নি, না?'

তিনি উত্তর দিলেন না। না দেওয়াটাই বড় উত্তর। পরদিন সকালেই ফিরে গেলেন কাজের চাপ দেখিয়ে। আমি থেকে গেলাম বাপের

www.boiRboi.blogspot.com

বাড়িতে।

দিন গেল। মাসও। সোনারপুর থেকে কেউ আমাকে নিতে আসে না। এমনকি একটাও চিঠিও নয়। মা আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করে। আমি ভয় পেতাম সত্যি কথা বলতে। কিন্তু জানিনা জানিনা বলে আর কতদিন চাপা দিতে পারব। শেষ পর্যন্ত বলতে হল। মা পাথর হয়ে গেল! একি সম্ভব? মায়ের বয়সী মহিলার সঙ্গে? যার কাছে একমাস থেকে বড় হয়েছে তার সঙ্গেই শারীরিক সম্পর্ক? কিন্তু সত্যি যা তা চিরকালই সত্যি।

অথচ তার মধ্যেই আড়াল। মা বাবাকে এসব জানালেন না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে বনগাঁ থেকে চলে গেলেন সোনারপুরে। পাড়ার সবাই দেখল আমরা গেলাম এবং খানিক সময় বাদে ফিরে যাচ্ছিলাম। আমার চোখে জলও তারা দেখতে পেল। অতএব ওদের কৌতূহল হল। একজন কারণ জিজ্ঞাসা করতেই মা তাদের বলল, 'মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু দ্বিরাগমনের সময় সেই যে মেয়েকে দিয়ে গেল হরিপদ আর আনতে এল না। অনেক অপেক্ষার পর নিজে নিয়ে এসেছিলাম মেয়েকে। মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে বলে দিল, 'মেয়েকে নাকি তার পছন্দ হয়নি।' সঙ্গে সঙ্গে জনতা গর্জে উঠল। আর আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে হরিপদ এবং তার বউদির কেচ্ছাকাহিনী শুনতে লাগলাম। প্রথম প্রথম গ্রামের লোক ভাবত মাতৃস্নেহ। তারপর কেউ না কেউ কিছু না কিছু দেখতে পেয়েছে। লোকের চোখ ঢাকার জন্যে যে হরিপদর বিয়ে দেওয়া হল সেকথা সবাই জানে। এমন অনাচার মেনে নেওয়া চলে না। বউ ফিরিয়ে নিতে হবে নিতে হবে বলে পাড়ার লোক আমাদের সামনে রেখে চিৎকার করতে করতে চলল। আমার খুব লজ্জা করছিল কিন্তু তখন আর কোনও উপায় ছিল না। তাঁর বউদিও নাকি বাড়িতে নেই। দরজায় আঘাত করছিল সবাই। শেষপর্যন্ত তিনি দরজা খুলে চিৎকার করলেন, 'আপনারা করছেন কি? আমাদের বিয়ের ব্যাপারটায় নাক গলাচ্ছেন কেন?' মানুষ তখন খেপে গিয়েছে। তাঁকে দেখতে পেয়েই কিলচড় শুরু হয়ে গেল। আমি আর পারলাম না। আমার ভয় হচ্ছিল সবাই মিলে মারলে তিনি মরে যাবেন। আমি আমার রোগা শরীর নিয়ে ছুটে গেলাম তাঁকে আড়াল করতে। একটা লোক তাঁকে মারতে যাচ্ছে দেখে একটু ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইলাম, দেখলাম সে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে

www.boiRboi.com

গেল। স্বামী ভেতরে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে নিলেন। শুনলাম লোকটার নাকি মৃগীরোগ আছে। সবাই মিলে ধরাধরি করে হেলথ সেণ্টারে নিয়ে যাওয়া হল। আমি এবং মাও ওদের সঙ্গে গেলাম। লোকটাকে সুস্থ হতে দেখে ফিরে আসছি যখন, তখন একজন সেপাই এসে বলল থানার বড়বাবু আমাদের ডাকছে। আমাকে আর আমার মাকে। গেলাম। দারোগাবাবু জানালেন আমার স্বামী এসে ডায়েরী করে গেছেন যে আমি এবং আমার মা দলবল নিয়ে তাঁকে মারতে গিয়েছিলাম, তাঁকে ধাক্কা দিতে গিয়ে আর একজনকে এমন আঘাত করেছি যে লোকটাকে সেণ্টারে নিয়ে যেতে হয়েছে। তাঁর আরও অভিযোগ স্ত্রী হিসেবে আমার অক্ষমতা জানার পরই নাকি আমি বাপের বাড়ি চলে যাই। তাছাড়া ওঁর কাছে আমার লেখা বেশ কিছু কাগজ আছে যাতে প্রমাণ করা যেতে পারে যে আমার চরিত্র ভাল নয়।

দারোগাবাবু হাসলেন। বললেন 'সবই বুঝলাম কিন্তু কাগজে কি লিখেছেন?'

'গল্প!'

'অ্যাঁ? আপনি গল্প লেখেন?'

'হ্যাঁ।'

'আরেব্বাস ভাবা যায় না।' দারোগা নাক চুলকে ফেললেন 'ঠিক আছে, কোর্ট থেকে সমন গেলে হাজির হবেন।'

ব্যাস হয়ে গেল।

এরপর থেকে আমি বনগাঁয়ে, আমার বাপের বাড়িতে। সংসারে কাজ করে দিই, তিনটে ছাত্রী পড়াই আর দুপুরে গল্প লিখি। বাবার কাছে হাত পাততে হয় না। মুশকিল হল আমার গল্পগুলো ঠিক কোন কারণে ছাপা হচ্ছে না তা বুঝতে পারছি না। হলে সোনারপুরে গিয়ে পত্রিকাটা দিয়ে আসতাম। আমার এখন ভাল লাগে না। সাতদিন যে মানুষটার পাশে শুয়েছিলাম তিনি আমাকে খুব টানেন। মাঝে মাঝে নিজেকে বোঝাই তিনি তখন খুব ছোট ছিলেন, কিছু বুঝতেন না। বউদির সঙ্গে ঘটনা ঘটে গিয়েছিল হঠাৎই। যেমন ভাবে দুর্ঘটনা হয়। তারপর সেইটে অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। মন মানতে চায়, কিন্তু তাতে আমার কি লাভ হচ্ছে!

আমার এখন সোনারপুরে যেতে ইচ্ছে করে। ভাইরা বড় হচ্ছে।

www.boiRboi.blogspot.com

ওরা বুঝতে শিখেছে আমি এবাড়িতে বাহুল্য। আমার এখানে থাকার কথা নয়। হঠাৎ আমার এক বান্ধবী আমাকে একটা সত্যি কথা বলল। ভগবান মানুষকে তৈরি করেছেন কতকগুলো নিয়ম মেনে। শৈশব, বাল্যকাল, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়কাল এবং বার্দ্ধক্য।

কোনওটাতেই কেউ চিরদিন আটকে থাকতে পারে না। তাকে এগিয়ে যেতেই হয়। আমার স্বামীর বয়স এখন তিরিশ, তিনি ছেচল্লিশ। আর কতদিন? বড়জোর বছর চারেক। তারপর তাঁর শরীর থেকে যৌবন উধাও হয়ে যাবেই। আর বাইরের যৌবন যদি বা থাকে ভেতরের যৌবন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তখন তাঁর কোনও আকর্ষণ থাকবে না আমার স্বামীর কাছে। গন্ধ নেই মধু নেই এমন ফুলের দিকে মানুষ কবার তাকায়। পাঁচ বছর পরে আমার মাত্র তিরিশ বছর হবে। কী-ই বা এমন। তখন তিনি আমাকে নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন।

আমি তাই মাসে একবার সোনারপুরে যাই। দূর থেকে বউদিকে দেখে আসি। লোক বলে এই বয়সে অসুখ-বিসুখ হলেও মানুষের শরীর নষ্ট হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত তেমন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। তবু এটাই আমার একমাত্র আশা। আমি অপেক্ষা করব।'

জয়ী পড়া শেষ করল। তারপর বলল, 'ইম্পসিব্‌ল!'

অমিত জিজ্ঞাসা করল, 'তার মানে?'

'এই জন্যেই বাঙালি মেয়েরা এক্সপ্লয়েটেড হয়ে চলেছে। স্বামী আর একজনের সঙ্গে ফূর্তি করছে দিনের পর দিন আমি অপেক্ষা করব কখন তিনি মুখ ফেরাবেন সেই আশা নিয়ে?' জয়ীর গলায় জ্বালা স্পষ্ট হল।

শোভন বলল, 'কিন্তু গল্পটা দাঁড়িয়ে গেছে। শুধু যৌবন দিয়ে অনন্তকাল কেউ কোনও সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। এই উপলব্ধিটা গল্পটার চমক।'

ওরা খিচুড়ি এবং ইলিশ খেল। বিকেল নামতেই যে যার বাড়ি ফিরে গেল ধন্যবাদ জানিয়ে। দেখা যাচ্ছিল গল্পটা কিছুই নয় খুবই সাধারণ ইত্যাদি বলা সত্ত্বেও খেতে বসেও এ নিয়ে কথা বলা বন্ধ করছে না। এক-মাসের শিশুকে মাতৃস্নেহে বড় করে কোনও মহিলা শেষপর্যন্ত ওই সম্পর্কে যেতে পারেন কিনা তাও তর্কের বিষয়। কুন্তী কোন কথা বল-

www.boiRboi.blogspot.com

ছিলেন না। একজন ঠাট্টা করে বলল, 'আহা বেচারা। লিজ টেলার যদি স্বামীর বউদি হত তাহলে ওকে পনেরো বছর অপেক্ষা করতে হত কম করেও। তদ্দিনে মেয়েটাই বুড়ি হয়ে যেত!'

বাড়িটা এখন ফাঁকা। ব্যালকনিতে চুপচাপ বসেছিলেন কুন্তী। ঘোলাটে মেঘগুলো ব্লটিং-এর মতো সমস্ত আলো দ্রুত শুষে নিচ্ছে। সন্ধে হয়ে এল বলে। ওপাশের একটা ঘরে টিভি চলছে। দর্শক বিন্তি এবং আবদুল। শব্দ বাইরে বেরুচ্ছে না। কি একটা সিনেমা চলছে সেখানে।

গল্পটাকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছিলেন না কুন্তী। বাঙালি মেয়েদের যে বয়সে ওই পর্বটিকে ছেড়ে আসতে হয়, তাঁর ক্ষেত্রে একটু আগেই যেন এসে গিয়েছে। ডক্টর দত্ত বলেছেন, এটা জীবনের খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। একটুও মাথা ঘামাবেন না। শরীর নিয়ে চিন্তা করা বোকামি। আসলে মন তাজা রাখাই প্রয়োজন। শুনতে খারাপ লাগে না এইসব উপদেশ। শুনলে স্বস্তি হয় বলেই খারাপ লাগে না।

কিন্তু ওই যে মেয়েটি লিখেছে, গন্ধ নেই মধু নেই এমন ফুলের কথা! এখনও এই সময়ে তিনি যখনই একাকী তখনই এমন কোনও পুরুষের সঙ্গ কামনা করেন যে বোকাবোকা নয়, যে স্মার্ট সাজার চেষ্টা করে না অথবা বোদ্ধা হবার ভান করে না। এই যে কামনা তা তাঁর বুকের ভেতর থেকে উঠে আসে। তাঁর শরীরের সব কিছু মন্থন করে নিঃশ্বাসের মতো আন্তরিক হয়ে ওঠে। রঙ্গন চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুকাল থিতিয়ে ছিল এইসব ভাবনা। এখন একটু একটু করে প্রবল হচ্ছে। শেষ ঘণ্টা বেজে যাওয়ার পর লোকে যেমন হুড়মুড়িয়ে ট্রেনের কামরায় উঠে পড়ে, ঠিক তেমন? শেষ ঘণ্টা? তাঁর শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে? ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন কুন্তী। অসম্ভব। এই তো, ভরদুপুরে বাড়ি এসে ভদকা খাওয়ার আগেই মানুষগুলো তাঁর রূপের কত প্রশংসা করে গেল। অফিসে যখন ঢোকে তখন কর্মচারীদের মুখে যে স্তাবক-দৃষ্টি থাকে তা তাঁর অদেখা নয়। ম্যাডাম শব্দটা উচ্চারণ করার সময় তারা এক একজন চকোলেট হয়ে যায়।

সেদিন রবীন্দ্রসদনে গিয়েছিলেন বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে। একটি বছর পঁচিশেকের ছেলে এগিয়ে এসেছিল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারি?' কুন্তীর কপালে ভাঁজ পড়েছিল।

www.boiRboi.blogspot.com

'কেন ?'

'আপনার মতো কাউকে কখনও দেখিনি।'

'সরি। আমার বাজে কথা বলার মতো সময় নেই।' কুন্তী পাশ কাটিয়েছিলেন অবহেলায় কিন্তু তাঁর ভাল লেগেছিল।

আর এসব শেষ ঘণ্টা বেজে গেলে কারও জীবনে ঘটে ? পৃথিবীতে এমন মেয়ে অনেক আছে যাকে কখনও কোনও পুরুষ প্রস্তাব দেয়নি। যেমন ওই মেয়েটি। কী নাম যেন, হ্যাঁ, নমিতা। চেহারার মতো সাদাসাপটা নাম।

কুন্তী কলকাতার দিকে তাকালেন। ঝাপসা জলের মধ্যে আলোর বিন্দু ফুটে উঠেছে। কলকাতায় সন্ধে নেমেছে বর্ষা জড়িয়ে। দিন শেষ হল। একটা গোটা দিন। কুন্তী ধীরে ধীরে শোওয়ার ঘরে চলে এলেন।

দেওয়ালজোড়া আয়নায় এখন তিনি। মিষ্টি, অহঙ্কারী। দূর ! কে কী বলল তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ। বরং স্নান করা যাক। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে অবিরত ভিজে চলেছেন তিনি। আজকের দিনটা অবহেলায় কাটল। শরীরটার দৈনন্দিন পরিচর্যা হল না।

একটু আলস্যঘন দিন। আগে মন্দ লাগত না, এখন অস্বস্তি হয়। এই বুঝি ফাঁক গলে শনি ঢুকে পড়ল। ছেলেবেলায় একটা গল্প পড়েছিলেন তিনি। কোনও এক রাজা নাকি অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারছিলেন না শনিদেব। কোথাও তাঁর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু একদিন বাইরে থেকে ঘুরে এসে রাজা যখন তাঁর পা ধুচ্ছিলেন তখন গোড়ালির কাছে জল পৌঁছায়নি অন্যমনস্কতার কারণে। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে শনিদেব সেইখান দিয়ে রাজার শরীরে প্রবেশ করে ধ্বংস ডেকে আনলেন। এমন যেন না হয়, এমনটা হতে দেবেন না কুন্তী।

স্নান সেরে বড় তোয়ালেতে শরীর মুছতে মুছতে আয়নায় নিজেকে দেখলেন। না, কপালে ভাঁজ পড়েনি, চোখের তলায় একটু ঢেউ নেই। হাসলে গালে কুঞ্চন ওঠে না। চামড়া কি টানটান। গলায় একটু, নাঃ, এ তাঁর চোখের ভুল। গতকাল যখন ছিল না আজ কোত্থেকে আসছে ! মুখ উঁচু করতেই সন্দেহটা মিলিয়ে গেল। কাঁধ থেকে কনুইদুটো এখনও সতেজ। এবং নিজের বক্ষদেশ দেখতে গেলেই মৃণালের ওপর তাঁর খুব রাগ হয়। প্রথম যৌবনে মৃণাল যথেচ্ছাচার যদি না করত,

www.boiRboi.com

তাহলে এখনও ঈশ্বরী ঈর্ষিতা হতেন। সেইসময় তিনি বোঝেননি, মেয়েরা ভালবাসলে যেমন কিছুই বুঝতে পারে না অথবা চায় না। সঙ্গে সঙ্গে গল্পটার কথা মনে এল। নমিতা অথবা শকুন্তলার স্বামীর বউদি, মেয়ে দেখতে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন ভেতরের জামার মাপ কত? বেচারা, কী অপমানকর প্রশ্ন!

হঠাৎ ভদ্রমহিলাকে দেখতে ইচ্ছে করল কুন্তীর। পঞ্চাশের কাছে পৌঁছেও যিনি তিরিশকে শাসনে রেখেছেন। সেই মহিলা নিশ্চয়ই তার মতো এমন বিত্তে নেই ,হাত বাড়ালেই সমস্ত পৃথিবীকে পান না। তাঁর কৌশল কী?

সারাশরীর ঢাকা আলখাল্লা পরে শোওয়ার ঘরে পৌঁছাতেই টেলিফোন বেজে উঠল। কুন্তী রিসিভার তুললেন না। বাজনা থামতেই বুঝলেন বিনতি ধরছে ও ঘরে। একটু বাদেই সে এল, 'অণিমাদেবী, কী বলব?'

মাথা নেড়ে ধরবেন বললেন, কুন্তী।

রিসিভারটা তুললেন, 'হেলো!'

'বিরক্ত করছি। খুব ব্যস্ত?'

'নাঃ। বল।'

'তোমাকে যে মেয়েটির কথা বলেছিলাম সে কি দেখা করেছে আজ?'

'এসেছিল।'

'কখন?'

'দুপুরে।'

'তারপর? মানে, কখন গেল?

'কেন বল তো?'

'আর বোলো না। ওর খোঁজে বনগাঁ, মানে যেখানে ও থাকে, সেখান থেকে ওর বাবা এসেছেন আমার কাছে। মেয়েকে নিয়ে এখনই সোনারপুরে যাবেন। অথচ কথা ছিল ও তোমার ওখান থেকে আমার কাছে ফিরে আসবে।'

'তাহলে বনগাঁয় ফিরে গেছে।,

'মনে হচ্ছে। এখন এরা যে কী করবে?'

অণিমা যেন সত্যিই বিব্রত।

কুন্তীর খেয়াল হল 'সোনারপুরে যাবে কেন? ওর লেখা একটা গল্প দিয়ে গেছে আমায়। সেটা পড়ে তো মনে হয় না যাওয়া উচিত। আর

www.boiboi.blogspot.com

শোন, এই মেয়েকে দেবার মতো কোনও চাকরি আমার হাতে নেই। তুমি কিছু মনে কোরো না।'

'ও। ব্যাড লাক্। তোমাকে বিরক্ত করেছি বলে খারাপ লাগছে। মেয়েটার কপালটাই মন্দ। ওর বাবা এসেছেন স্বামীর শেষকৃত্যে নিয়ে যেতে।'

'হোয়াট?' চিৎকার করে উঠলেন কুন্তী।

'আজ দুপুরেই ওঁরা খবর পেয়েছেন লোকটা নাকি ভোরে আত্মহত্যা করেছে। গলায় দড়ি দিয়ে। শেষকৃত্যে না গেলে সম্পত্তির ভাগ থেকে হয়তো বঞ্চিত হতে পারে।'

'কিন্তু লোকটা আত্মহত্যা করতে গেল কেন?'

'আমি জানি না। আচ্ছা, রাখছি।'

রিসিভার রেখে ধুপ করে বিছানায় বসে পড়লেন কুন্তী। তাঁর ভিজে চুল এখন তোয়ালেতে জড়ানো। হঠাৎই সেই তোয়ালের হিম তাঁর সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। মেয়েটা এখন কার জন্যে কিসের জন্যে অপেক্ষা করবে। যার সময় গেলে সে জিতে যাবে বলে ভেবেছিল তার তো আজ ভোরেই সময় চলে গেল কিন্তু ওর তো জেতা হল না। এখন সেই মহিলা, যাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল একটু আগে, হঠাৎই যেন অনেক অন্ধকারে চলে গেলেন। আশ্চর্য! এদের কাউকেই তো তিনি চেনেন না।

কুন্তী উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎই সমস্ত শরীর যেন নির্জল বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। জিভ, গলা, পেট, সর্বাঙ্গ। জল মানে চলাচল, জল মানে সরস। অনেক দূরের মহাকাশে যেসব গ্রহ জলহীন হয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা হিংসুটে চোখে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তৃষ্ণায় বুক জ্বলে জ্বলে যাক!

কুন্তী প্রচণ্ড শক্তিতে বোতামে চাপ দিলেন।

বিশাল ফ্ল্যাট কাঁপিয়ে বেল বাজছে। বিন্তি ছুটে এল দরজায়।

কুন্তী বলতে পারলেন, 'জল দাও।'

www.boiRboi.blogspot.com

বন্ধ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করলো রবার্ট স্টিভেনসন, দেশটা উচ্ছন্নে গেল।'

বাইরে তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। ওটা শুরু হয়েছে তিনদিন আগে। আকাশ-ভর্তি ভারি মেঘের গম্ভীর চলাফেরা। তাপাঙ্ক নেমে গিয়েছে স্বাভাবিকের খানিকটা নিচে। অথচ এখন এরকমটা হবার কথা নয়। ক্যালেণ্ডারে সামার এসে গিয়েছে। এখন নরম নরম রোদের সামার আর আকাশে অনেকক্ষণ নীল দেখা যায়। রবার্ট কাঁচের আড়ালে রাস্তার যেটুকু দেখতে পেলেন তাতে বিন্দুমাত্র ভরসা পেলেন না। কোন মানুষ নেই, বোল্টন শহরটা যেন আধা অন্ধকারে জবুথবু হয়ে আছে।

জানালা থেকে সরে এলেন রবার্ট। চমৎকার প্রকৃতি তো আর একা সৎ থাকতে পারে না। নব্বইটা বছর বেঁচে থাকতে হচ্ছে এসব দেখার জন্যে। নিজের শরীরের দিকে তাকালেন। হাত গোটালে বাইসেপটা ভাঙা ডিঙার মত দেখায় এখনও। মেদটেদ শুকিয়ে গেছে, গাল বসে গিয়েছে অনেকটা, কিন্তু এখনও তিনি সবল আছেন। মাথাটা যদি সাত তাড়াতাড়ি মরে না যেত জীবনটাকে আরও একটু নেড়েচেড়ে দেখতেন তিনি।

টিভি খুললেন রবার্ট। বিবিসির নিউজ বুলেটিনে ওই এক কথা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি, ঝড়ো হাওয়া আর মেঘলা আকাশ। এগুলো বলার জন্যে বিদ্যের দরকার হয় না, জানালার বাইরে চোখ মেললেই বোঝা যায়। আগে বিবিসি কি নিখুঁত আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করত! আর এখন? সোফায় বসলেন তিনি। আর তখনই নিচে শব্দ হল। কেউ হাতুড়ি ঠুকছে দেওয়ালে। রবার্টের মনে হল তাঁর বুকেই যেন আওয়াজটা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন তুলে বোতাম টিপলেন। তিনবারের বার গলা পেলেন। কাউড্রেদের মেয়ের গলা। রবার্ট নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে বললেন, 'শোন, যখন তোমার বাবাকে ফ্ল্যাটটা ভাড়া দিয়েছিলাম তখন কথা হয়েছিল দেওয়াল অক্ষত থাকবে। দেওয়ালে পেরেক ঠোকার মত ভায়তীয় অভ্যেস দয়া করে ত্যাগ করো।'

মেয়েটা হি হি করে হেসে উঠল। তারপর বলল, 'আমি কি একবার ওপরে আসতে পারি?'

'তোমার বাপ-মা কেউ এখন নেই বুঝি?'

'না। খুব একা লাগছিল বলে পেরেক ঠুকছিলাম।'

'ঠিক আছে, মিনিট পাঁচেকের জন্যে আসতে পার!'

রিসিভার নামিয়ে মনে হল কাজটা ভাল না। ভাড়াটের সঙ্গে দহরম করা ঠিক নয়। ইণ্ডিয়া থেকে ফিরে ঘুরতে ঘুরতে এই বোল্টনে এসে মার্থার জন্যেই বাড়ি কিনেছিলেন তিনি। মার্থা চলে যাওয়ার পর নিচটা ভাড়া দিয়েছেন। কিন্তু তিনি একা একাই বেশ আরামে থাকেন। বেল বাজল।

প্যাণ্টের উপর হাফ সিল্ভ শার্টে তাঁকে নেহাৎ খারাপ দেখাচ্ছে না। রবার্ট দরজা খুললেন, 'হ্যালো।'

'হাই।' পনের বছরের মেয়েটা খিলখিলিয়ে হাসল। তিনি কিছু বলার আগেই ঘরে ঢুকে পড়ল সে। রবার্ট প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে উঠলেন। মেয়েটার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই! অত ছোট প্যাণ্ট পরে চলে এসেছে? অথচ ওপরে গলা বন্ধ পুরো হাত সোয়েটার! রবার্ট দরজা বন্ধ করলেন, 'লুক, আমি চাই না। তোমরা দেয়ালে পেরেক ঠোকো।'

মেয়েটা ধপ করে সোফায় বসে পড়ল। তারপর শুরু করল সুর করে গান, 'উই উইল ফলো নান বাট ভার্জিনিয়া বটমানি।'

রবার্ট খেঁকিয়ে উঠলেন, 'স্টপ ইট।'

মেয়েটা হাসল, 'কেন? আমাদের প্রিয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী উপদেশ দিয়েছেন এখনই যেন যৌন-জীবন নিয়ে চিন্তা না করি। কিন্তু 'দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কি লিখেছে জানো?'

'কি লিখেছে?'

'আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভার্জিনিয়া বটমানি নিজেই কুমারীমাতা ছিলেন।'

'উঃ, দেশটার কি হলো। মেজর কিছু বলছে না?'

'ছাই। মেজর শেল্টার দিচ্ছে। বলছে ওটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।' মেয়েটা রিমোট টিপে টিভি চালাল। দু'তিনটে চ্যানেল পাল্টেই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'হাই বব্, কাম হিয়ার, আহা দেশটার কি হল! কি মজা!'

www.boiRboi.blogspot.com

রবার্ট ভ্রু কুঁচকে টিভির দিকে তাকালেন। পর্দায় ফুটে উঠছে, জাতীয় ঐতিহ্য মন্ত্রী ডেভিড মিলার পদত্যাগ করেছেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেটা এখনও গ্রহণ করেননি।

'এটা একটা মজার খবর নাকি?' বিরক্ত হলেন রবার্ট।

'বব! তুমি কোথায় বাস করছ? টিভি দ্যাখোনি, কাগজ পড়োনি?'

'কাগজ আমি পড়ি না, আর ওয়েদার ছাড়া টিভি দেখছি না।'

'মাই গড! তুমি আন্তোনিও দে সাণ্টারের নাম শুনেছ?'

'সে কে?'

'ওঃ, একজন অভিনেত্রী। আমাদের ঐতিহ্য মন্ত্রী, ব্রিটেনের ঐতিহ্য মন্ত্রী মিস্টার মিলার অভিনেত্রী সাণ্টারের সঙ্গে যৌনকাজে এত ক্লান্ত হয়ে পড়তেন যে সরকারি কাজে সময় দিতে পারতেন না। এবং তিনি বিবাহিত, ছেলেমেয়ে আছে।'

'মাই গড! টিভিতে কি বলছে দেখেছ?' বিশ্বাস করতে পারছিলেন না রবার্ট।

ভাষ্যকার তখন জানাচ্ছেন, 'প্রধানমন্ত্রী জন মেজর পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করে বলেছেন এটা মিলারের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রেস যাতে নাক গলাতে না পারে তার জন্য মেজর একটি নতুন আইনকে সমর্থন করেছেন। এই আইন প্রণয়ণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল স্যার ডেভিড ক্যালকটকে। এদিকে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর এই প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু হয়ে গেছে।'

রিমোট টিপে টিভি বন্ধ করে মেয়েটা বলল, 'তোমার বয়স কত বব্?'

আচমকা এইরকম প্রশ্ন কেন বুঝতে না পেরেও তিনি জবাব দিলেন, 'নব্বুই।'

'মাই গড! আর ওই লোকটা মাত্র তেতাল্লিশ। তোমার চেয়ে সাতচল্লিশ বছরের ছোট। অথচ সাণ্টারের সঙ্গে সেক্স করে এমন ক্লান্ত হয়ে যায় যে সরকারি কাজ করতে পারে না। আমি এই কথাটাই বুঝতে পারছি না। তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো বব্। কত বছর বয়স থেকে পুরুষেরা ওসব করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।'

'লুক বেবি, এসব আলোচনা আমার সঙ্গে করা তোমার উচিত হচ্ছে না।'

'মাই গড! 'দ্য পিপল' প্রকাশ্যে লিখছে ওই জন্যে মিলার কাজ

www.boiRboi.blogspot.com

করতে পারছে না আর আমি আলোচনা করলেই দোষ! আমার এক বান্ধবী বলছিল চার্লি চ্যাপলিন নাকি—'

হাত তুলে মেয়েটাকে থামালেন রবার্ট। একটু ভাবলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'সাধারণত শীতপ্রধান দেশে বেশি বয়স পর্যন্ত ছেলেরা সক্ষম থাকে। মিলার স্বাভাবিক নয়। আমি যখন ইণ্ডিয়ায় ছিলাম তখন দেখেছি চল্লিশের পুরুষরাও যৌনজীবন ত্যাগ করেছে।'

'সেইজন্যে তুমি ইণ্ডিয়া থেকে চলে এসেছ?' হাসল মেয়েটা।

রবার্ট ক্ষমা করলেন ব্যাপারটা, 'ইণ্ডিয়া যখন স্বাধীন হল তখন আমার বয়স ছত্রিশ। মার্থা আর থাকতে চাইল না। এখন মনে হয় থেকে গেলে ভাল করতাম।'

'কেন?'

'এইসব শুনতে হয় না। ব্রিটেনের ঐতিহ্যমন্ত্রী যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে আর তার প্রধানমন্ত্রী সেটাকে সমর্থন করছে। ব্রিটিশ হিসেবে কি লজ্জার কথা। এখন কেটে পড়, আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না।'

মেয়েটা উঠল, 'তোমার একা থাকতে কষ্ট হয় না?'

'হয়। সেটা আমার সমস্যা।'

'তুমি আর একটা বিয়ে করছ না কেন!'

এবার হেসে ফেললেন রবার্ট, 'এই নব্বুই বছর বয়সে কে আমাকে বিয়ে করবে?'

মেয়েটা মাথা নাড়ল, 'আই ডোণ্ট নো! মে বি সামওয়ান, একটা এ্যাড দেওয়া যেতে পারে।' সে হাসল। তারপর ছটফটিয়ে চলে গেল।

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর খেয়াল হল রবার্টের। ওর নামটা যেন কি? তিন চারটে নাম একসঙ্গে মারপিট করতে লাগল মাথায়। আজকাল সবকিছু ঠিকঠাক ঠিক সময়ে মাথায় আসে না। দরজা বন্ধ করে তিনি কিচেনে গেলেন। যত্ন করে এক কাপ কফি বানালেন। দেশটার কি হল! ঠিক সময়ে সামার আসে না, কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েও মন্ত্রীর মন্ত্রীত্ব যায় না। চার্লস আর ডায়না তো এখনও যুবরাজ আর যুবরানী অথচ প্রোফুমোকে পত্রপাঠ চলে যেতে হয়েছিল একরকম। একজন ব্রিটিশের যদি ঐতিহ্য না থাকে তাহলে আর কি থাকলো। এই যে ইয়ং জেনারেশন তৈরি হচ্ছে, এদের যৌবনে দেশটা তো আরও উচ্ছন্নে যাবে। এত ছোট

www.boiRboi.blogspot.com

প্যান্ট পরে কেউ ঘরের বাইরে যায় ?

কফিতে চুমুক দিয়ে জানলায় ঝুঁকে দাঁড়ালেন রবার্ট। বৃষ্টিটা বন্ধ হয়েছে বলে মনে হয়। ছাতা ছাড়াই একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে। লোকটা ইণ্ডিয়ান অথবা পাকিস্থানি। মেজাজ নষ্ট হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মার্থা তাঁর সর্বনাশ করে গিয়েছে। লণ্ডনের অনেক দূরে বোণ্টন নামের এই ছোট্ট শহরের রাস্তায় যদি প্রতি পাঁচজনে একটা ভারতীয় বা পাকিস্থানিকে দেখতে হয় তাহলে এদেশে ফিরে আসার দরকার কি ছিল ? কিছু ব্রিটিশ এখনও রয়ে গেছে ইণ্ডিয়ায়। আর তারা আছে রাজার মত। বাংলো, লন, গল্ফ খেলা, একগাদা ঝি চাকর, কী আরাম ! তখন মার্থা ভয় পেল। যদি ইণ্ডিয়ানরা প্রতিশোধ নেয়। তার ওপর মাতৃভূমি টানতে লাগল। বোঝ এখন ! এই তো মাতৃভূমি ? হয়তো দেখা যাবে গোটা ব্রিটেনের ওয়ানফিফ্থ মানুষই হল এশিয়ার। লণ্ডনের মেয়র একজন ইণ্ডিয়ান, এমনটা হতে আর বেশি দেরি নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় মার্থার ভয়টাই ঠিক। ইণ্ডিয়ানরা প্রতিশোধ নেবে। ওরা পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদে নির্বাচিত হয়ে যাবে। একটাই ভরসা তাঁকে ততদিন বেঁচে থাকতে হবে না।

রবার্ট আবার বিবিসি ধরলেন। তাঁর চোখ বড় হয়ে উঠল। জেসাস ! কি দেখছেন তিনি ! রোদ উঠবে ! আজই। বিকেল আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে। থাকবে এক ঘণ্টা। আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আগামীকাল আরও একটু বেশী সময় ধরে রোদ থাকবে। আঃ। রবার্ট ছুটে গেলেন জানালায়। কাঁচের আড়াল থেকে রাস্তার যেটুকু দেখা যাচ্ছে। মনটা আনন্দে ভরে গেল। টেলিফোনের কাছে ছুটলেন তিনি। মার্থার বান্ধবী এমিকে খবরটা দেওয়া দরকার। বড় বাতের ব্যথায় ভুগছে বেচারা। 'হ্যালো, এমি ? শুনেছ ? ওহো, বিবিসি দ্যাখোনি ? আজ রোদ উঠবে। পরিষ্কার ঝকঝকে রোদ। আরে, সকাল থেকে দিনটা কেমন যাবে আজকাল আর বোঝা যায় না। তুমি কখনও ভাবতে পেরেছ ব্রিটেনের ঐতিহ্যমন্ত্রী যৌন কেলেঙ্কারীতে জড়িয়েও টিকে থাকবে। হ্যাঁ খবরটা পাওনি দেখছি ! যা হোক, আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে। বেরুবে নাকি ? হ্যাঁ, আমি বের হব। শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করা দরকার। যদি হাঁটতে পার তাহলে চলে এসো পার্কে। বাই।'

www.boiRboi.blogspot.com

বেলা বারোটা থেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রবার্ট। রোদ উঠলেও একটু ঠাণ্ডা থাকবে। হালকা পুল ওভার পরবেন না মোটা হাফশিল্ভ? এখন মে মাস। হলুদ রঙটা মন্দ নয়। ওয়ার্ডরোব থেকে জামাকাপড় বের করে তা থেকে পছন্দে পৌঁছাতেই অনেকটা সময় গেল। মাঝে মাঝে জানালায় যাচ্ছেন তিনি। হ্যাঁ, আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে একটু একটু করে। মেঘ সরে যাচ্ছে। এইসময় টেলিফোন বাজল।

'হ্যালো।' খুশি মনে রিসিভার তুললেন তিনি।

'মিস্টার রবার্ট স্টিভেনসন প্লিজ।'

'হ্যাঁ। কথা বলছি।'

'আমি ডিপার্টমেণ্ট অফ ফরেন সার্ভিস এ্যাণ্ড একটার্নাল এ্যাফেয়ারস্ থেকে বলছি। আমাদের একজন অনারেবল গেস্ট আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আপনি অনুগ্রহ করে কথা বলবেন?'

'আপনাদের গেস্ট মানে ব্রিটেনের গেস্ট।' নিশ্চয়ই বলব। হঠাৎ নিজেকে খুব মূল্যবান বলে মনে হচ্ছিল তাঁর।

'হ্যালো। আমার নাম এস. কে. রয়। আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি।'

'ভারতবর্ষ!' বিড়বিড় করলেন রবার্ট।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত কিন্তু আমার ঠাকুর্দার জন্যে বাধ্য হয়ে কাজটা করতে হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি কি কখনও দার্জিলিং-এ পোস্টেড ছিলেন?'

'দার্জিলিং। হ্যাঁ! ছিলাম। ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হবার আগে পর্যন্ত ছিলাম?'

'তাহলে ঠিক আছে। আপনার একজন বাঙালি সেক্রেটারি ছিল, মনে আছে?'

'সেক্রেটারি? আমি ওকে বাবু বলে ডাকতাম।'

'ঠিক। তাঁর নাম শশীকান্ত রায়?'

'হ্যাঁ। মনে পড়ছে। শশীকান্ত। খুব ভদ্র এবং পরিশ্রমী।'

'তিনিই আমার ঠাকুর্দা।'

'মাইগড। তা আপনি এখানে কি করছেন?'

'আপনাদের দেশ আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছে। আমি বিজ্ঞানচর্চা করি। এখানে দিন তিনেক থাকব। ঠাকুর্দা বললেন

www.boiboi.blogspot.com

আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আচ্ছা, মিসেস স্টিভেনসন এখন কেমন আছেন?'

'মার্থা? সে নেই।'

'ওহো! দাদু আমাকে একটা খাম দিয়েছিলেন মিসেস স্টিভেনসনকে দেওয়ার জন্যে। বলেছেন ওটা যেন অন্য কারো হাতে না দিই। শুনে উনি দুঃখ পাবেন।'

'কি আছে খামে?' রবার্টের গলার স্বর বদলে গেল।

'আমি জানি না। সীল করা। দাদু বলেছেন মিসেস স্টিভেনসনই ওটা ওঁর কাছে রাখতে দিয়েছিলেন। কোন গোপন ব্যাপার বোধহয়। দাদুর শরীর ভাল না তাই ওটা যার জিনিস তাঁকেই ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।'

'আমাকে দেওয়া যাবে না?'

'তাহলে দাদুর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে হয় আমাকে।'

অবাক হলেন রবার্ট, 'শশী রায়ের বাড়িতে ফোন আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। ওঁর চেষ্টায় আমার বাবা ডাক্তার হয়ে যাওয়ায় অবস্থাটা বদলে গিয়েছে। ঠিক আছে, যদি যোগাযোগ হয়, আমি খামটাকে আপনার কাছে পৌঁছে দেব। বাই।'

রিসিভার রেখে দিল ছোকরা। হঠাৎ নিজেকে জড়ভরত বলে মনে হল রবার্টের। তাঁর বাবুর ছেলে ডাক্তার, তার ছেলে বৈজ্ঞানিক হয়েছে আর ব্রিটেন তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছে? ভাবা যায়? বাবু ভাল ইংরেজি লিখত একথা ঠিক। মাঝে মাঝে তাঁর ভুলও ধরিয়ে দিত। বাট আফটার অল হি ওয়াজ এ বাবু। লোকটাকে শেষের দিকে তিনি অপছন্দ করতে আরম্ভ করছিলেন। মার্থা যেন বড্ড বেশি ওর সঙ্গ চাইত। তাঁর সময় ছিল না বলে একবার ওই বাবুর সঙ্গে টাইগার হিলে চলে গিয়েছিলেন মাঝরাতে, সূর্য ওঠার মুহূর্তে হাজির থাকবে বলে। লোকটা এমন অধস্তন যে এ নিয়ে কথা বলা নিচু মনের প্রকাশ হয়ে যেত। কিন্তু মনে মনে সেটাকে মনে রেখেছিলেন তিনি। জিমখানা ক্লাবে এক বাগানের ম্যানেজার যখন মার্থার সঙ্গে নাচতে চাইল আর মার্থা রাজী হল না তখন ক্ষেপে গিয়ে দু'চার কথা শুনিয়েছিলেন। পুষে রাখা রাগটা অন্যভাবে প্রকাশ করতে পেরে বেশ হাল্কা লেগেছিল তখন।

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু বাবুর কাছে কি জিনিস রেখে আসতে পারে মার্থা? একটা বন্ধ খামে কি কোন কাগজ, চিঠি আর সেই বাবুকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দিয়ে রেখেছে যাতে অন্য কারো হাতে খামটা না দেয়। অদ্ভুত! পঞ্চাশ বছর কম সময় নয়। এদেশে এসেও মার্থা চল্লিশের ওপর বেঁচে ছিল। কই, তাঁকে একবারও খামটার কথা বলেনি তো! তার মানে মার্থা ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। একটা ব্যাপার যে লুকিয়ে রাখতে পারে সে অনেক কিছুই গোপন করতে সক্ষম। রবার্টের বুকের ভেতরটা কেমন হু হু করে হেসে উঠল। তিনি ভাবতেই পারছেন না মার্থা এমন কাজ করতে পারে। তাহলে তো তাঁর অজান্তে মার্থা অন্য লোকের সঙ্গে প্রেম করতে পারত, শোওয়াশুয়ি হলেও তিনি জানতে পারতেন না। তাঁর সংসারের সব কাজ ঠিকঠাক করে যে মেয়ে ভারতীয় বাবুর কাছে একটা খাম গোপনে রেখে এসে মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারে তাকে আর বিশ্বাস করেন কি করে!

এই মুহূর্তে সামনে পেলে একটা হেস্তনেস্ত করতেন তিনি। জীবনে কখনও মার্থার গায়ে হাত তোলেন নি, এখন—। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেললেন রবার্ট। হঠাৎ মনে হল তিনি যেন একটু আগ বাড়িয়ে ভেবে চলেছেন। একসময় অধস্তন কর্মচারীর সঙ্গে মার্থা এমন কিছু করতে পারে না। কিছুতেই নয়। তিনি ছোট হয়ে যাবেন এমন কাজ তো নয়ই। হয়তো সস্নেহে মার্থা কোন কিছু উপহার হিসেবে দিয়েছিল বাবুকে। বাবু সেটা রেখে দিয়েছিল। এমনই হতে পারে ব্রিটিশদের প্রতি রাগবশতঃ আজ সেটা ফেরত দিতে চায়। যে দিয়েছে তার হাতে দিলেই ভাল লাগবে বলে নাতিকে মার্থার কথা বলেছে।

এমনটা হতেই পারে। মন হালকা হল, সামান্য। আর ব্রিটিশ সরকারের কী হাল হয়েছে দ্যাখো, একজন ভারতীয়কে ডেকে আনতে হচ্ছে অতিথি হিসেবে বিজ্ঞানের ব্যাপারে। যাকে ডাকছে তার পেডিগ্রি কি? বাবুর নাতি। হুঁঃ।

খুব ধীরে ধীরে পোশাক পরলেন রবার্ট। টাই বাঁধলেন। ছাতা নিলেন, সঙ্গে টুপি। দরজা বন্ধ করে ধীরে ধীরে নামছিলেন এমন সময় সেই কিশোরী দরজা খুলল, 'হাই বব্।'

'হ্যালো।'

'আমরা এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিচ্ছি। এইমাত্র মায়ের সঙ্গে আমার কথা

www.boiRboi.blogspot.com

হল। অন্য ভাড়াটে জোগাড় করে নাও উইক এন্ডেই চলে যাব।' মেয়েটা দরজা বন্ধ করে দিল।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রবার্ট। ইচ্ছে করছিল বন্ধ দরজায় শব্দ করে বলেন, 'তোমরা এটা করতে পার না। উঠে যাওয়ার আগে নোটিশ দিতে হবে। কাগজে কলমে তাই লেখা আছে।' নাঃ, আবার ল-ইয়ারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

রাস্তায় পা দিলেন রবার্ট। ইতিমধ্যেই শুকিয়ে গিয়েছে পায়ের তলার জমি। মুখ তুলে আকাশটা দেখবার চেষ্টায় ছিলেন হঠাৎ কানে এল, 'হাউ ফার বব্?'

চমকে তাকালেন। সামনের মাখনের দোকানের জর্জ ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। লোকটা রসিকতা করতে চাইছে নাকি? তিনি উত্তর দিলেন, 'তোমার আর আমার থেকে সমান দূরত্ব।' তিনি দাঁড়ালেন না।

এডওয়ার্ডদের বিয়ারের দোকানের সামনে পৌঁছাতেই আবার চিৎকার, 'হাই বব্! সামার এসে গেল শেষ পর্যন্ত।'

বব্ হাসলেন। এড্ তাঁর চেয়ে ছোট কিন্তু খুব ছোট নয়।

'ব্যবসা কেমন চলছে?'

'একই রকম। আজকালকার ছেলে ছোকরারা বিয়ারের বদলে ভোদকা উইদ টনিক খাওয়া বেশি পছন্দ করছে।' ভুঁড়ির ওপর প্যান্ট তুলতে তুলতে বিশাল চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এল এড্। ওর গোঁফ পেকে ঝুলে পড়েছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে এড্ বলল, 'চললে কোথায়?'

'প্রথম সামার!' রবার্ট হাসলেন। তারপর ইচ্ছে করেই বললেন, 'মার্থা খুব ভালবাসত এমন দিনে হাঁটতে।'

'মার্থা? ওহো! ইয়েস। খুব ভাল মেয়ে ছিল সে।'

'ওর মুখ মনে আছে তোমার?'

'তা থাকবে না? কতদিন যাতায়াতের পথে কথা বলে গেছে।'

'আচ্ছা এড্ একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!'

'মার্থাকে তোমার কিরকম মনে হত? চরিত্রের কথা বলছি।

'দ্যাখো বব্ চরিত্র অনেক রকম হয়। ও খুব ভাল মেয়ে এইটুকু মনে আছে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।' রবার্ট হাঁটতে লাগলেন, চরিত্র অনেক রকমের হয়। সুতরাং এড্ কথাটা এড়িয়ে গেল। যৌবনে এড্ কি না করেছে। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই পেছনে লাগত। আর মার্থা তো সত্যিকারের সুন্দরী ছিল।

হঠাৎ চিৎকারটা কানে এল। থমকে দাঁড়ালেন রবার্ট। উল্টোদিক থেকে গোটা কয়েক ছেলেমেয়ে চিৎকার করতে করতে আসছে কেন? একজন একটা প্যাকেটকে এমন ভাবে লাথি কষাল যে সেটা উড়ে গিয়ে পড়ল মাঝরাস্তায়। এই চিৎকার এবং বেপরোয়া চলাফেরা যে ওদের আনন্দের প্রকাশ তা বুঝতে সময় লাগল। তিনটে কালো ছেলে আছে ওদের মধ্যে। নিশ্চয়ই আফ্রিকা থেকে স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে আসা ছেলে। ব্রিটেনকে ওরাও শেষ করে দিচ্ছে। আর ওই সাদা মেয়েটা, তুই কী করে কালোটাকে কোমর জড়িয়ে ধরতে দিলি! এই বোল্টনেই যদি এমন অবস্থা তাহলে লণ্ডনে তো হাঁটাই যাবে না। খুব কষ্ট হচ্ছিল রবার্টের। সারা পৃথিবী যেন ওদেশটাকে কলোনি বানিয়ে ফেলেছে।

তিরতিরে রোদ উঠেছে। আহা! পার্কের সামনে পৌঁছে মুখে হাসি ফুটল তাঁর। এমি আসছে। বেচারার হাঁটতে কষ্ট হলেও সেজেছে খুব।

'হ্যালো এমি!'

'হ্যালো বব্।'

'শেষ পর্যন্ত এবারের সামারটাকে দেখতে পেলাম।'

'বি বি সি-ও ঠিক বলল শেষ পর্যন্ত।'

'যা বলেছ। শরীর কেমন আছে?'

'শরীরের কথা ছেড়ে দাও।'

'দ্যাখো, তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড় তবু—।'

'চুপ করো। তোমাকে তিনটে বাচ্চা পেটে ধরতে হয়নি। এমি খ্যাক-খ্যাক করে উঠল, এখন কবরে গেলেই হয়। মাঝে মাঝে ভাবি মার্থা ভাগ্যবতী।'

'কেন? কেন মনে হয়?' রবার্ট সতর্ক হলেন।

'চল, বেঞ্চিটায় বসা যাক। পা ব্যথা করছে।' এমি এগিয়ে গিয়ে একটা খালি বেঞ্চিতে বসে পড়ল। কয়েকদিন ভিজে ভিজে সিমেন্টের বেঞ্চিও কেমন স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে রবার্ট বসতে বাধ্য হলেন। প্রশ্নটা যেন এমির কানেই যায়নি। সে তার তোবড়ানো গাল তুলে আকাশ

www.boiRboi.blogspot.com

দেখছে। প্রায় এরকম চেহারাই হয়ে গিয়েছিল মার্থার। এ্যাদ্দিন বেঁচে থাকলে বান্ধবীর চেয়ে কম কিছু হত না। কোঁচকানো চামড়া, রোঁয়া ওঠা বেড়ালের মত।

'মার্থা তোমার খুব বান্ধবী ছিল, না ?'

'ব্যাপারটা কি ? কথাটা তুমি জানো না ?'

'আচ্ছা, আমি ছাড়া মার্থা অন্য কারো প্রেমে পড়েছে কখনও ?'

হঠাৎ হেসে উঠল এমি, 'মাই গড ! তুমি কি নিশ্চিত যে তোমার প্রেমে সে পড়েছিল ?

না না, আগে কথাটার উত্তর দাও।'

'আমার তো উত্তর পেয়ে গেলে।' মুখ ফিরিয়ে নিল এমি।

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল রবার্টের। অতি কুচুটে মহিলা। মার্থা বেঁচে থাকতেই একে তিনি দেখতে পারতেন না। স্ত্রীর বান্ধবী হওয়া সত্ত্বেও এড়িয়ে চলতেন। হঠাৎ গম্ভীর গলায় তিনি ঘোষণা করলেন, 'কিন্তু আমি একটা ঘটনা জানতে পেরেছি।

এমি সন্দেহের চোখে তাকাল, 'কি রকম ?'

চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়লেন রবার্ট, 'পেয়েছি !'

'যার কথা বলছ সে এখন কবরে শুয়ে আছে।'

'তাতে তো ঘটনাটা মিথ্যে হয়ে যায় না।' অভিনয় করে যাচ্ছিলেন রবার্ট।

'বুঝতে পেরেছি। জন তোমাকে বলেছে।'

'জন ?' বেশ হতভম্ব হয়ে গেলেন রবার্ট।

'ক্যাসিনোর মালিক ছিল। প্রথমে আমার পেছনে লেগেছিল, পাত্তা না পাওয়াতে মার্থাকে জপাতে লাগল। ওর ভদ্রতাবোধকে দুর্বলতা বলে ভুল করল জন।'

'তারপর ?' নিশ্বাস চাপলেন রবার্ট।

'তারপর আর কি ? এসব পুরোন ছেঁদো কথায় এখন লাভ কি। দুজনেই তো মরে গিয়েছে। সারাদিন একা থাকত, ছেলেপুলে হয়নি, বেচারা তাই ক্যাসিনোয় যেত।'

'গিয়ে জুয়ো খেলত ?'

'তা একটু আধটু, আমিও খেলেছি।'

'জনের সঙ্গে সম্পর্কটা, মানে, কতদূর এগিয়েছিল ?'

www.BanglaBook.org

'দ্যাখো, জন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলত, মার্থা শুনে যেত। ব্যস।'

গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন রবার্ট। হ্যাঁ এক সময় মার্থা তাঁকে বলত ক্যাসিনোয় যাওয়ার কথা। তিনি যে সেটা পছন্দ করতেন না তাও সে জানত। কিন্তু জন যে প্রেম নিবেদন করত তা জানা ছিল না। এমির কথা অনুযায়ী জন প্রেম নিবেদন করেছে, মার্থা কিছুই বলেনি। তিনি ঘুরে তাকালেন, 'মার্থা তোমাকে ইণ্ডিয়ার কথা বলত? মনে করে দ্যাখো তো!'

'হ্যাঁ। ওর খুব ভাল লেগেছিল ইণ্ডিয়ায় থাকতে।'

'ভাল লেগেছিল? ও-ই তো জোর করে চলে এল।'

'তা জানি না। যে শহরে থাকত তার গল্প করত খুব। হ্যাঁ, কি একটা জায়গা যেন, যেখান থেকে সানরাইজ খুব ভাল দেখা যায়—'

'টাইগার হিল।' খসখসে গলায় বললেন রবার্ট।

'হ্যাঁ। টাইগার হিলের বর্ণনা করত সে। বলত অত ভাল জায়গা নাকি পৃথিবীতে হয় না। আমি ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওখানে টাইগার আছে নাকি? সে জবাব দিয়েছিল, একদম না। তবে বেড়ালের মত স্বভাবের মানুষ সেখানে গেলে কখনও কখনও টাইগার হয়ে যায়। ওহো, এবার উঠব বব্।'

'এত তাড়াতাড়ি?' রবার্ট বাধ্য হলেন উঠতে, 'ওখানকার কথা সে বলেছে তোমাকে? কোন বাবু? মানে আমার এক ক্লার্ক যার সঙ্গে সে টাইগার হিলে গিয়েছিল, তার কথা কিছু বলেছিল?'

হাঁটতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল এমি, তারপর মাথা নাড়ল, 'একজনের কথা খুব বলত মার্থা। লোকটা ওকে কি করে আত্মবিশ্বাস বাড়ানো যায় শিখিয়েছিলেন। ওহো, মনে পড়েছে। লোকটার সঙ্গে ওর একটা চুক্তি হয়েছিল।'

'চুক্তি।'

'হ্যাঁ। দুজনে যা বিশ্বাস করে তা একটা কাগজে লিখে খামে বন্ধ করে দুজনকে দিয়েছিল। তিরিশ বছর পরে দেখা করে সেই খাম খুলে দেখা হবে তখনও সেই বিশ্বাসটা আছে কিনা। মার্থা প্রায়ই বলত কাজটা করা হচ্ছে না। সে চিঠিও দিয়েছিল লোকটাকে কিন্তু জবাব পায়নি। হয়তো ঠিকানা বদলেছে কিংবা মরেই গেছে।' এমি হাসল, 'মজার খেলা না? আমি বলতাম সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মন পাল্টায় অতএব

www.boiRboi.com

বিশ্বাসও পাল্টাবে। মার্থা তখনও স্বীকার করেনি। তাও তো অনেক-দিন হয়ে গেল।'

'তাহলে মার্থার কাছে সেই লোকটার খাম ছিল?'

'থাকার তো কথা। কারণ দুজনের সামনেই সেটা খোলার চুক্তি ছিল।'

এমি চলে গেল। নিজেকে খুব অসহায়, ছিবড়ে হয়ে যাওয়া মানুষ বলে মনে হচ্ছিল রবার্টের। তাঁরই এক বাবুর সঙ্গে মার্থা এসব করেছে অথচ তাঁকে কিছুই জানায়নি। এড্ কিংবা জনকে তিনি মেনে নিতে পারেন, ওরা ইণ্ডিয়ানদের মত অত সেণ্টিমেণ্টাল নয়। বাট দ্যাট বাবু—। রবার্ট থপ থপ করে হাঁটতে লাগলেন। রোদ চলে গিয়েছে। আকাশে আবার মেঘেদের আনাগোনা, হঠাৎ মনে হল ইণ্ডিয়ায় গিয়ে সেই বুড়ো-টাকে দু'ঘা কষিয়ে দিলে কেমন হয়। শরীরটা নব্বুই বছরের না হলে তিনি নিশ্চয়ই যেতেন। ব্যাঙ্কের পাশ দিয়ে রাস্তাটা সংক্ষেপ করতেই এগিয়ে গিয়ে মনে হল পাশেই কবরখানা আর সেখানেই মার্থা শুয়ে আছে। প্রথম প্রথম প্রতি রবিবার, জন্মদিন মৃত্যুদিনে যেতেন তিনি ফুল নিয়ে। আজকাল আর যাওয়া হয় না। আজকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন নাকি তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার মার্থা কেন করল? কবরখানার গেটের দিকে তাকিয়ে তিনি মাথা নাড়লেন। যাকে জিজ্ঞাসা করবেন তার তো একদম ইচ্ছা করে না। মার্থার পাশের জায়গাটা তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট করা রয়েছে। ভাবতেই গায়ে কাঁটা ফোটে।

বৃষ্টি নামলো। মাঝে মাঝে রোদ ওঠার একটা খেলা চলল কয়েকদিন ধরে। এই কদিনে রবার্টের কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। নিচের ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে বটে কিন্তু বাড়তি ভাড়া দিয়ে গেছে। ওদের চলে যাওয়ার কারণ অদ্ভুত। মেয়েটা শব্দ করতে চায়। এ বাড়িতে সেটা নিষেধ বলে চলে যাচ্ছে। এমনটা কে কবে শুনেছে? মার্থারের সমস্ত জিনিসপত্র একটা আলমারিতে তোলা ছিল। রবার্ট সেগুলো খুঁটিয়ে দেখেছেন কোন মুখবন্ধ পান কিনা। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাই বৃথা হয়েছে। মার্থার রেখে যাওয়া জিনিসপত্রে কোন গোপন ঘটনা নেই। এমি যা বলেছে তা তাহলে সত্যি নয়। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে মার্থা একটা লকার নিয়েছিল ব্যাঙ্কে। দুজনের নামেই। যতদূর জানেন তাতে কিছুই রাখা হয়নি।

www.boiRboi.blogspot.com

রাখার সময় পায়নি মার্থা। তাদের একাউণ্ট থেকে প্রতি বছর লকারের ভাড়া এ্যাডজাস্ট করে নেয় ব্যাঙ্ক। একবার লকারটা দেখতে হবে।

সোমবার সকালে টেলিফোন বাজল। জামা-প্যাণ্ট পরে তৈরি হচ্ছিলেন রবার্ট। রিসিভার তুললেন। তাঁর এজেণ্ট বলল, 'একজন ভাড়াটে পেয়েছি। আগের ভাড়াটের চেয়ে বেটার। মেয়েটি একাই থাকবে।'

'একা মেয়ে?'

আঃ তাতে তোমার কি সমস্যা বব্? এ আওয়াজ করবে না।'

ঠিক আছে। কিন্তু মেয়েটা কি করে?'

'জিজ্ঞাসা করিনি। এ্যাডভান্স দেবে, থাকবে। ইণ্ডিয়ানরা টাকা পয়সার ব্যাপারে—।'

'ইণ্ডিয়ান? আমার বাড়িতে? ওহো, না। কিছুতেই নয়।'

'তুমি ঠিক বলছ বব্?'

একশবার ঠিক বলছি। ওরা ব্রিটেনকে ইণ্ডিয়া বানাচ্ছে, বোল্টনকে প্রায় বানিয়ে ফেলেছে কিন্তু আমার বাড়িটাকে—কিছুতেই ঢুকতে দেব না।' টেলিফোন নামিয়ে রেখে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বর্ষাতি আর ছাতা নিয়ে।

রাস্তায় লোক নেই, বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। পাগল ছাড়া কেউ বাইরে বের হবে না। কিন্তু তিনি তো পাগলই হয়ে গেছেন। লকার খুলে উঁকি মারতেই একটা বড় খাম দেখতে পেলেন তিনি। কাঁপা হাতে সেটা বের করতে মার্থার হাতের লেখা নজরে পড়ল, 'আমি যদি মরে যাই তাহলে দয়া করে নিচের ঠিকানায় পোস্ট করে দিও।'

ঠিকানা দেখেই গা জ্বলে উঠল তাঁর। বাড়ি ফিরে এলেন কাঁপা পায়ে।

শোওয়ার ঘরে ঢুকে বড় খামটা খুলতেই একটা ছোট খাম বের হলো। এটা তাঁর অফিসের খাম, এতদিন বাদেও চিনতে পারলেন। লোকটা অফিসের স্টেশনারী মিস্-ইউজ করেছে। খামটার মুখ বন্ধ। কি লিখেছে লোকটা? খুলব খুলব করেও তিনি খুলতে পারছিলেন না। এতদিনকার শিক্ষা বাধা তৈরি করেছিল। শেষ পর্যন্ত অনেক অস্বস্তি সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নিলেন ওটাকে ইণ্ডিয়াতে পাঠিয়ে দেবেন। মার্থার শেষ অনুরোধ রাখবেন।

www.boiRboi.blogspot.com

সেই বিকেলেই চিঠি এল লণ্ডন থেকে। এস. কে. রায় পাঠিয়েছে। সেই বাবুটার নাতি যে ব্রিটেনের অতিথি হয়ে এসেছে। রাগে খামটাকে ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েও মনে পড়ে গেল। মার্থা ঐ লোকটার কাছে যা গচ্ছিত রেখে এসেছিল তাই রয়েছে এখানে। বাবু এতদিন পরে পাঠিয়ে দিয়েছে। খাম খুললেন তিনি। লণ্ডন থেকে এস. কে. রায় লিখেছে, ডিয়ার মিস্টার স্টিভেনসন, আমার দাদুর সঙ্গে কথা বলেছি। মিসেস স্টিভেনসনের মারা যাওয়ার খবর পেয়ে তিনি খুব দুঃখিত এবং আপনাকে সহানুভূতি জানাতে বলেছেন। যা হোক, দাদুর ইচ্ছা মতন খামটা আপনার কাছে পাঠালাম। ধন্যবাদ সহ—।'

খামটাকে দেখলেন তিনি। সেই একই খাম। মার্থাও স্টেশনারীর মিস্-ইউজ করেছে। কাঁপা হাতে খামটাকে ছিঁড়লেন রবার্ট। একটা ভাঁজ করা কাগজ। কাগজে চোখ রাখলেন। তাঁর সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। কোন রকমে শরীর তুলে লকার থেকে আনা খামটার মুখ ছিঁড়লেন তিনি। একই রকম কাগজ। ওপরে লেখা দশই মার্চ, ছেচল্লিশ টাইগার হিলের সকাল। তাঁর নিচে লেখা, 'আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। আমৃত্যু করব। শশীকান্ত রায়।'

রবার্টের মনে হচ্ছিল তিনি শূন্যে ভেসে চলেছেন। প্রথম কাগজটা আবার তিনি তুলে ধরলেন, 'দশই মার্চ, ছেচল্লিশ, টাইগার হিলের সকাল। আমি ববকে ভালবাসি। মার্থা স্টিভেনসন।'

বাইরে বৃষ্টি পড়ে চলেছে সামনে। রবার্ট টিভি খুললেন। খবর হচ্ছে। লণ্ডনের এক পাড়ায় ভারতীয়দের সঙ্গে সাদা ছেলেদের বিরোধ লেগেছে। তিনজন ভারতীয়কে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। টিভি বন্ধ করলেন তিনি। তারপর টেলিফোন তুললেন, 'ম্যাক, আমি বব্। রবার্ট স্টিভেনসন।' হ্যাঁ, তুমি মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিতে পার। বাই।'

www.boiRboi.blogspot.com

এয়ারপোর্টে যে ছেলেটি আমাদের নিতে এসেছিল তাকে দেখতে সিনেমার নায়কের মত। সঙ্গের মেয়েটিকে তার প্রেমিকা ভাবতে পারলে ভাল লাগত। এয়ারপোর্টটা তেমন বড় নয়। হালকা রোদ ছিল কিন্তু সেই সঙ্গে কনকনে ঠাণ্ডাও। ছেলেটি আমাদের অভিবাদন জানাল, "আপনাদের মত বিখ্যাত কবিদের পেয়ে আমরা খুব খুশী।"

চমকে তাকালাম। এ বলে কি! ইংরেজিতেই তো কথা বলল। এরা কি গদ্য-লেখককেও কবি বলে। আমার পাশে যে ভদ্রমহিলা বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলেন তিনি হাসলেন। আমরা গাড়িতে উঠলাম। তখনও আমার জন্যে বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

গোড়াটা বলে নিই। অ লা বো, মানে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং আর্ট কলেজের মাস্টারমশাই অমরদা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। নরওয়ের বার্গেন শহরে একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছে এবং সেখানে আমাকে গল্প পড়তে যেতে হবে। আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ-মশাই জানালেন, আমি একা নই, আমার সঙ্গে একজন কবি যাবেন, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান বন্ধুত্ব সমিতির উদ্যোগে আমাদের পাঠানো হচ্ছে।

বাংলা সাহিত্যে যারা লেখালেখি করেন তাঁদের অল্প-স্বল্প চিনি। দিন সাতেক সঙ্গী হবেন কোন্ কবি তা প্রথমে জানতে পারিনি। শেষ মুহূর্তে জানলাম তিনি চিত্রিতা দেবী। এই বর্ষীয়সী মহিলার নাম আমরা নানা কারণে শুনেছি। খুব ছেলেবেলায় এঁর লেখা চোখে পড়েছে। উপনিষদ নিয়ে ওঁর কাজের কথা কানে এসেছিল। কিন্তু কবি হিসেবে তিনি প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন কিনা সে ধারণা ছিল না। সেটা অবশ্য নিজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দু'চারটে গল্প লিখছি মানে আমার সিং বেরিয়েছে বলতে পারি না, সাহিত্যের সিংহ তো অনেকেই আছেন।

এও না হয় গেল। নরওয়ের বার্গেন শহরে যে আস্তানায় আমাদের তোলা হল তা নেহাৎ মন্দ নয়। আর তার পরেই জানতে পারলাম ওখানে যা হচ্ছে তা হল কবি সম্মেলন। গদ্য লেখকের কোন ভূমিকাই

www.boiRboi.com

নেই সেখানে। যাকে বলে তলপেটে ঘুষি খাওয়া সেই অবস্থা আমার। এ জীবনে কবিতা লেখা আর আমার হল না। সবার সব হয় না, আমারও কবি হওয়া হয়ে ওঠেনি। বাঙালি মায়ের পেট থেকে পড়েই কবিতা লেখে, আমি কেন ব্যতিক্রম জানি না। এখন কবিদের কি রবরবা। তাদের একতা চোখে পড়ে বেশ। কিন্তু আমার হাত দিয়ে কিছুতেই কবিতার লাইন বের হতে চায় না। সুনীলদাকে সেই কারণে আমৃত্যু ঈর্ষা করব। এক-সঙ্গে দারুণ গদ্য আর মাথা খারাপ করে দেওয়া কবিতা যে ভদ্রলোক লিখতে পারেন তাঁর পাশে তো কলকাতার সব সুন্দরীরা ভিড় করবেই। যতই সাধ হোক, আমি কবিতা লিখতে পারিনি কখনও। এখন তো আর 'পাখিসব করে রব' লিখলে চলবে না। কবিতা এখন যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক। কুমুদরঞ্জন মল্লিকরা যে কবিতা লিখতেন তা থেকে অনেক চেহারা পালটিয়েছে। কিছু কিছু পুরোন মানুষের কবিতার নিদর্শন যদিও এখনও কথাসাহিত্যের পাতায় পাই কিন্তু তা মিউজিয়াম দেখানোর মতনই।

চিত্রিতা দেবীকে আমার সমস্যা বললাম। উনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। খুব সহানুভূতি নিয়ে বললেন, 'ওমা! আপনি কবিতা লেখেন না?'

মাথা নেড়ে না বললাম।

'তাহলে এলেন কেন?'

'আমি তো জানতামই না এটা কবি-সম্মেলন। আমাকে কেউ বলেনি। ছি ছি ছি। কত বিখ্যাত কবি ছিলেন বলুন তো।'

'বিখ্যাত মানে?'

'সুভাষদা, নীরেনদা, শঙ্খ ঘোষ, সুনীলদা, শক্তিদা। বাংলা সাহিত্যকে কবি হিসেবে যাঁরা ঠিকঠাক পৌঁছে দিতে পারতেন এখানে।'

'তাহলে কি করবেন?'

'ফিরে যাব। যা নই তাতে ভাগ বসাব কেমন করে?'

'আপনি ফিরে গেলে এদের কোন লাভ হবে না। এক কাজ করুন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ আছে আপনার কাছে।'

আজ্ঞে না। ওসব নিয়ে খামোকা আসব কি জন্যে?'

'থাকলে তাই পড়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রচার হয়ে যেত।'

সমস্যাটা উদ্যোক্তাদের জানালাম। তাঁরা বিব্রত। শুনলাম স্ক্যান্ডি-

www.boiRboi.blogspot.com

নেভিয়ান দেশগুলোর সব বিখ্যাত কবি আসছেন এখানে। তাঁরা সকাল থেকে সন্ধ্যে নিজের ভাষায় কবিতা পড়বেন। বাইরের আমন্ত্রিতদের বলা হচ্ছে ইংরেজিতে কবিতা পড়তে। অবশ্য এখানে ইংরেজি বুঝতে পারে বড় জোর দশ শতাংশ লোক।

হে পাঠক, স্বীকার করছি, সেই রাতটার কথা। কলকাতা থেকে কোপেনহেগেন হয়ে বার্গেনে পৌঁছনোর দীর্ঘ প্লেন যাত্রার যথেষ্ট ক্লান্তি, যা জেট ল্যাগ হলেও হতে পারে, তা উপেক্ষা করে হোটেলের ঘরে কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলাম কবিতা লিখতে। মাইকেল রবীন্দ্রনাথ অথবা যে কোন বাঙালি কবি দয়া করে আমার ওপর ভর করুন। সেই কবিতা লেখা হয়ে যাওয়ার পর ইংরেজিতে অনুবাদ করতে হবে। দুঘণ্টা চেষ্টার পর বুঝলাম যার আটে হয় না তার আশিতেও হবে না। আমি কলম বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। যা হবার তা হবে।

বার্গেন শহরটা সমুদ্রের ধারে নয় কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। সেই জল বেয়ে জাহাজ পর্যন্ত আসে। সারাদিন একাই পায়ে ঘুরে শহরটাকে দেখলাম। খুব ঠাণ্ডা আর চুপচাপ থাকা শহর। কোথাও কোন অযথা হৈ চৈ নেই। ভিড় জনতার প্রশ্ন ওঠে না। রাত্রে আমাদের ডিনারে নিয়ে যাওয়া হল শুনলাম নরওয়ের রাজা কবিদের সম্মানে ডিনার দিচ্ছেন। সেখানে বেশ কিছু কবির সঙ্গে আলাপ। কবিরা যেমন হন এঁরাও তেমন। একজনের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল। থাকেন ফিনল্যাণ্ডে। বউকে খুব ভয় পান। কবিতা লিখেই সংসার চালাবার চেষ্টা করেছেন বলে বউ-এর লাথি ঝাঁটা খান। আকণ্ঠ পান করে তিনি বললেন, 'আমাদের বিয়েটা কেন ভাঙ্গেনি তাই তো? আমি বউকে প্রেম করার লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছি। গত পাঁচ বছরে বেচারা পাঁচটা প্রেম করেছে। কোনটাই টেকেনি। ব্যাড লাক। আচ্ছা, তুমি কি ধরণের কবিতা লেখ।

সত্যি কথা বললাম, 'আসলে আমি কবিতা লিখতেই পারি না।'

'খুব সত্যি কথা। আমরা কেউ কবিতা লিখতে পারি না। লিখতে চেষ্টা করি। আমার তো মাঝে ন্যুট হ্যামসনকেও বড় কবি বলে মনে হয়। নাম শুনেছ?'

'নিশ্চয়ই। আমার পূর্বসূরী গদ্য লেখকরা ওঁর কাছে বেশ ঋণী।'

কিন্তু এসব কোন প্রলেপ দিচ্ছে না। পরদিন সকালে হাজির হলাম কবি সম্মেলনে। শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী দারুণ সেজে পৌঁছেছেন সেখানে।

www.boiRboi.blogspot.com

বিরাট প্রেক্ষাগৃহে গিজ গিজ করছেন কবিরা। কবির তালিকায় আমার নামও আছে, এবং সেটা সন্ধ্যেবেলায়। সারাদিন আমাকে অবোধ্যভাষায় লেখা কবিতা শুনতে হবে তাই আমি চুপচাপ প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে এলাম।

ছিমছাম রাস্তাঘাট। গাড়ি এবং মানুষ কম। ঠাণ্ডা একটু হালকা ছায়া জড়িয়ে রেখেছে সর্বত্র। একটা বাস টার্মিনাসে পৌঁছে গেলাম হাঁটতে হাঁটতে। এখন সকাল এগারটা। এদের বাসে, যেমন হয়, কণ্ডাক্টর নেই। ড্রাইভারই সব। আর বাসের চেহারা খুব লোভনীয়। ড্রাইভার উঠতে যাচ্ছিলেন, জিজ্ঞাসা করলাম, ওই বাস কোথায় যাচ্ছে? বোকার মত প্রশ্ন তা উত্তরেই মালুম হল। আমার পক্ষে এখানকার জায়গা জানা কি করে সম্ভব? তবে জানলাম যেতে দুঘণ্টা লাগবে। সেখানে থাকবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ফিরতে আবার দুঘণ্টা। অর্থাৎ চারটের মধ্যে আমি এখানে পৌঁছে যাবই। আমার অনুষ্ঠান সাড়ে পাঁচটায়। উঠে বসলাম টিকিট করে।

বার্গেন শহর ছেড়ে বাস পাহাড়ি গ্রামাঞ্চলে ঢুকে পড়ল। ঝকঝকে বাসের আরামদায়ক আসনে জানালার পাশে বসে আমি নরওয়ের প্রকৃতি এবং আকাশ দেখছিলাম। আমাদের উত্তরবঙ্গের প্রকৃতির সঙ্গে কোন তফাৎ নেই শুধু এরা জানে কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। সামনের রাস্তা একটুও অসমান নয়, গর্তের কথা চিন্তাও করা যায় না। ফলে বাসে বসে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি লাগছে না। বাসে ভিড় দূরের কথা, আমাকে নিয়ে যাত্রীর সংখ্যা দশ বারো। আস্তে আস্তে তাও কমতে লাগল। মাঝে মাঝে গভীর অরণ্য পড়ছে, আবার আদিগন্ত সবুজ ভ্যালি। যখন দুঘণ্টা কাটলো তখন আমরা এক ছোট গ্রামে পৌঁছে গিয়েছি। শেষযাত্রী আমিই।

ড্রাইভার আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। একটা গ্যাসস্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। আমার হাতে এখন পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়। ঘড়ি মিলিয়ে নিলাম।

এদিকে বাড়িঘর বলতে গেলে নেই। জায়গাটা পাহাড়ি। একটা কালো রাস্তা আড় ভেঙ্গে চলে গেছে ওপাশে। রাস্তাটা ধরে হাঁটতে লাগলাম। ভারি ভাল লাগছিল। মাথার ওপর ফিনফিনে মশারির মত রোদ্দুর, অল্প অল্প ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। আমার সমস্ত শরীরে

www.boiRboi.blogspot.com

শীতবস্ত্র। হঠাৎ বাঁক ঘুরতেই একটা জনপদ চোখে পড়ল। রাস্তার দুধারে গোটা দশেক বাড়ি। একটা ছোট্ট মাঠ, বাচ্চারা খেলা করছে। তাদের চিৎকার আমার চেনা।

কাছে গেলাম ওরা খেলা থামিয়ে আমাকে দেখল। যেন বিস্ময়কর কিছু দেখছে। আমার চা অথবা কফির তেষ্টা পেয়েছিল। একটা বাচ্চাকে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে রেস্টুরেণ্ট কোথায় আছে বলতে পার ?'

ওরা এ ওর মুখের দিকে তাকাল। তারপর একসঙ্গে হেসে উঠল। বুঝতে পারলাম আমার কথা ওদের বোধগম্য হচ্ছে না। এইসব শিশুদের ইংরেজি শেখার কোন প্রয়োজন নেই। এই পর্যায়ে ওদের মাতৃভাষা যথেষ্ট সম্পদশালী। আমাদের সরকার ঠিক উপেক্ষা করছেন। মাতৃভাষা যখন জীবনের ভাষা হয়ে ওঠেনি তখন ইংরেজিকে সরিয়ে দিতে চাইছেন। আমি এগোলাম। সুন্দর বাড়িগুলো। বেশীর ভাগই একতলা, কটেজ ধরনের। সামনে বাগান আছে প্রত্যেকের। কোন চায়ের দোকান চোখে পড়ছে না। এক ভদ্রমহিলাকে আসতে দেখলাম। ভাল স্বাস্থ্য। তাকে অভিবাদন করে জিজ্ঞাসা করলাম কফির দোকানের কথা। তিনি কিছুক্ষণ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে যা বললেন তা বুঝতে পারলাম না আমি। বিষন্নমুখ নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

ইংরেজি বুঝুক বা না বুঝুক মানুষের বসবাসের জায়গায় কিছু দোকানপাট থাকবেই। তারই তল্লাশে পনেরটা মিনিট কাটানোর পর আমার চোখে পড়ল একটি বাড়ির বারান্দায় একজন বৃদ্ধ বসে আছেন। আমি হাসতেই তিনি হাসলেন, আমি বললাম, 'আমার ভাষা আপনি বুঝতে পারবেন না এই যা দুঃখ।'

তিনি ভাঙা ইংরেজিতে জবাব দিলেন, 'দয়া করে দুঃখিত হবেন না।'

আমি আনন্দিত, 'এখানে কফির দোকান নেই ?'

'আজ্ঞে না। আমরা যে যার বাড়িতেই ওটা খেয়ে থাকি।'

'ও, অন্য কোন দোকানও চোখে পড়ল না।'

'একটা কো-অপারেটিভ দোকান আছে। এখন সেটা বন্ধ। আপনি কি বার্গেন থেকে আসছেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। হঠাৎ বেড়াতে চলে এলাম। আমি ভারতীয়।'

'তাই বলুন। আমি কখনও কোন ভারতীয়কে চোখে দেখিনি।

www.boiRboi.blogspot.com

আপনার সমস্যা কি ?'

'তেমন কিছু নয়। কফির দোকান খুঁজছিলাম।'

'পাবেন না। তবে আপনাকে এক কাপ কফি আমি বোধহয় খাওয়াতে পারি।'

উনি আমাকে বারান্দায় বসালেন। ভেতরে গিয়ে সম্ভবত জল গরম করার ব্যবস্থা করে ফিরে এলেন, 'আপনি টুরিস্ট ?'

'না। এখানে কবি-সম্মেলনে এসেছি।'

'ও, আপনি কবি।'

'আজ্ঞে না। আমি গল্প লিখি। ওরা ভুল করে নিয়ে এসেছে।'

উনি হাসলেন, 'স্বাভাবিক ভুল। জীবনেও মানুষ যা নয় তাই হতে হয়।'

'আচ্ছা, এখানে তেমন লোকজন চোখে পড়ছে না কেন ?'

'এখন কাজের সময়। সবাই কাজে গিয়েছে। আমরা এখানেই থাকি শুধু বিশ্রামের জন্য। ছুটির দিন এলে দেখা পেতেন।'

'কোথায় কাজ করে সবাই ?'

'শহরে, বাগেনেও যায় কেউ কেউ।'

'আপনি একা থাকেন ?'

'হ্যাঁ। আমার পূর্ণ বিশ্রামের বয়স। তাছাড়া এই শান্তির জায়গা ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাই না। তবে সপ্তাহে একদিন শহরে যেতে হয় শাক্‌সবজি কিনতে। বাকিটা কো-অপারেটিভ থেকেই পেয়ে যাই।'

'আপনার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে ?'

'স্ত্রী গত হয়েছেন, তিন ছেলেই অসলোতে ভাল চাকরি করে, রবিবার সকালে তারা আমাকে ফোন করে।'

'তারা এখানেই আসেন না ?'

'কখনও সখনও, প্রত্যেকেই খুব ব্যস্ত। দাঁড়ান, কফিটা আনি।' ঘড়ি দেখলাম। মিনিট পনের আছে হাতে।

বৃদ্ধ কফি নিয়ে এলেন। এক কাপ। জিজ্ঞেস করতে জানালেন, 'এখন আমার কফি খাওয়ার সময় নয়।'

'আপনার ছেলেদের কাছে যান তো ?'

'বললাম তো, শহরে আমার ভাল লাগে না।'

www.boiRboi.blogspot.com

'এখানে বন্ধুবান্ধব নেই ?'

'কেউ কেউ রবিবারে কথা বলেন। আসলে এই বাগান নিয়ে আমার চমৎকার সময় কেটে যায়। নিজের জন্যেও প্রচুর কাজ করতে হয়। দেখুন, কুড়ি বছর বয়সে প্রেমে পড়েছিলাম। ষাট পর্যন্ত সেই মহিলার সঙ্গী ছিলাম। পুরুষের যা কিছু কামনা-বাসনা তা মেটাতে চল্লিশ বছর যথেষ্ট সময়, তাই না ? আমি এখন অন্যভাবে জীবন কাটাচ্ছি। ওই যে টিউলিপটা দেখছেন, সম্পূর্ণ ফুল হয়ে ফুটতে বেচারা তিনদিন সময় নিল। অথচ পাশেরটার লেগেছে আড়াইদিন। আমার বাগানে তিনটে ভ্রমর ঘুরে বেড়ায়। দুটো পুরুষ একটি নারী। ফলে ওদের ঝগড়া লেগেই থাকে। আমি লক্ষ্য করছি নারী, পুরুষ দুজনকেই পাত্তা দিচ্ছে। এটা অবশ্য অন্যায় নয় নইলে পুরুষদের একজনের কি অবস্থা হত ভাবুন। বরফ পড়তে শুরু করলে এরা কোথায় যাবে ? আমার গাছগুলো মরে যাবে, ভ্রমরদের কি দশা হবে ? আমি ওদের জন্যে একটা শেল্টারের ব্যবস্থা করেছি। আপনি ঘড়ি দেখছেন ?'

'আজ্ঞে আমার বাস ছাড়তে সাত মিনিট সময় আছে।'

'ঈশ্বর ওই একটি শয়তানি করেছেন।'

'মানে ?'

'মানুষকে জন্মাবার সময় যদি বলে দিতেন তুমি এতটা কাল বাঁচবে তাহলে সে সময়ের ঠিক ব্যবহার করতে পারত।'

'আপনার কোন দুঃখ নেই ?'

'আছে, বলব ? হাসবেন না তো ?'

'না।' বেশ অবাক হলাম।

'আমি গান গাইতে পারি না। কিছুতেই সুর আসে না গলায়। এই বিরাশি বছর বয়সে এটাই আমার একমাত্র দুঃখ। এবার আপনি উঠুন। কফি কেমন লাগল ?'

উঠে দাঁড়ালাম, 'চমৎকার।'

উনি আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আমরা করমর্দন করলাম। উনি বললেন, আমরা এজীবনে আর পরস্পরকে দেখব না। কিন্তু মনে রাখব। তুমি একটু বেশী মনে রাখবে কারণ তোমার বয়স কম। কিন্তু এখন তোমাকে দৌড়াতে হবে। এখানে বাস বড্ড সময়ে চলে।'

আমি দৌড়ালাম। দৌড়াতে দৌড়াতে খেয়াল হলো বুদ্ধের নাম

www.boiRboi.com

জিজ্ঞাসা করা হল না। আমার নামও তাঁকে বলিনি এমনকি কফির জন্য একটা ধন্যবাদও দিয়ে আসিনি তাঁকে।

সেই সন্ধ্যায় এক প্রেক্ষাগৃহে কবির সামনে এসে এই ঘটনাটা বললাম। তারা চুপচাপ শুনলেন। শুধু সেই ফিনল্যাণ্ডের মাতাল কবি চোখ বন্ধ করে বললেন, 'নামে কি এসে যায়। মানুষ যা উচ্চারণ করে তাই তো কবিতা। অবশ্য যারা কবিতা লেখে তারাই কবি নয়।'

www.boiRboi.blogspot.com

বেশ কিছুদিন ধরে বিপন্নপালকের মনে হচ্ছিল এভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।

মধ্যবিত্ত বাঙালি যা যা পেলে খুশি হয় বিপন্নপালকের তা আছে। সল্টলেকের খোদ বিডি মার্কেটের পেছনে একটা দোতলা বাড়ি, সাত হাজার টাকা মাইনের একটা চাকরি, ব্যাঙ্ক, ইউনিট ট্রাস্ট, এন এস সি এবং জীবনবীমায় ভাল টাকা। চাকরি ছাড়া তার একটা বিরাট রোজগার, লেখার টাকা। সেটা বছরে ছ' লাখের কম হয় না কুড়িয়ে-বাড়িয়ে। বিপন্ন বিবাহিত। স্ত্রী তপতীর বয়স গত শ্রাবণে চুয়াল্লিশ, ছেলে দিব্য জয়েন্ট দিয়ে শিবপুরে পড়ছে। একজন বাঙালির এসব থাকলে তাকে নিশ্চয়ই সুখী বলতে অসুবিধে নেই। বিপন্ন একটি মারুতি গাড়ির মালিকও। গাড়িটা এখন চমৎকার চলছে।

তপতী সম্পর্কে বিপন্নর কিছু অভিযোগ ছিল। কোন বাঙালি স্বামীর তা না থাকে! বাইশ বছরের বিবাহিত জীবনে যদি অভিযোগগুলো থেকেই যায় তাহলে তার ধার ভোঁতা হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। তপতী একটু অলস প্রকৃতির। হুটহাট বাইরে বেরুতে চায় না। শরীরের দিকেও নজর নেই। তার মধ্যাঙ্গ যে স্ফীত হচ্ছে তাতে কিছুই এসে যায় না। পেটের গোলমালে কানের দু'পাশের চুল রঙ বদলেছে কিন্তু তা লুকোবার চেষ্টা নেই। বিউটি পার্লারে তাকে পাঠানো যায় না। নিজেকে বয়স্কা দেখানোর ব্যাপারে ওর কোনও আপত্তি নেই। তবে সংসারের যাবতীয় কাজ সে-ই করে। দুবেলা স্বামীকে ভাল রান্না খাওয়াতেই স্ত্রীর দায়িত্ব শেষ—এরকম একটা ধারণা থাকলেও থাকতে পারে।

শরীর ভারি হয়ে যাওয়ায় তপতীর শরীরের চাহিদাও কমে গেছে। বিপন্ন আজকাল আর বেশি অনুরোধ করতে চায় না। রাত্রের কাজ চুকিয়ে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুম ছাড়া অন্যকিছুর ভাবনা তপতী ভাবতে চায় না। সামান্য জেগে থাকলেই নাকি তার রাত্রের ঘুম ঘণ্টা তিনেকের জন্যে চলে যায়! বিপন্ন এখন চমৎকার নিরাসক্ত হয়ে থাকে।

www.boiRboi.com

তবে তপতীর সুনাম আছে। আত্মীয়স্বজন ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপারে ওর জুড়ি নেই। কার কবে জন্মদিন তা ও ঠিক মনে রাখে। বয়স্করা বলেন, এরকম বউ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। বিপন্ন এ-ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চায় না।

বিপন্নর বয়স এই আশ্বিনে আটচল্লিশ। রোজ ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে তিন কিলোমিটার হাঁটে সে। সেই সঙ্গে একটু ফ্রিহ্যান্ড করে নেয়। পেটে যে মেদ জমছিল সেটা নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছে। হাঁটা-চলায় চনমনে ভাব। রঙিন শার্ট প্যান্টের নিচে গুঁজে পরে। জুলপি সাদা হয়ে গেলেও পাঁচজনে সেটা বুঝতে পারে না দামী কলপ ব্যবহার করায়। বিদেশি পারফিউম একবার গায়ে ছড়াবেই সে। আটচল্লিশের বিপন্নকে চল্লিশ বলে ভুল করতে অসুবিধে নেই।

প্রাতঃভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরে চাকরের দেওয়া খবরের কাগজ দেখে, চা খেয়ে বাথরুমে ঢোকে বিপন্ন। একটু পরিষ্কার হয়ে লিখতে বসা। বেলা নটা পর্যন্ত সেটা চলে। এই সময়টায় তাকে বিরক্ত করার নিয়ম নেই এই বাড়িতে। টেলিফোনও ধরে না। ন'টায় উঠে তৈরি হয়ে অফিসের জন্যে বেরুনোর সময়টা ঝড়ের মত কাটে। খেতে বসলে তপতী দিনের প্রথম কথা বলে। টাকা-পয়সা চাওয়া বা কোনও জরুরি খবরের সঙ্গে আর-একটু ভাত দেবে কিনা জানতে চায়। ঠিক সওয়া দশটায় অফিসে ঢুকে পড়ে বিপন্ন। বিদেশি ফার্ম। তাদের কাজের চাপও বেশি। লাঞ্চের আগে মাথা তোলার সময় পাওয়া যায় না। এমন কি ওর পাশের চেম্বারে সুন্দরী গুজরাতি মহিলার দিকে তাকানোও সম্ভব হয় না। সাড়ে পাঁচটায় অফিস থেকে বেরিয়ে কলেজ স্ট্রিটে প্রকাশকদের আস্তানায় চলে আসতে হয় কাজ থাকলে। নইলে মাঝে-মধ্যে ক্লাবে। রাত্রে লেখে না বিপন্ন। নিত্য নিয়ম করে ওষুধ খাওয়ার মত দু পেগ হুইস্কি গলায় ঢালে বই পড়তে পড়তে। রাতের খাওয়ার শেষে তপতীর ঘুমন্ত শরীরের দিকে একবার তাকায় কি তাকায় না সে। বিছানায় পড়লে এখনও রাতভর ঘুম।

এটা একটা জীবন হল? একে কি বেঁচে থাকা বলে? প্রশ্নগুলো ইদানীং বিপন্নকে কেবলই ঠোকরাচ্ছে। সে অনেক ভেবে দেখেছে, তপতীর তাকে বিশেষ প্রয়োজন নেই। মাসের প্রথমে থোক টাকা পেয়ে গেলেই তার সমস্যা শেষ। গত কয়েক মাসে তপতী তাকে কোনও

www.boiRboi.blogspot.com

ব্যক্তিগত কথা বলেনি। বাড়িতে মেয়ে ঝি চাকর যেমন আছে তেমনি স্বামীও রয়েছে, এমনই যেন ভাবখানা। ছেলে শিবপুর থেকে প্রথম প্রথম শনিবারে বাড়ি আসত। এখন বন্ধুবান্ধব বেড়ে যাওয়ায় আসার সময় পায় না। মাসিক টাকার বাইরে প্রয়োজন হলেই সেটা মায়ের কাছে নিবেদন করে। মাঝে মাঝে লেখার টেবিলে বসে বিপন্ন সেই বাড়তি টাকার চিরকুট পায়। অর্থাৎ বাপ যদি বেঁচে থাকে এবং টাকার নিয়মিত যোগানের ব্যবস্থা হয় তাহলে ছেলে দিব্যি থাকবে।

এসব কথা ভাবলেই বুকে অস্বস্তি জমে। বিয়ের পর তপতীর ব্যবহার, ছেলের শৈশব ঝাঁপিয়ে চলে আসে সামনে। কী সুন্দর, নরম ছিল সেইসব ছবি। সময় কেমন করে সবকিছু উদাস করে দিল। এই নিয়ে লেখার চেষ্টা করেছে বিপন্ন কিন্তু কিছুতেই জমেনি। সময় কখন কেমন করে দাঁত বের করে এই কায়দাটা লেখায় ধরতে পারেনি সে।

এভাবে চলতে পারে না। এই একভাবে অর্থহীন বেঁচে থাকা। অবশ্য কোনটা অর্থপূর্ণ তাও তো জানা নেই। জানবার সুযোগ পেলে অবশ্য জানা সেই সুযোগটার জন্যে মনে মনে আজকাল ছটফট করে সে। মানুষের একটাই জীবন, একবার শুরু হয়ে শেষ হয়ে যায়। ভারতীয় নারী-পুরুষ যে-বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাই বহন করে যায় শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এক শরীরে দুইরকম জীবনযাপন করা যাবে না? আমি বিপন্নপালক, ছাত্রাবস্থা পর্যন্ত একরকম ছিলাম, বিবাহিত জীবনে তপতীর স্বামী, দিব্যর বাবা, আটচল্লিশ পর্যন্ত একভাবে কাটানোর পর আমার বাকী জীবন অন্যভাবে শুরু করে শেষ করতে পারব না কেন? সন্ন্যাসীরা যেমন বলেন পূর্বাশ্রমের কথা। অন্তত হালদার তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত সংসার করে স্ত্রী-পুত্রকে ভাসিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে যদি পরমানন্দ মহারাজ হয়ে দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে মাথা কামিয়ে তবে বিপন্ন পারবে না কেন। অনন্তর যুক্তি ছিল তাকে ঈশ্বর ডেকেছে। বিপন্নর যুক্তি যদি হয় তাকে হৃদয় মুক্ত হতে বলেছে তাহলে সেটা কি অন্যায় হবে? না, সন্ন্যাস-টন্যাস তার দ্বারা হবে না। ওসব তাকে কখনই টানেনি। সে একজন সুস্থ মানুষের মত অন্যরকম জীবনযাপন করতে চায়।

শনিবার ছুটির দিন। লেখা ছেড়ে হিসেব নিয়ে বসল বিপন্ন। ব্যাঙ্ক, ইউনিট ট্রাস্ট, এন. এস. সি, এন. এস. এস, ইনসুরেন্স মিলিয়ে সাত লক্ষ টাকা এতদিন ধরে লগ্নী করেছে সে। সেগুলো নির্দিষ্ট সময় পার হলে

www.boiRboi.blogspot.com

চোদ্দ লক্ষ টাকায় পৌঁছবে। এছাড়া আছে প্রকাশকদের পাঠানো নিয়মিত টাকা। অফিস ছেড়ে দিলে লাখ দুয়েক হাতে আসবে। প্রতি মাসে তপতী যদি দশ হাজার হাতে পায় তাহলে তার রানীর হালে চলে যাবে। সুদ এবং আয়ের টাকার ওপর আয়কর ধরে তপতী ওই টাকা পেতে পারে। এর ফলে কেউ অভিযোগ করতে পারবে না, সে ওদের জলে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে। মাস তিনেক আগে বিপন্নর এক সহকর্মী হঠাৎই মারা গেলেন। তাঁর অভাব তো পরিবারের সবাই এখন স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছে। আর সেই ভদ্রলোক তো বেশি কিছু রেখে যেতে পারেননি।

একটি ব্যাপারে দোটানায় পড়ল বিপন্ন। এক জীবনে দুই জীবন-যাপন করতে গেলে প্রথম জীবনের কোনও স্মৃতি বহন করা উচিত নয়। এতদিনের অভ্যাস, ধ্যানধারণা সব পাল্টাতে হবে। খুব কঠিন কাজ কিন্তু চেষ্টা করলে হয়ত সম্ভব হবে। কিন্তু দ্বিতীয় জীবন-যাপনের জন্য টাকার দরকার। সেই টাকা সে প্রথম জীবনের অর্জিত টাকা থেকে কী করে নেবে। আটচল্লিশ বছর বয়সে বিপন্নপালক নতুন জায়গায় গিয়ে করুণাসুন্দর নাম নিয়ে চাকরি পেতে পারে না। চাকরির জন্যে তাকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। এতদিন কী করছিল তার কৈফিয়ত চাইবে নিয়োগকর্তা। তার মানেই প্রথম জীবনের কাছে হাত পাতা। অবশ্য নতুন লেখা লিখে কাগজ এবং প্রকাশকদের কাছ থেকে টাকা পেতে পারে। কিন্তু সম্পাদক প্রকাশকরা বিপন্নপালকের লেখা ছাপতে যেভাবে উৎসাহিত হবে করুণাসুন্দরের লেখায় নিশ্চয়ই হবে না। করুণাসুন্দর তাঁদের কাছে একজন নতুন লেখক। টাকা আসবে বিপন্নপালকের নামে। সেক্ষেত্রে লেখালেখি থেকে কোনও রোজগার হবে না দ্বিতীয় জীবনে যদি সে বিপন্নপালককে মেরে ফেলে। এই সমস্যায় বিব্রত হয়ে সে শেষ পর্যন্ত স্থির করল একটু সমঝোতা করা যাক। বিপন্নপালক যদি করুণাসুন্দরকে কিছু দান করে তাতে অন্যায় কী! এই শরীরটাই তো বিপন্নপালকের যা সে করুণা-সুন্দরকে দিয়ে দিচ্ছে। মাসে চার হাজার টাকার ব্যবস্থা থাকলে দ্বিতীয় জীবনটা চমৎকার কাটানো যাবে একা একা। চার হাজার মানে ব্যাঙ্কে জমা থাকতে হবে চার লক্ষ টাকা। এই টাকাটার ব্যবস্থা করতে হবেই।

অনেকদিন থেকেই মাথায় একটা ইচ্ছে ঠোকর মারছিল। বেশ ছিমছাম

নির্জন পাহাড়ি জায়গায় থাকলে কেমন হয়! ঠাণ্ডা তার খুব পছন্দের। কুয়াশা দল বেঁধে উঠে আসবে, ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা থেকে জলের ফোঁটা ঝরবে। বেশ স্বপ্ন-স্বপ্ন ব্যাপার। ভারতবর্ষের পাহাড়ি শহরগুলো তার দেখা হয়ে আছে। বড় শহর দার্জিলিং, সিমলা, মুসৌরিতে নয়। সেখানে বহু মানুষের ভিড়, নিত্য ট্যুরিস্টদের আনাগোনা। একটু অখ্যাত অথবা নির্জন জায়গা প্রয়োজন। দুটো নাম মনে এসেছে। একটি ডালহৌসি অন্যটি ঘুম। বাঙালি টুরিস্ট চট করে ডালহৌসিতে বেড়াতে যায় না। ঘুমের ওপর দিয়ে দার্জিলিং-এ যেতে হয় বলে, যায় বেড়াতে সেখানে থাকতে নামে না। ডালহৌসি অনেকদূর। কিন্তু ঘুম চেনা-জানার মধ্যে। বিপন্নকে ঘুমই টানতে লাগল। কিছুদিন আগে সে শিলিগুড়িতে সাহিত্যসভা করতে গিয়ে ফাঁক পেয়ে ঘুমে বেড়াতে গিয়েছিল। ছবির মত জায়গা। তার কল্পনার সঙ্গে চমৎকার মিল। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস। কিছু সরকারি অফিস। পাহাড়ের অন্যধারে কিছু সুন্দর বাংলোবাড়ি। দুটো বাড়ির গেটে টু-লেট সাইনবোর্ড দেখেছে বিপন্ন।

অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে তপতীর ভবিষ্যতের দিকে হাত না বাড়িয়ে বিপন্ন চারলক্ষ টাকার ব্যবস্থা করে ফেলল। এইসময় তার মনে হল, শরীরটাকে যখন বদলাতে পারছে না তখন নাম পরিবর্তনের চেষ্টা কেন। কেউ চিনতে পারলে তাকে জালিয়াত বলে ভাবতে পারে। নামে কী এসে যায়! সে শুধু দ্বিতীয় জীবনের স্বাদ একজীবনে নিতে চাইছে। তার জীবন-যাপন হবে একেবারে অন্যরকম। নামের সঙ্গে তো কোন সংঘাত নেই। ঘুমে যে ব্যাঙ্ক দেখে এসেছিল তার কলকাতার শাখায় সে বিপন্ন-পালক নামেই চারলক্ষ টাকা রেখে অ্যাকাউণ্ট খুলল। ঘুমে পৌঁছে টাকাটা ওই ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করিয়ে নেবে।

এ যেন একটা যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি। প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে অত্যন্ত সতর্কভাবে যাতে কেউ বুঝতে না পারে। কিছু ব্যাপারে অবশ্য অসুবিধে হচ্ছে। যেসব প্রকাশক সম্পাদক আগামী বছরের পরিকল্পনা তাকে নিয়ে করেছেন তাঁদের সরাসরি না বলে দিতে হচ্ছে। তাঁরা অবাক হয়ে কারণ জানতে চাইলে বিপন্ন বলছে সে এখন কিছুকাল বিশ্রাম নেবে, কোনো নতুন লেখা নয়। এ ব্যাপারে প্রচুর উপদেশ শুনতে হচ্ছে কিন্তু

www.boiRboi.com

সে তার সিদ্ধান্তে অটল। প্রকাশক সম্পাদকরা ভাবছেন সে চাপ দিয়ে নিজের দাম বাড়াতে চাইছে।

প্রথমজীবনের কোন আকর্ষণ তাকে টেনে রাখতে পারছে না, শুধু—। হ্যাঁ, লেখালেখির ব্যাপারটা তাকে কিছুটা ভাবিয়েছে। প্রথম জীবন বাতিল করতে হলে লেখালেখিও ছাড়তে হয়। সেই কবে কলেজে পড়ার সময় লেখার নেশায় পড়েছিল বিপন্ন। একদিন না লিখতে পারলে পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে যেত। লিখতে লিখতে সে একসময় লেখক হয়ে গেল। প্রথম প্রথম লেখার প্রশংসা শুনলে কী ভালই না লাগত। নিন্দে শুনলে বিশ্রি হয়ে যেত দিনটা। অন্যের লেখা পড়ার জন্যে তখনই সময় পেত এবং ইচ্ছেও থাকত। তারপর যখন ধাপে ধাপে জনপ্রিয়তা এল তখন ওইসব বোধগুলো ভোঁতা হয়ে গেল কখন কোন ফাঁকে। এখন একটা উপন্যাস মানে অগণিত পাঠকদের মন জয় করা, একটা উপন্যাস মানে বছরে অন্তত তিনটে সংস্করণ। একটা উপন্যাস মানে বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা। হিসেবটা অজান্তেই স্থায়ী হয়ে গেছে। লিখতে লিখতে বিপন্ন বড্ড বুঝে গেছে পাঠকদের প্রিয় হবার জন্যে যেসব লেখক ফর্মুলার ওপর নির্ভর করেন তাঁদের আয়ু বোঝার আগেই শেষ হয়ে যায়। এখনও বাঙালি পাঠক আদর্শবান চরিত্র পছন্দ করে, সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই-করা নারী চরিত্র এখনও পাঠকের প্রিয়তমা হয়ে ওঠে। পাঠক নিজের জীবনে যা পারেন না তাই সাহিত্যের কোনো চরিত্র করতে দেখলে উৎসাহিত হন। আর এই সঙ্গে গল্প বলার সাবলীল ভঙ্গি যদি মিশে থাকে তাহলে কথাই নেই। হয়ত এটাও একধরনের ফর্মুলা কিন্তু সেটা সাইনবোর্ডের মত সামনে ঝুলে থাকে না বলেই বিপন্ন আজ সফল। শুরু করলে শেষ না করে উপায় নেই, ওর লেখা সম্পর্কে নিন্দুকদেরও এই অভিমত।

আর এই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে লেখা এখন প্রয়োজনীয় কর্ম ছাড়া অন্য কোন ভূমিকায় নেই বিপন্নর কাছে। লেখার টেবিলে না বসলে দিনটা নষ্ট হয়ে গেল এই অনুভূতিও অনেককাল আগেই মরে গেছে। অন্যের লেখা সে পড়ে না, ধারাবাহিক না হলে নিজের লেখাও পড়তে ইচ্ছে করে না। ধারাবাহিকের ক্ষেত্রে যোগসূত্র বজায় রাখতেই পুরোনো কিস্তি পড়তে হয়। তাই দ্বিতীয় জীবনে লেখা ছেড়ে দিলে খুব একটা কষ্ট হবে বলে তার বিশ্বাস হয় না। গত পুজোর পর দেড়মাস সে

www.boiRboi.blogspot.com

একটা শব্দও শেখেনি, কই, তাতে তো কোনো কষ্ট হয়নি। বরং লিখতে হবে না বলে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। হয়ত একটু বাড়াবাড়ি, তবু আজ বিপন্নর মনে হল, সে বেশ সহজভাবেই লেখা ছেড়ে দিতে পারবে।

মানসিকভাবে তৈরি হবার পর আজ রাত্রে সে তপতীর সঙ্গে কথা বলল। রাত্রে তপতী যেমন ব্যস্ত থাকে এবং ব্যস্ততার পরে বিছানার দিকে শরীর এলিয়ে দিতে এগোয় তেমনি আজও তার ব্যতিক্রম ছিল না। বিপন্ন গম্ভীর গলায় বলল, 'শুয়ো না, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

তপতী হাই তুলল, 'এতরাত্রে আবার কী কথা ?'

'তুমি আগে বসো।'

'না বাবা। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। সারাদিন ধরে এত খাটুনির পর এখন আর বসতে পারব না। এমন নাটক করার কী আছে !' তপতী শুয়ে পড়ল।

'তোমার কি আমার সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করে না ?'

'মানে, সারাদিন ধরেই তো বলছি !'

'সারাদিন ? আজ তুমি আমার সঙ্গে কটা কথা বলেছ ?'

শুয়ে শুয়েই তপতী মনে করার চেষ্টা করল, 'দূর ! আমার অত মনে থাকে না।'

'তপতী, আমার এইরকম জীবন ভাল লাগছে না !'

'আমার জন্যে ?' তপতী বেশ অবাক।

'না। তুমি নও। সব মিলিয়েই। এ জীবন আমার খুব একঘেয়ে লাগছে।'

'একঘেয়ে তো সবার লাগে। আমার লাগে না ? শনি রবি খোকা এলে অন্যরকম মনে হয়। বাকি কদিন কাটতেই চায় না। এ আর নতুন কী !'

'তোমার কি মনে হয় না এই একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দরকার ?'

'দূর। ঘুমোতে দাও তো। তিনকাল চলে গেল এখন উল্টো-পাল্টা ভাবনা।

'আমার তা মনে হয় না।'

'বেশ তো, কোথাও বেড়িয়ে এসো, একঘেয়েমি কেটে যাবে। যতদিন ইচ্ছে ততদিন থাকো বাইরে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'তোমার কোনো অসুবিধে হবে না ?'

'আমার কিসের অসুবিধে ? সংসারের কোন কাজে লাগ তুমি ? মাসকাবারি টাকাটা পেলেই হল। তবে বাইরে গেলে লিখতে পারবে ?'

'আমার আর লিখতেও ইচ্ছে করে না।'

'না লিখলে চলবে কী করে ?'

'যা জমেছে, যা পাবে তাতে দিব্যি চলে যাবে।'

তপতী পাশ ফিরে শুলো, যা ভাল বোঝ তাই কর।

বিপন্ন স্ত্রীর দিকে তাকায়। একটু বাদেই নাকের পাটা ফুলবে। সে বিছানার পাশে চলে এল, 'তপতী, বেড়াতে গিয়ে আমি যদি আর কখনও ফিরে না আসি— !'

তপতী তাকাল, 'মতলবটা কী ?'

'আমার এই সংসারে থাকতে ভাল লাগছে না।'

'সন্যেসী হবে ?'

'না ! কোথাও চলে যাব।'

'আমাকে ঘুমোতে দাও।' আবার চোখ বন্ধ করল তপতী।

বিপন্ন সরে এল জানলায়। অন্ধকারে কলকাতা বড্ড চুপচাপ। এই বয়সে এসে তপতী আর নতুন কিছু ভাবতে চায় না অথবা ভাবার ক্ষমতাটাই চলে গেছে। বিয়ের বছরখানেক পরে এইসব কথা শুনলে কেঁদেকেটে একসা করত। এরই নাম জীবন। থাকগে, কথা তো বলাই হল। অন্তত কেউ বলতে পারবে না—সে না বলে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

পরের দিন অফিসে গিয়ে পদত্যাগপত্র দাখিল করল বিপন্ন। ভেবেছিল এই নিয়ে খুব হই-চই হবে। কিন্তু দেখা গেল সবাই ব্যাপারটাকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেখছে। এত নামী লেখক, যার লেখার টাকায় ছাতা পড়ছে সে এতদিন অফিসের আইনে নিজেকে আটকে রেখেছিল সেটাই যেন আশ্চর্যের। পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়ে গেল। অফিস থেকে মোটা টাকার চেকও পেয়ে গেল সে। তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তপতীর নাম জড়িয়ে আছে। অবর্তমানে টাকা তুলতে কোন অসুবিধে হবে না তপতীর। শুধু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নয় যাবতীয় সঞ্চয়ে দুজনের নাম আছে। এ ব্যাপারে তাকে কোনো প্রয়োজন হবে না। কলেজ স্ট্রিটে ঘুরে প্রকাশকদের নির্দেশ দিয়ে দিল লিখিত ভাবে,

www.boiRboi.com

তার প্রাপ্য টাকা যেন নিয়মিত তপতীর কাছে পৌঁছায়। কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছে সে। না ফেরা পর্যন্ত এই অবস্থা, প্রকাশকদের বোঝাল বিপন্ন। একটা ফাইল তৈরি করে তার কোথায় কী আছে প্রকাশকদের কাছে ওইদিন পর্যন্ত কত টাকা পাওনা আছে তার বিশদ বিবরণ লিখে রাখল তপতীর সুবিধের জন্যে।

এক বিকেলে বাড়ি ফিরে বিপন্ন ঘোষণা করল, 'আজ সন্ধ্যের ট্রেনে বেড়াতে যাচ্ছি।'

তপতী ভি-সি-আরে ছবি দেখছিল কাজের লোকদের নিয়ে, জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায়?'

'দ্বিতীয় জীবনে।'

ঠোঁট ওল্টালো তপতী। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কখন ট্রেন?'

'সাতটায়।'

'সুটকেশ গুছিয়ে দেব?'

'না। তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। আমিই নিচ্ছি।'

ঘরে ঢুকে সুটকেশ নামিয়ে ফাঁপরে পড়ল বিপন্ন। যা নিয়ে যাবে তাই তো প্রথম জীবনের স্মৃতি। স্মৃতি বহন করা কি উচিত হবে? শরীর বাতিল করা যায় না বলেই পরিবর্তনের কথা ওঠে না।

বেরুবার সময় সে আবার তপতীর সামনে এসে দাঁড়াল, 'চললাম!'

'কবে ফিরছ?'

'জানি না।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'পাহাড়ে।'

'গরম জামা কাপড় নিয়েছ?'

'নিয়ে নেব।'

'সুটকেশ কোথায়?'

'সবই তো ওখানে পাওয়া যায়। সঙ্গে বয়ে নিয়ে গিয়ে কি হবে?'

'কী ব্যাপার বল তো?' টিভির সামনে থেকে উঠে এল তপতী।

'কিসের কী!' হাসল বিপন্ন।

'তোমার কথাবার্তা অন্যরকম লাগছে?'

'কী রকম?'

'বেঁকা বেঁকা। তুমি তো এমন ভাবে কথা বল না।'

www.boiRboi.blogspot.com

'তোমার কানের দোষ!'

'তা তো বলবেই। যা কিছু ত্রুটি আমারই। এতই যদি দোষ তাহলে বিয়ে করলে কেন?'

তপতীর গলা আচমকা টিভির আওয়াজ ছাপিয়ে গেল। কাজের লোকগুলো মুখ ঘুরিয়ে দেখল। অনেকদিন কাজ করেও তারা তপতীকে এমন গলায় বিপন্নর সঙ্গে কথা বলতে শোনেনি।

প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল বিপন্নর।' তুমি এদের সামনে এভাবে চেঁচাচ্ছ?'

'ঠিক করেছি! ক'দিন থেকে শুধু ঠারেঠুরে আমাকে ঠোকা হচ্ছে। আমি মোটা হয়ে গেছি, শরীরের যত্ন নিই না, একঘেয়ে হয়ে গেছি। নিজে কার্তিক সেজে থাক বলে আমাকেও সেই সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে? ছেলের মুখ চেয়ে আমি বেঁচে আছি।' হঠাৎ গলায় যেন কিছু আটকাল, তপতী দৌড়ে শোওয়ার ঘরে চলে গেল।

বিপন্ন তাকে অনুসরণ করল, 'ন্যাকামি করো না। আমি যা বলেছি তার কোনটে মিথ্যে? বলো? তোমাকে বলতেই হবে। জীবনে বৈচিত্র্য আনার জন্যে তুমি কিছু করেছ?'

বিছানায় বসে কান্না থামিয়ে তপতী ফুঁসে উঠল, 'তুমি কী করেছ?'

বিপন্ন চিৎকার করল, 'যথেষ্ট করেছি। যখন আমাকে বিয়ে করেছিলে তখন মাইনে পেতাম পনের শ' টাকা। আজ তোমার ঝি চাকর ড্রাইভারের মাইনে তার বেশি।

'ও!' অদ্ভুত সুরে টানল শব্দটি তপতী, 'তুমি আমায় টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছ না?'

'বাজে বকো না। টাকা না রোজগার করলে এই বাড়িতে থাকতে পারতে না ছেলেকে শিবপুরে পড়তে পাঠানোও যেত না। আমার কথা কিছু ভেবেছ তুমি? আমি যাতে খুশি হই এমন কাজ কখনও করেছ? তুমি—তুমি সংসারসর্বস্ব স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছুই নও।'

'তুমি এই ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলছ?'

'বেশ করেছি। অনেক আগেই বলা উচিত ছিল।'

'এতদিনে তোমার মুখোশটা তবে খুলল!'

'তোমারও। আজ ঝি চাকরের সামনে আমাকে অপমান করেছ তুমি!'

'তুমি করোনি? সভা সমিতির নাম করে সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে এত ঢলাঢলি, এতে আমার অপমান হয়নি? আজ বর্ধমান, কাল দুর্গাপুর,

www.boiRboi.blogspot.com

সভা লেগেই আছে। সেখানে সভা হচ্ছে না ফুর্তি হচ্ছে তা কে জানতে পারছে ?'

'তপতী ?' চেঁচিয়ে উঠল বিপন্ন। তার শরীর কাঁপছিল।

'চিৎকার করো না। সেদিন, একটা কুড়ি বছরের মেয়ের সঙ্গে কী মিষ্টি গলায় কথা। মেয়েটা এসে যেই বলল—আমি আপনার অন্ধ ভক্ত, কী সুন্দর লেখেন আপনি, আপনাকে একবার দেখতে পাব বলে অনেক দূর থেকে ছুটে এসেছি—অমনি কোয়ালিটির আইসক্রিম হয়ে গেলে। ছি ছি ছি। একবারও মনে হল না মেয়েটা তোমার ছেলের বয়সী।'

'তুমি এত নীচ, তোমার মন এত নোংরা ?'

হ্যাঁ আমি নীচ হব, নোংরা হব! আর উনি চুলে কলপ মেখে হাঁটুর বয়সী মেয়েদের সঙ্গে কেষ্টলীলা করবেন সেটা মহৎ ব্যাপার।'

'মুখ সামলে কথা বল তপতী ?'

'কেন ? মারবে নাকি ? মারো। এসো। তাতেও বুঝব পৌরুষ আছে।'

'ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না করছে আমার। এতদিন মনে এই প্যাঁচ পুষে রেখেছিলে! আমি যাচ্ছি, এজীবনে তোমার কাছে ফিরে আসব না।'

ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল তপতী, 'তা তো যাবেই, নিশ্চয়ই কোন শাকচুন্নিকে মনে ধরেছে। আমি তখনই বুঝেছি, অত সাজের বাহার যখন তখন নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে। মর্নিং ওয়াক! হুঁ। রোগা হয়ে যুবক সাজা। এসব আমার জানা ছিল।'

'তোমার মন কী নোংরা হয়ে গেছে তপতী! স্টেশনে চল, গিয়ে দেখবে কেউ সঙ্গে যাচ্ছে কিনা।' ফোঁস করে উঠল বিপন্ন।

'আমার বয়ে গেছে স্টেশনে যেতে।'

'না। তোমাকে যেতেই হবে। নইলে দুনিয়ার লোককে এই মিথ্যেটা বলে বেড়াবে। তৈরি হও।' বিপন্ন নিচে নেমে এল। চাকরকে বলল, ট্যাক্সি ডাকতে। ওপর থেকে তপতী চেঁচাল। চাকরকে ডেকে বলল, 'ট্যাক্সি ডাকবি না। স্টেশনে যখন নিয়ে যেতে চাইছে তখন সেখানে শাকচুন্নি নিশ্চয়ই নেই। যেখানে যাচ্ছে সেখানেই তিনি রয়েছেন। দেখতে হয় সেখানেই যাব আমি।'

বিপন্ন দৌড়ে ওপরে উঠে এল, 'তুমি আবার চাকরের সামনে আমাকে

অপমান করছ ?'

'বেশ করেছি। তুমি ফুর্তি করতে যাবে আর আমি তোমাকে পুজো করব ?

'ঠিক আছে। ভালই হল। যেটুকু বন্ধন ছিল আজ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আমার নামে তুমি বদনাম দেবে তা আমি সহ্য করব না। তোমাকে ঘুমে যেতে হবে।'

'ঘুম ? তুমি আমাকে ঘুম পাড়াতে চাও ? ঘুমের ওষুধ খাওয়াবে নাকি ? আমাকে মেরে ফেলার মতলব ?' তীব্র চিৎকার ছিটকে বেরিয়ে এল তপতীর গলা থেকে।

'দূর অশিক্ষিতা ! ঘুম হল একটা জায়গার নাম। সেখানে আমি বাকি জীবন থাকব।'

'কার সঙ্গে ?'

'একা। স্রেফ একা।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'ঠিক আছে, চল, দেখে এসো। কিন্তু একটা শর্ত, কাউকে ঠিকানা দেবে না।'

'কেন ?'

'আমি এই জীবনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমার কাউকে ভাল লাগছে না। তোমাকে না, এ বাড়িকে না, কাউকে না।'

'আমাদের চলবে কি করে ?'

'সব ব্যবস্থা রেখেছি। ওই ফাইলে সব হিসেব পাবে। শোনো, আমি ভদ্রলোক বলে তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি, নইলে না বলে কেটে পড়লে তুমি টেরও পেতে না।' বিপন্ন ঘড়ি দেখল। ট্রেন ছাড়তে আর আধঘণ্টা বাকি। সে ছটফটিয়ে উঠল।

তপতী মুখ ঘোরাল, 'হুট বললেই যাওয়া যায় না। সংসার গুছিয়ে যেতে হবে। কালকের আগে পারব না। তোমার আর কি ! এই সংসারটাকে নিজের বলে তো কোনোদিন মনে করোনি।'

ট্রেনে নয়, বাড়তি পয়সা খরচ করে বিপন্ন স্ত্রীকে নিয়ে প্লেনে চেপে বাগডোগরাতে নামল। কাল সন্ধ্যের পর আর কোনো কথা হয়নি। গতরাত্রে একটু বেশি মদ্যপান হয়ে গিয়েছে বিপন্নর। সেই সময় মনে

www.boiRboi.blogspot.com

হচ্ছিল দিনটা অন্যদিনের থেকে একদম আলাদা। এই জীবনের যা কিছু স্মৃতি ছেড়ে যাওয়ার সময়ে অমন আলাদা হওয়াটাই স্বাভাবিক। অনুভূতি তাই বেশ নতুন। মানুষ মরে যাওয়ার পরেও প্রিয়জনের হাতের আগুন মুখে নেয়, নিতে বাধ্য হয়, তেমনি তপতীকে নিয়ে এই শেষযাত্রা। বিপন্নর অবশ্য মনে পড়ল না শেষবার কবে তপতী তার সঙ্গে বেরিয়েছে!

ট্যাক্সি থেকে নেমে বিপন্ন জিজ্ঞাসা করল, 'চা খাবে?'

'না।' গম্ভীর মুখে বলল তপতী।

'শালটায় ঠাণ্ডা আটকাচ্ছে?'

তপতী জবাব দিল না।

বিপন্ন দেখল ঘুম শহরটাকে যেন আগের চেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে। সে ভেবে রেখেছিল একদিন হোটেলে থেকে আগেরবার দেখা বাড়িগুলোর তল্লাস নেবে, কোনটে ভাড়া পাওয়া যায়! স্টেশনের কাছেই একটা ভদ্র হোটেলে ওরা উঠল। এখন বিকেল হয়ে এসেছে। সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। বিপন্ন বলল, 'তুমি বিশ্রাম নাও, আমি বাড়ি দেখে আসছি।'

'অসম্ভব!'

'মানে?'

'আমাকে একা রেখে সেই শাকচুন্নির সঙ্গে দেখা করার মতলব তোমার। আগেভাগে গিয়ে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখবে এ আমি হতে দেব না।'

'বেশ তুমিও চল আমার সঙ্গে।'

তপতী এক পায়ে খাড়া। বেশ ভারি হয়ে গেল বিপন্নর মন। কিন্তু সে নিজেকে বোঝাল তপস্যার পথে মুনি-ঋষিরা এর চেয়েও বেশি প্রতিবন্ধকতার সামনে পড়েন! হোটেলের ম্যানেজার অবাঙালি। দেখে মনে হয় সজ্জন। বিপন্ন তপতীকে দাঁড় করিয়ে লোকটির সঙ্গে আলাপ করল। উদ্দেশ্য জানাতে ভদ্রলোক বললেন, 'কটা বাড়ি চান বলুন। আগে হলে মুশকিল হত। আন্দোলনের পর সব খালি পড়ে আছে। আপনার বাজেট কত?'

সেই সন্ধ্যের মধ্যেই একটা দু' কামরার বাংলো ভাড়া পেয়ে গেল বিপন্ন। মাসিক ভাড়া আটশো। বাড়িওয়ালা সেই হোটেলের মালিকই। স্টেশন থেকে মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ আর সুবিধে হল বাড়িটি

www.boiRboi.blogspot.com

সাজানো। টেবিল চেয়ার থেকে আলমারি পর্যন্ত রয়ে গেছে। আগের ভাড়াটে আন্দোলনের সময় চটজলদি চলে গিয়েছেন বলে কিছুই নিয়ে যেতে পারেননি। পরদিন সকালে বিছানাপত্তর, স্টোভ হাঁড়ি বাসন কিনে গৃহপ্রবেশ করল বিপন্ন। তপতী তার সঙ্গে সবসময় থেকেছে কিন্তু একটা কথাও বলেনি।

হোটেলের মালিকই এক বৃদ্ধা নেপালি মহিলাকে ঠিক করে দিয়েছিলেন। দুবেলা এসে রান্না এবং অন্যান্য কাজ করে দেবে সে। নতুন বাড়িতে খোলা জানালার পাশে বসে পাহাড় দেখতে দেখতে বিপন্ন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'আঃ, এই হল জীবন। তা দেখলে তো, আমার এখানে কোন মহিলা নেই। খালি খালি সন্দেহ কর।'

এই প্রথম তপতী বলল, 'এখানে তুমি বাকি জীবন থাকবে?'

'ইয়েস ম্যাডাম।'

'ঠাকুরঘর নেই, এঁটোকাটার বাদ বিচার নেই, এইভাবে?'

'গুলি মারো ওসবের। প্রথম জীবনের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

'আমার আছে।'

'তুমি তো ফিরে যাবে বলেই এসেছ। সন্দেহভঞ্জন হয়েছে, চলে যেতে পার।'

'যাবই তো।'

এগারটা নাগাদ রান্না শেষ করে বৃদ্ধা চলে গেল। কলকাতা থেকে আনা ভদকার বোতল খুলল বিপন্ন। তপতী হতভম্ব, 'তুমি এখন মদ খাচ্ছ? এই সময় কখনও খাও?'

'নতুন জীবনে সব কিছু নতুন। ফ্যাচ ফ্যাচ করো না। বিপন্ন গলাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'আঃ। আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমোচ্ছে।'

'তুমি নিজের হাতে খাবার বেড়ে খাবে?'

'ইচ্ছে হলে খাব।'

'পারবে?'

'ওঃ, সব পারা যায়!'

তপতী পাশের ঘরে চলে গেল।

একটা নাগাদ বেশ ঢুলু ঢুলু নেশা হল বিপন্নর। চারপাশে কুয়াশার

www.boiRboi.blogspot.com

দঙ্গল। সে টলমলে পায়ে দরজায় দাঁড়াল। ইটস নিউ লাইফ, নতুন জীবন।

'স্নান করবে না?' পেছনে তপতীর গলা।

'স্নান? নো স্নান। এখন আমি ঘুমাবো।' ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল বিপন্ন। পড়তেই ঘুম।

ঘুম ভাঙ্গল বিকেলে। বেশ খিদে পাচ্ছে। চোখ মেলে দেখল তপতী গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসে। হাই তুলে বিপন্ন বলল, 'যাই খাবার গরম করি? তুমি খেয়েছ? আমার জন্যে অপেক্ষা করা কেন? তিনটে দেশলাই খরচ করে সে স্টোভ জ্বালালো। মাংস গরম করা যায়, কিন্তু ভাত? অবশ্য গরম ভাত খেতে হবেই এমন কোন মানে নেই। যেটুকু পারল করে সব টেবিলে নিয়ে এল সে, 'এসো। খাবে তো।'

'এ বিকেলে আমি ভাত খাব না।'

'অলটারনেটিভ কিছু নেই। আমি খাচ্ছি।' ভাতে মাংস ঢালল বিপন্ন। প্রথমবার মুখে দিয়ে বুঝল অসম্ভব ঝাল। লঙ্কা খাওয়ার অভ্যেস নেই তার। সব তরকারিতে মিষ্টি দিয়ে দিয়ে অভ্যেসটা পাল্টে দিয়েছে তপতী। দু' গ্রাস গিলে সে হাত গুটিয়ে নিল, 'বড্ড ঝাল দিয়েছে। বলতে হবে বুড়িটাকে।' সে হাত ধুয়ে নিল। নিয়ে হাসল, 'কলকাতায় হলে রাগারাগি করতাম। এখন করলাম না। নতুন জীবনে এসব হবেই।'

তপতী কিছু বলল না।

'তুমি চুপ করে আছ যে?'

'দেখে যাচ্ছি।'

'বাঃ। চমৎকার। কবে যাচ্ছ?'

'এখনও কিছু দেখা বাকি আছে।'

'ও। যাই বলো, আজকের দিনটা একদম আলাদা। কোনো এক ঘেয়েমি নেই।'

'আজ নেই। পরশু হবে কিংবা তার পরের দিন।'

'দূর! অত ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি না। বাইরে যাবে?'

'বেড়াতে?'

'হ্যাঁ। মানে, হোটেলে গিয়ে কিছু একটা খেয়ে আসা যাক।'

www.boiRboi.blogspot.com

হোটেলে খেয়ে ফিরতে ফিরতে রাত। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এল ওরা। এসে দেখল কাজের বুড়িটা জড়োসড়ো হয়ে বসে। দরজায় তালা দিয়ে গিয়েছিল।

তপতী তাকে আজকের মত ছুটি দিয়ে দিল।

ঘরে ঢুকেই বিছানায় লেপের তলায় ঢুকে গেল বিপন্ন। টেবিলে তখনও এঁটো ভাত মাংস ছড়িয়ে। তপতী জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলোর কি হবে?'

'বুড়িটা চলে গেল, না। যাকগে। কাল ও এসে পরিষ্কার করবে।'

তপতী কথা না বলে টেবিল পরিষ্কার করতে লেগে গেল। মিনিট পাঁচেকের জন্যে তাকে দেখা গেল না। তারপর সে ফিরে এল দু' কাপ কফি নিয়ে।

উৎফুল্ল হল বিপন্ন। হাত বাড়িয়ে কফি নিয়ে বলল, 'গ্রান্ড। নেপালি বুড়িটা আর তোমার পার্থক্য কি জান? না বললেও তুমি মনের কথা বুঝে নাও।'

'তাই? ভাবছি কলকাতায় ফিরে গিয়ে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেব।'

'কেন?' থমকে গেল বিপন্ন।

'আমার একটি বউ চাই।' কেটে কেটে বলল তপতী।

'বউ? তোমার? তুমি একজন স্ত্রীলোক।'

'তাতে কী হয়েছে? তোমার দ্বিতীয় জীবনে সব কিছু উল্টো হতে পারে যদি তবে আমার হবে না কেন?'

'যদি কোনো মেয়ে রাজী হয় তাহলে তাকে বিয়ে করবে?'

'নিশ্চয়ই। সে আমার মনের কথা বুঝে নেবে, তার ওপর সব রকম অত্যাচার করতে পারব, রাতদিন সে খেটে যাবে আমার জন্যে, বিয়ে করব না কেন?'

নিশ্বাস ফেলল বিপন্ন, 'তোমার দ্বিতীয় জীবনটা দেখতে লোভ হচ্ছে। আমারটা তো তুমি দেখে গেলে।'

'কাল সকালেই আমি ফিরে যাব।'

'কালই?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ।'

রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে বিপন্ন নিজেকে বোঝাল, তপতী তার প্রথম

www.boiRboi.blogspot.com

জীবনের স্ত্রী। এখন কোন সম্পর্ক নেই। এটা ভাবতেই শরীরে রোমাঞ্চ এল। আজকের এই দিনটার সঙ্গে ফেলে-আসা জীবনের কোন মিল নেই। এমন ঠাণ্ডাতেও তার ঘুম আসছিল না। সে লেপের তলায় শুয়ে নড়াচড়া করছিল। তপতী ধমকালো, 'কী হচ্ছে?'

'ঘুম আসছে না। হুইস্কি খাইনি তো।'

'খেতে কে নিষেধ করছে?'

'ইচ্ছে হচ্ছে না!'

তপতী হাসল, 'তোমার দ্বিতীয় জীবনটাকে এতক্ষণে ভাল লাগল। প্রথম জীবনে যা যা করতে তা দ্বিতীয় জীবনে করা উচিত নয়? দুপুরে ভদকাও খেও না।'

'ঠিক আছে।' বিপন্ন জড়িয়ে ধরল তপতীকে।

'একি?' অস্ফুটে বলে উঠল তপতী।

'প্রথম জীবনে ইদানীং তোমাকে জড়িয়ে ধরার কথা মনে আসত না। ধরতামও না। দ্বিতীয় জীবনে সেটা নিশ্চয়ই করা যায়। কাছে এসো, বড্ড ঠাণ্ডা। জড়ানো গলায় বলল বিপন্ন।

www.boiRboi.blogspot.com

এখন বিকেল। ব্যালকনিতে চেয়ার পেতে বসেছিলেন দিব্যজ্যোতি। সামনে চোখ মেললেই চোখের শান্তি হয়। কোথাও কোনো বাধার প্রাচীর নেই। দক্ষিণ দিক, বোধ হয় বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একদম খোলা। নিবারণ ঢোল ঠিকই বলে। এত মিষ্টি হাওয়া তিনি কোনদিন গায়ে মাখেননি।

শরীরটা জুত নেই। আজকাল নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই এমন হয়। ঠিক সময়ে খাওয়া, শোওয়া, ঘুমাবার চেষ্টা চালিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা এবং বই পড়া, জীবন বলতে তো এখন এই। লতিকার তাগাদায় জীবনের শেষপ্রান্তে এসে একটা মোচর এল। শোভাবাজারের ঘিঞ্জিতে তিনি হাঁটতে পারতেন না। এখানে এত সবুজ মাঠে হাঁটতে হাওয়া লাগবে। মল্লিকবাড়ির অন্দরে হাওয়া ঢুকতো না কিন্তু এখানে ঈশ্বরের দাক্ষিণ্য পর্যন্ত। নিবারণকে দেখে তার খারাপ লাগছে না। ওর সঙ্গে কথা বলেও আরাম পাওয়া যাবে। আশেপাশের ফ্ল্যাটের মানুষ যারা আসবে তারা কেমন হয় সেইটেই ভাবনার। দিব্যজ্যোতি খুশী মনে ঘরের ভেতরটা লক্ষ্য করলেন মুখ ফিরিয়ে। আর অমনি বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। কোনো আভিজাত্য নেই, দেশলাই বাক্সের মত দেওয়াল, শুনতেই সব মিলিয়ে অনেক স্কোয়ার ফুট কিন্তু কেমন খোপ খোপ। আজন্ম মল্লিক বাড়ির সেই বিশাল থামওয়ালা বড়-বড় ঘরে বারো ইঞ্চি দেওয়ালের মধ্যে থেকে এসে এটিকে খেলাঘর বলে মনে হচ্ছে। খেলাঘর বটে জীবনের সব পাট চুকিয়ে, আত্মীয়-অনাত্মীয়দের সব মুখের চেহারা দেখে এই খেলা ঘর পেতেছে লতিকা তাকে নিয়ে।

'অত হাওয়া লাগিও না ঠাণ্ডা লেগে যাবে।' পেছনে এসে দাঁড়ালেন লতিকা। তারপর স্বামীর বুকে গলায় একটা পাতলা চাদর জড়িয়ে দিলেন। ঠাণ্ডা লাগছিল না কিন্তু এতে বেশ আরাম হলো দিব্যজ্যোতির। হেসে বললেন, 'কলকাতা শহরে গরমকালে চাদর জড়িয়ে বসে আছি, কি কাণ্ড! শোভাবাজারে এমনটা ভাবতেও পারিনি লতিকা।' লতিকা চারপাশে তাকালেন শুধু শূন্য মাঠ আর দূরে-

www.boiRboi.blogspot.com

দূরে অর্দ্ধসমাপ্ত কিছু বাড়ি। আকাশ এখন টকটকে হয়ে আছে ; সূর্য ডুবুডুবু। লতিকা বললেন 'আঃ এত আরাম ভগবান আমার কপালে লিখে রেখেছিলেন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি গো।'

দিব্যজ্যোতি তাকালেন স্ত্রীর দিকে। বয়স সর্বাঙ্গে স্পষ্ট কিন্তু চুলে পাক ধরেনি, দাঁতও পড়েনি। একটু মোটা হয়ে গেছেন বটে লতিকা কিন্তু খাটতে দ্বিধা করেন না। এখন ওঁর দিকে পেছন ফিরে রেলিং-এ ভর করে পৃথিবী দেখছেন যে মহিলা তিনি তাঁর স্ত্রী। সাদা শাড়িতে রং খুঁজে পাওয়া ভার। দিব্যজ্যোতি ডাকলেন, 'লতু'।

লতিকা চমকে ফিরে তাকালেন। দিব্যজ্যোতি অবাক হলেন, কি হল অমন করলে কেন ?

লতিকা মৃদু মাথা নাড়ালেন, 'না।' কিছু না। বল ?' 'কিছু ত বটেই। বল বলতে চাও না।' দিব্যজ্যোতি নিজের গলায় অভিমান শুনলেন।

লতিকা হাসলেন, 'কি বলছিলে বল! বুঝেছি চা চাই ?' 'চা ?'

'তা হলে মন্দ হয় না। কিন্তু তোমার ঝামেলা বাড়িয়ে কি লাভ!'

'চা আর ভাতের ব্যবস্থা এসেই করেছি। এ বাড়িতে আজ নতুন কিন্তু তোমার জীবনে।'

'বছর গুনো না। বছরের হিসেব আর ভাল লাগে না।' 'কি বলছিলে তখন ?' লতিকা পাশে এসে দাঁড়ালেন, খুব অন্তরঙ্গ কিছু কথা বুকে ছটফট করছিল দিব্যজ্যোতির। তিনি জানেন লতিকা সেই কথাগুলোর আন্দাজ পেয়েছে। দীর্ঘদিন ভালবেসে একসঙ্গে থাকলে মাটিও আকাশকে বুঝতে পারে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে কথাগুলো উচ্চারণ করলে নিজের কানেই অন্য রকম ঠেকবে বলে মনে হল তাঁর। তিনি বললেন, বলছিলাম, আমার গায়ে চাদর জড়িয়ে দিলে কিন্তু নিজে তো এই হাওয়া গায়ে মাখছো।

লতিকার চোখ ছোট হল। তারপরেই হাসি ফুটল ঠোঁটে, 'আমার কিছু হবে না। মেয়েদের ঠাণ্ডা কম লাগে। শোভাবাজারে শীতকালে কি গরম জামা পরতাম ? শরীরে এখন এত চর্বি ঠাণ্ডাটা ঢুকবে কোত্থেকে। তুমি বসো, আমি চা আনছি।'

লতিকা চলে গেলেন ভেতরে। দিব্যজ্যোতি মাথা নিচু করলেন। এই সময়টা মন্দ কি! দুজনেই জানেন কথাটা বলা হল না কিন্তু অন্য

www.boiboi.blogspot.com

কথার ভিড়ে তা ডুবিয়ে রাখাই মাঝে-মাঝে আরামদায়ক। সারাটা জীবন শুধু যেমন অন্যের জন্যে খরচ করে যাওয়া!

আর একটু বাদে উঠে দাঁড়ালেন দিব্যজ্যোতি। সত্যি শীত লাগছে এখন। হাওয়ার দাপট বাড়ছে, আকাশের গায়ে একটু কালো ছাপ। ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন। নতুন বাল্বের আলোয় ঘরটা ঝকমকিয়ে উঠলো। এইটে তাদের শোওয়ার ঘর। কোনো মতে একটি খাট পাতা হয়েছে। আর কিছুই সাজিয়ে রাখা হয়নি। পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সুইচ টিপলেন এটি দ্বিতীয় শোওয়ার ঘর। আপাতত এখানেই সমস্ত জিনিস স্তূপ করে রাখা হয়েছে। আলমারি থেকে চেয়ার, লতিকার রান্নার সব জিনিসপত্র। এগুলোও তিনি অনেক অনেক কাল দেখে আসছেন। শোভাবাজারের বাড়িতে যাদের মানাতো এখানে তাদের দেখতে অস্বস্তি হচ্ছে। এই আধুনিক ফ্ল্যাটে পুরোনো আবার বড় বেমানান। কিন্তু নতুন কিছু কেনার সামর্থ্য কোথায়? বাইরের ঘরের দরজায় এসে আলো জ্বাললেন। সোফাসেট এখানে পেতে রাখতে হয়েছে লরি থেকে নামিয়ে। মেঝেতে কিছু নেই, দেওয়াল উদোম। কুড়ি বছর আগের সোফাসেট। ওই টুলটা ঠাকুর্মার আমলের। এখনও কি রকম চকচক করছে। হঠাৎ দিব্যজ্যোতির মনে হল এই আধুনিক বাড়িতে তিনি, বা তাঁরা কতটা মানান সই? এই গিলে করা পাঞ্জাবী, কোঁচকানো ধুতি আর সুতির চাদর? এই সময় সশব্দে কলিং বেল জানিয়ে দিল কেউ এসেছে। দরজা খুলতে গিয়ে সচেতন হলেন দিব্যজ্যোতি। আগন্তুক অবাঞ্ছিত কিনা তা জানবার জন্যে এখানকার দরজায় ছোট ফুটো থাকে! তাতে চোখ রেখে ভাল লাগল তাঁর নিবারণ এসেছে। দরজা খুলে প্রসন্ন মুখে তাকালেন, 'এসো, নিবারণ', সব ঠিক আছে? 'কোন প্রব্লেম নেই?' নিবারণ হাত তুলে প্রশ্ন করল।

'বাইরে দাঁড়িয়ে তো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যায় না। ভেতরে আসতে বলেছি।'

দিব্যজ্যোতির কথায় ভেতরে ঢুকে নিবারণ বলল 'একি। জানলা-গুলো খোলেননি কেন? ঘরে গুমোট হবে। বলেই সে জানলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, দিব্যজ্যোতি বাধা দিলেন, 'না-না। থাক এখন মশা ঢুকবে।'

মশা? নো মশা হেয়ার। থাকলে ও একদম রোগা পটকা।'

www.boiRboi.blogspot.com

'থাক না। তুমি বসো। আসলে খুললেও তো বন্ধ করতে হবে।'

ততক্ষণে একটি জানলা খুলে ফেলেছে নিবারণ, বন্ধ করার ভয়ে খুলবেন না? ঠিক আছে, যাওয়ার সময় আমি বন্ধ করে দেব। আর দেখছেন কি হাওয়া! কি পবিত্র!

'পবিত্র' দিব্যজ্যোতি চমকে উঠলেন, 'শব্দটা খুব ভাল বললে হে! তুমি কি কবিতা লেখ? পবিত্র হাওয়া! বাঃ।'

নিবারণ লজ্জা পেল, 'না-না। অশিক্ষিত মানুষ, এসব ক্ষমতা আমার কোথায়। মুখে যা আসে বলে ফেলি। বলার পরও কেউ না বলে দিলে বুঝতে পারি না কথাটা ভাল।'

দিব্যজ্যোতি ভাল করে ছেলেটিকে লক্ষ্য করলেন, যে বয়স শুনেছেন চেহারায় সেটি মালুম হয় না। তিনি অন্য প্রসঙ্গে গেলেন, 'আর সব ফ্ল্যাটের মানুষ কবে আসছেন?'

'এসে গেলেন বলে। আমরা তো তৈরী হয়ে বসে আছি। এখন ঠিক আছে, সবাই এসে গেলে একা আমায় সব ঝক্কি সামলাতে হবে। প্রাণহরিবাবু, চেনেন তো ওঁকে, ওই যে মিটিং-এর দিন যিনি আপনাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমাদের ম্যানেজার। ছি, ছি, এই দেখুন বলি কথাটা ম্যানেজার কিন্তু সঙ্গ দোষে জিভে যে উচ্চারণ ঢুকেছিল তাই বেরিয়ে আসে। যা বলছিলাম, প্রাণহরিবাবু মাঝে মাঝে আসবেন এখানে অতএব আমার একার ঘাড়ে সব। কিন্তু কাজ দেখে পালাবার পাত্র নই আমি।' নিবারণ যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছিলেন, ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন দিব্যজ্যোতি।

তিনি বললেন, 'তোমরা এই বাড়িটার নাম জব্বর দিয়েছ হে।'

তা যা বলেছেন। বাঙালি থেকে চীনে সবাই আসছেন তখন বাড়ির নাম কলকাতা ভাল মানাচ্ছে। আমি এবার উঠি।' উসখুস করল নিবারণ।

'উঠবে মানে? এলেই বা কেন?'

'এই প্রথম সন্ধ্যে, আপনারা আছেন কেমন দেখতে ইচ্ছে করল।'

'খুব ভাল ইচ্ছে। বসো তো! তোমার সঙ্গে গল্প করতে আমার ভাল লাগছে।'

এই সময় দু'কাপ চা হাতে, লতিকা দরজায় এসে দাঁড়াতেই নিবারণ উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করল, 'ছি-ছি, আপনি আমার জন্যেও চা

www.boiboi.blogspot.com

করলেন ?'

'একজনের চা তৈরীতে যে পরিশ্রম দুজনের কিন্তু তা ডবল হয়ে যায় না, আপনি অনেকদিন বাঁচবেন !' লতিকা টেবিলে চা নামিয়ে রাখলেন। দিব্যজ্যোতি একটু চিমটি কাটলেন, 'তুমি আবার কখন মনে করলে ওকে !' 'করেছি।' উল্টোদিকের সোফায় গুছিয়ে বসলেন লতিকা। নিবারণ একদৃষ্টিতে লতিকার দিকে তাকিয়েছিল। বিব্রত মুখে লতিকা প্রশ্ন করলেন, 'কি দেখছেন ওরকম করে ?' নিবারণ মাথা নাড়ল, 'আপনি না কি বলব সাক্ষাৎ মা দুর্গার মত দেখতে।'

হঠাৎ ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন দিব্যজ্যোতি, লতিকার মুখে রক্ত কমল। নিবারণ তার কথায় জোর দিল, 'হ্যাঁ, আমি মিথ্যে বলছি না। আপনার দিকে তাকিয়েই কেমন ভক্তি ভক্তি ভাব জাগে।'

দিব্যজ্যোতির গলার তখনও হাসির রেশ, 'ঠিকই বলেছ ভাই। আমার ত সারাজীবন ওই করে কেটে গেল।' লতিকা কৃত্রিম রোষ দেখালেন. 'থামো তো ! নিবারণবাবু, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে। আপনি না এলে আমাকেই ডাকতে যেতে হত। কিন্তু এত বড় বাড়ি একদম খালি হয়ে রয়েছে ভয়-ভয় লাগে।'

দিব্যজ্যোতি বললেন, 'এখন বাড়ি খালি বলে ভয় পাচ্ছ, বাড়ি ভরে গেলে আবার লোক দেখে হাঁপিয়ে উঠবে।'

'উঠি উঠব তবু শোভাবাজারের বাড়ির মত ঘরকুনো হয়ে থাকতে তো হবে না। শুনুন ওঁকে তো বলে কোনো লাভ নেই। একটা কথাও কানে ঢোকে না। আমার একজন পুরুত চাই। ভালো পুরুত।' লতিকা আবদারের গলায় জানালেন।

'পুরুত মানে পুজো করবেন ?' এই তল্লাটে কোনো পুরোহিত আছে কিনা মনে করতে পারল না নিবারণ। প্রাণহরিবাবু ব্রাহ্মণ, উনি পুরুতগিরি করেন কিনা সেটা জানা নেই।

'হ্যাঁ। গৃহপ্রবেশ করলাম অথচ একটা পুজো হল না, এটা খুব খারাপ ব্যাপার। আমি তাই বেশির ভাগ জিনিষপত্রে হাত দিইনি। পুজো করার পর গোছাব। আপনি কাল সকালেই একজন পুরুত এনে দিন। খুব বড় কিছু নয়, একটা পুজো করে নেব।'

দিব্যজ্যোতি মন দিয়ে শুনছিলেন। এবার বললেন, ছাড়ো তো এসব। পুরুত নয়, আমাদের একটা ভাল কাজের লোক চাই। শোভাবাজারে

www.boiRboi.blogspot.com

যারা ছিল তারা পাড়া ছেড়ে এত দূরে আসতে চাইল না। তুমি ভাই একটি ঝি কিংবা চাকর দেখে দাও, নইলে তোমার ওই দুর্গাঠাকুরাণীর ফাই-ফরমাস খাটতে-খাটতে আমার প্রাণ জেরবার হয়ে যাবে।'

লতিকা ফুঁসে উঠলেন, 'বাজে বকো না। শোভাবাজারে তো পায়ের ওপর পা তুলে থাকতে। লোক আজ না হোক কাল পেয়ে যাব কিন্তু পুরুত আমার চাই কালকেই। ভয় পেয়ো না, তোমাকে এই পুজোর ব্যাপারে কিছু করতে হবে না। এখানে কোন ঠাকুরবাড়ি নেই?'

নিবারণ মাথা নাড়ল। 'আপনি তো কথাটা বলে ফেলেছেন, যোগাড় করার দায়িত্ব আমার। তবে একটা কথা মল্লটা নিয়ে খুঁতখুঁতুনি করবেন না।'

লতিকা শিউরে উঠলেন, 'ওমা, সেকি কথা!' দিব্যজ্যোতি হাসলেন, 'বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ। বঙ্গগৃহিনীরা এই করেই মরল।'

'মরি নিজের বাড়িতেই মরব। বিয়ের পর থেকেই মান্ধাতার আমলের বাড়িতে শরিকদের সঙ্গে ঝগড়া করে কাটাতে হয়েছে। তোমার আর কি! এখন একটু হাত পা মেলার সুযোগ পেয়েছি, হাজার হোক নিজের বাড়ি বলে কথা।' এই সময় দুম করে আলো নিভে গেল। নিবারণ বলল, 'এই এক জ্বালা। ঘাবড়াবেন না, জেনারেটার আছে। দেখি গিয়ে।' নিবারণ অন্ধকারেই চা এক চুমুকে শেষ করে উঠে দাঁড়াল। দিব্যজ্যোতি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'অন্ধকারে যাবে কি করে? লতু টর্চ আনো।'

নিবারণ বললেন, কিছু ব্যস্ত হবেন না। প্যাঁচাদের চেয়ে খারাপ দেখি না অন্ধকারে। কলকাতায় থাকতে থাকতে সেটাও অভ্যাস হয়ে গেছে। কাল আপনি আপনার পুরুত পেয়ে যাবেন ঠিক। সকাল সকাল আনব!'

বাড়িটা এখন ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। নিবারণ বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজা দিয়ে লতিকা বললেন, 'এখানে ভূতের মত বসে না থেকে বারান্দায় বসবে চল।'

'মোমবাতি আনোনি?' দিব্যজ্যোতির উঠতে ইচ্ছে করছিল না। জানলা দিয়ে খারাপ হাওয়া আসছে না।

লতিকা বললেন, 'এনেছি তবে এখন খুঁজে পাব না।' বলে অন্ধকারেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইলেন দিব্যজ্যোতি। খালি বাড়িতে

www.boiRboi.blogspot.com

খুটখাট শব্দ হচ্ছে। দিব্যজ্যোতির মনে হল খালি বাড়ি বলেই এই শব্দ। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই তাঁর অস্বস্তি আরম্ভ হল। যেন ঘরের মধ্যেই তিনি শব্দের উৎস খুঁজে পাচ্ছেন। দিব্যজ্যোতি নিচু গলায় ডাকলেন, 'লতু।' শব্দটা যেন কয়েকগুণ জোরে কানে বাজল। তিনি ধীরে ধীরে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেলেন। ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নখে ব্যথা লাগল টেবিলের পায়ে ধাক্কা লাগায়।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হল না। শোভাবাজারে কোনোকালে ও ভূতের ভয় পায়নি। ওর কে জেঠিমা তান্ত্রিকদের খুব মানতেন। বিডন স্ট্রিটে এক তান্ত্রিকের কাছে যাওয়া আসা ছিল তাঁর। তন্ত্রমতে প্রেত পাঠানো যায় কারো ক্ষতি করতে অথবা কেউ ক্ষতি করছে জানলে সেই প্রেতকে দিয়ে পাহারা দেওয়ানো যায় এসব কথা শুনে শুনে নেশা চড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তাঁর মনে অন্যরকমের ভয় এল। এই বিশাল শূন্য বাড়িতে একা থাকাটাই অসম্ভব। শব্দগুলো নানারকম মানে হয়ে কানের ভেতরে ঢুকছে।

দিব্যজ্যোতি হাতড়ে হাতড়ে বারান্দায় চলে এসে থমকে দাঁড়ালেন। লতিকা গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। দিব্যজ্যোতি ঠিক করলেন চশমার কাঁচ এবার পাল্টাতে হবে। যতই অন্ধকার হোক, লতিকাকে তিনি বেশি ঝাপসা দেখছেন যেন। বাইরে অনেক দূরে টিম-টিম আলো। আর আকাশটা এখন মেঘমুক্ত কারণ ঠাসঠাস তারারা ঝক্‌ঝক্‌ করছে। দিব্যজ্যোতি আরও একটু এগোলেন। তাঁর পায়ের শব্দ এতক্ষণে লতিকার কানে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু সে মুখ ফেরাচ্ছে না। মজা লাগল দিব্যজ্যোতির মেয়েদের বয়স বাড়লেও মনের মধ্যে অভিমানের বাক্সটা ঢেকে ঢুকে রাখে। সময় বুঝলেই খানিকটা খুলে দেখায়। দিব্যজ্যোতি বিকেলে যেটা বলতে গিয়ে পারেননি এই আধা অন্ধকারে যখন তারার আলোর মিশেল চারপাশে তখন দু'হাত বাড়িয়ে লতিকাকে কাছে টানলেন। লতিকার শরীরটা এই বয়সেও নরম, অন্তত তাঁর চেয়ে নরম। কাঁধে চাপ দিয়ে ওঁকে ঘুরিয়ে মুখ লাগিয়ে লতিকার চিবুক তুলে অনেক অনেকদিন পরে চুম্বন করলেন তিনি। এক ঝটকায় মনে হল যৌবনের উচ্ছ্বাস দিনগুলোর যে স্বাদ লতিকার ঠোঁটে পেতেন তার গন্ধ যেন নাকে লাগল। কিছু বলার জন্য তিনি মুখ খুলতে যেতেই লতিকা হু-হু করে কেঁদে উঠলেন তারপর দিব্যজ্যোতির বুকে

www.amarboi.com

মাথা রেখে সেই কান্নাটা গিলতে চেষ্টা করলেন।

কাঠ হয়ে গেলেন দিব্যজ্যোতি। কোনোমতে নিজেকে সামলে লতিকার পিঠে আলতো হাত বোলালেন। তারপর গাঢ় স্বরে বললেন, 'you must not, you must not !'

তা এসব বছর পাঁচেক আগের কথা। সময়ের চড়া পড়ে পড়ে এত সময় কোথাও এক ফোঁটা জল নেই বলে ধারণা জন্মেছিল দিব্যজ্যোতির কিন্তু এ স্রোত চোখের বাইরে দিয়ে বয়! চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন তিনি। সেই সময় লতিকা বলে উঠলো, 'বড় খুকীদের আসতে লিখলাম।

জামাই ছুটি পায়নি দিব্যজ্যোতি মনে করিয়ে দিলেন, 'বড় খুকীর মেয়ের পরীক্ষা!

লতিকা জবাব দিলেন না। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল ছুটি না পাওয়া, মেয়ের পরীক্ষা—এসব বাহানা। কেউ তাঁর ইচ্ছের দাম দিতে চায় না। কিন্তু আজ ওই বারান্দায় যাওয়ার পর, একা দাঁড়িয়ে অন্ধকার দেখার পর থেকেই মনে হচ্ছিল ওর কথা। মনে হচ্ছিল কোথাও কি ভুল হয়ে গেছে? সে যেসব অন্যায় করেছে চোরের মত চলে গিয়ে তাঁরাও কি ওকে বুঝতে ভুল করেছেন?

ছোটবেলায় ছোটখুকী বলত, দেখো আমি বড় হয়ে বিয়েই করব না। বিয়ে করলেই তো তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। দুই বোনের পার্থক্য ছিল দশ বছরের। বড় খুকীর বিয়ের পরে তাঁর কান্না দেখে মেয়ে বলেছিল!

এই বাড়ি নিজের। কোনো শরিক নেই, কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না। এই সুখ তাঁর অনেকদিনের আকাঙ্খায় ছিল। কিন্তু আজ কেন নিজেকে সুখী ভাবতে পারছেন না তিনি। হঠাৎ মুখ তুললেন লতিকা, 'মানুষ আর জন্তুর মধ্যে কি পার্থক্য জানো? সবাইকে নিয়ে সুখী হতে না পারলে মানুষের সুখ পূর্ণ হয় না।'

'কি বলতে চাইছ তুমি?' দিব্যজ্যোতির বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো।

'আমি তোমার কাছে একটা ভিক্ষে চাইব?'

'ভিক্ষে বলছ কেন?'

'ছোটখুকী, ছোটখুকীর কাছে একবার যেতে চাই।'

www.boiRboi.blogspot.com

'কেন ?'

'জানি না। কিন্তু না গেলে মন শান্ত হবে না।'

'সে যদি তোমায় অপমান করে ?'

'আর কখনো যাব না।'

'না লতিকা। যাকে একবার মৃত ভেবেছ, তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিনি তাকে আর টেনে এনো না। স্মৃতি হাতড়ে পিছু ফেরা ভাল নয়। তোমার বড় মেয়েও খুশি হবে না। তাছাড়া যে লোকটা ছোট খুকীকে পয়সার লোভে মডেলিং করায় তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছা আমার নেই।' দিব্যজ্যোতি কথাগুলো বলছেন যখন তখনই আলো ফিরে এল। শোভাবাজারে লোডশেডিং শেষ হলে অনেক গলা থেকে একসঙ্গে আনন্দ-ধ্বনি ছিটকে উঠত, কিন্তু এখানে কেউ কোন আওয়াজ করল না। এবং তখনই দিব্যজ্যোতির খেয়াল হল নিবারণ জেনারেটর করতে গিয়েছিল অথচ তার কোন ফল পাওয়া যায়নি। ব্যাপারটা নিয়ে পরে কথা বলবো।

মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল দিব্যজ্যোতির। লতিকা তাঁকে ডাকছেন।

'কি বলছ ?' বিরক্তি মুখে, গলায়।

'বাথরুমে যাব।'

'যাবে তো যাওগে। আমাকে ডাকার কি আছে।'

'কি সব শব্দ হচ্ছে চারপাশে। তুমি একটু দাঁড়াবে।'

লতিকার কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিল। তবু সেই মুচড়ানো গলায় বললেন। 'কি করব! আজ ওকে ভীষণ মনে পড়ছে। আমাকে ছোটবেলায় এইরকম বারান্দাওয়ালা বাড়ির কথা বলত!' দিব্যজ্যোতি বললেন, 'লতু! তুমিই বলেছ, সী ইজ ডেড টু আস।'

লতিকা নিজেকে মুক্ত করে ধীরে ধীরে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। দিব্যজ্যোতি একটু অসহায় চোখে তাকালেন। তার শরীরে কম্পন আসছিল। হাঁটু দুটো হঠাৎ খুব দুর্বল হয়ে পড়ল। তিনি চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন। এবং এতদিন বাদে স্ত্রীকে চুম্বনের যে আনন্দ কিছুক্ষণ আগে বেলুনের মত ফুলছিল তা এখন চুপসে গেছে। ওই কান্না একটি কারণেই আসতে পারে লতিকার, তাঁরও। দুটো মানুষের সূত্র যদি এক হয় তাহলে একের অনুরক্ষণ অন্যে টের পাবেই। তিনি কিছুতেই মুখটা মনে করতে চাইছিলেন না তখন বারংবার সে

ফিরে আসছে। উনিশ বছর বয়সের তাঁর সবচেয়ে আদুরের মেয়ে, ছোট মেয়ে, একেবারে বিয়ে করে খবর পাঠাল সে কাজটা করেছে। সামনে এসে দাঁড়িয়ে জানানোর সাহস হলো না। শোভাবাজারের রক্ষণশীল বাড়ির অন্য আত্মীয়দের কথা ছেড়ে দিলেন এই চোরের মত কাজটার জন্যে প্রচণ্ড অপমানিত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি আহত হয়েছিলেন লতিকা। বড় মেয়ে সম্বন্ধ এনেছিল। বড় জামাই-এর অফিসে কাজ করত ছেলেটি। দিল্লিতেই বাড়ি। মেয়ে জামাই লিখেছিল ছোটমেয়েকে নিয়ে লতিকা যেন দিল্লিতে কয়েকদিন কাটিয়ে আসেন। সেখানেই মেয়ে দেখবে ছেলে। সেই মত টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছিল আর আজই এই কাণ্ড। ছেলে ছবি আঁকে। নিজের সিগারেটের খরচ যার ছবি বিক্রির টাকায় ওঠে না সে বিয়ে করেছে দিব্যজ্যোতি মল্লিকের মেয়েকে। লতিকা তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করেছিলেন তিনি ধরে নেবেন ছোট মেয়ে মৃত। মুখ দর্শন করবেন না ঠিক করেও দিব্যজ্যোতিকে অনেকদিন নিজের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। উনিশ বছর তিল তিল করে সে স্নেহ দিয়ে ওকে গড়ে তুলেছিলেন তা মুছে ফেলা মুশকিল। কথাটা জানার পর মেয়ে আর এ মুখো হয়নি। দিব্যজ্যোতি জানেন না ফিরে এলে তিনি কি করতেন। তার বিস্ময় লাগে, উনিশ বছরের অভ্যাস ভালবাসা পরস্পরের হৃদয়ের স্পর্শে ম্লান হয়ে গেল মেয়ের কোন আকর্ষণের তাগিদে? কয়েক বছরের বা মাসের মধ্যে একটি পুরুষ কোন যাদুতে এত মূল্যবান হয়ে ওঠে? তারপর যখন কাগজের বিজ্ঞাপনে মেয়ের মোহিনী ছবি দেখতে লাগলেন, বুঝলেন মডেলিং করছে পেট ভরাতে তখন তলানিটুকুও চলে গেল মন থেকে।

'দাঁড়াবো? আমি? বাথরুমের দরজায়? তুমি কি কচি খুকী?' লতিকা আর কথা না বলে নেমে গেলেন বিছানা থেকে। নতুন জায়গা, দেওয়ালের গন্ধ এখনও মরেনি, ঘুম আসছিল না প্রথম রাতে। তাও যদি এল লতিকার ভূতের ভয় সেটা ভাঙিয়ে দিল। বালিশে মুখ ডুবিয়ে নিজের শরীর অনুভব করেছিলেন দিব্যজ্যোতি। হঠাৎ কানে একটা শব্দ বাজল। না, খালি বাড়ির শব্দ নয়, লতিকার হাত থেকে মগ পড়ে গেছে নিশ্চই। তিনি আবার ঘুমাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আর ঘুম আসছে না। দিব্যজ্যোতি চিৎ হয়ে শুতেই মনে হল লতিকা এখনও ফেরেননি। যতই হোক এতক্ষণ কারো বাথরুমে থাকা বাড়াবাড়ি। তিনি

শুয়ে শুয়েই ডাকতেন 'লতু'। কেউ সাড়া দিল না। অথচ বাথরুমটা তো লাগোয়াই। দিব্যজ্যোতি উঠলেন। চশমাটা নিতে গিয়েও নিলেন না। ভেজানো দরজা, ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া নেই, দিব্যজ্যোতি আবার ডাকলেন, 'লতু ? তোমার হয়ে গেছে ?'

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করেও সাড়া না পেয়ে দরজায় চাপ দিতেই বুক নিংড়ে আর্তনাদ ছিটকে উঠল দিব্যজ্যোতির। লতিকা বাথরুমের মেঝেতে পড়ে আছেন।

দৌড়ে কাছে যেতে গিয়ে দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলালেন দিব্যজ্যোতি। শরীরটা যে এত বিকল হয়েছে তা আন্দাজেও ছিল না। তাঁর নিজের বুকই ধড়াস করছে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। কোনো রকমে তিনি লতিকার শরীরের সামনে উবু হয়ে বসলেন। তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। হাত তুলে লতিকার কাঁধ ধরলেন তিনি, 'লতু লতু। কি হয়েছে লতু ? কথা বল লতু।'

কোন সাড়া নেই। দিব্যজ্যোতি কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাঁর শরীরে এখন এমন সামর্থ্য নেই যে নিচে গিয়ে হাঁকাহাঁকি করে নিবারণকে ডাকবেন। কিন্তু একজন ডাক্তার আনা দরকার এই বোধ সক্রিয় ছিল তাঁর। নিজের সমস্ত মানসিক শক্তি জড়ো করে শক্ত হতে চাইলেন তিনি। তারপর আঙুল নিয়ে গেলেন লতিকার নাকের সামনে। নিঃশ্বাস কি পড়ছে ? বোঝা যাচ্ছে না। দিব্যজ্যোতির মনে হল তাঁর আঙুলের চামড়া এত মোটা হয়ে গেছে বয়স হওয়ায় যে সামান্য আলতো চাপ ঠাওর করতে পারছেন না। মুখ তুলতেই কল, দেখতে পেলেন তিনি। কি মনে হতেই কলের মুখ ঈষৎ খুলতেই জল পড়তে লাগল লতিকার মাথায়। সেই জল তিনি হাতে মুখে বুলিয়ে দিতে লাগলেন ওঁর গলায় কপালে।

আচমকা অন্যতর ভাবনা এল। এখন লতিকা যদি এই ভাবেই চোখ বন্ধ রেখে চলে যায় ? ওর এই সাধের নতুন বাড়িতে লতিকা ছাড়া তিনি কেমন করে থাকবেন ? শুধু বাড়ি নয়, তাঁর প্রতিদিন অভ্যাসের সঙ্গে যখন লতিকা জড়িত তখন তিনি এরপরের দিনগুলো বাঁচবেন কি করে। বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠল দিব্যজ্যোতির। তিনি প্রাণপণে লতিকাকে ডাকতে লাগলেন ?

এই সময় চোখ মেললেন লতিকা। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা, জলের স্পর্শ

www.boiRboi.blogspot.com

এবং কানে নিজের নাম তাকে বিহ্বল করে তুলল। এবং তখনই তিনি স্বামীর মুখ দেখতে পেলেন। ধীরে ধীরে উঠে বসতে চেষ্টা করলেন লতিকা। দিব্যজ্যোতি জিজ্ঞাসা করলেন বিপর্যস্ত স্বরে, 'কি হয়েছিল লতু, তোমার কি হয়েছিল।'

ভেজা চুল, সিক্ত জামায় শীত করল লতিকার। চোখ বন্ধ করে বললেন, পড়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ মাথাটা—।' দুটি মানুষ পরস্পরকে অবলম্বন করে কোনক্রমে প্রচুর সময় নিয়ে খাটে ফিরে এল। লতিকা পোশাক পরিবর্তন করার শক্তি পেলেন না। সিক্তবস্ত্র মুক্ত হয়ে চাদরে শরীর মুড়ে পড়ে রইলেন এক পাশে। দিব্যজ্যোতি, শক্তিহীন, চোখের সামনে অন্ধকার নিয়ে, বুক ভর্তি যন্ত্রণার প্রথম পদক্ষেপ বুঝেও চাদর টেনে তাঁর পাশে শুয়ে। বালিশের নিচ থেকে কৌটো বের করে একটা সরবিট্রেট বের করে নিজের মুখে দিতেই তারপর দ্বিতীয়টি লতিকার মুখের দিকে বাড়িয়ে দিতেই শুনলেন, 'কি ?'

'সরবিট্রেট !'

'থাক।'

দুটো মানুষের শরীরে সাদা চাদর এমনভাবে পাশাপাশি টানটান যে আচমকা দেখলে দুটি মৃতদেহ মনে হওয়া অস্বাভাবিক হত না। লতিকার হাত বেরিয়ে এসে দিব্যজ্যোতির হাত আঁকড়ে ধরল। বাথরুমের খোলা কল তখন একটানা জল ঢেলে যাচ্ছে।

www.boiRboi.blogspot.com

নিরাপদ বসুকে এই কাহিনীর নায়ক বলা যাবে না। অথচ যা কিছু ঝামেলা ওকে নিয়েই। নিরাপদ অবশ্য ঝামেলা বলে স্বীকার করে না। সে যথেষ্ট ঝামেলা-এড়ানো ভদ্রলোক। ওর স্ত্রী হৈমন্তী যদিও এই স্বভাবটার জন্যে ওকে ব্যক্তিত্বহীন মানুষ বলে মনে করে। নিরাপদ এসব শুনতে দুঃখ পায়। কিন্তু ইদানীং স্ত্রীর কথাবার্তা সে উপেক্ষা করতে শিখে গিয়েছে। নিরাপদ একজন সরকারি চাকুরে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়ুয়া হিসেবে ফল ভাল করেছিল। চাকরিতে ফাঁকি দেয়নি। তাই পঞ্চাশ বছরেই যতটা ওপর তলায় ওঠা সম্ভব উঠেছে।

হৈমন্তী খুব গোছানো মেয়ে। স্বামীর যা আয় তাতেই সে সংসারটাকে সুন্দর করে সাজিয়েছে। চাহিদা তো অনেক থাকে কিন্তু সেটা পাওয়া যাচ্ছে না বলে দিনরাত অশান্তি করে না। চল্লিশের এপাশে এসেও হৈমন্তী এখনও আকর্ষণীয়, যাকে বলে সুন্দরী, ঠিক তাই।

আর এখানেই তার যা কিছু কষ্ট। নিরাপদ পঞ্চাশেই কেমন বুড়ো বুড়ো হয়ে গিয়েছে। অফিস আর বাড়ি ছাড়া কিছুতেই উৎসাহ নেই। সুন্দরী স্ত্রী যে তাকে তেমন আকর্ষণ করে তা আর আজকাল বোঝা যায় না। হৈমন্তী-নিরাপদের মেয়ের নাম অদিতি। বয়স আঠারো-ঊনিশের মাঝামাঝি লম্বা, দারুণ দেখতে, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। পাড়ার ছেলেদের জ্বালায় হৈমন্তীর রাত্রের ঘুম নেই। টেলিফোন বাজলেই অদিতিকে কেউ না কেউ ডাকবে। লেটার বক্সে প্রেমপত্রের বন্যা বয়ে যায়।

ভরসা এই মেয়েটা এসব পাত্তা দেয় না। হৈমন্তীর রাগ, নিরাপদ একটুও চিন্তিত নয় মেয়ের ব্যাপারে। কখন কোন উটকো ছেলের সঙ্গে মজে গেলে সারাজীবন কপাল চাপড়াতে হবে। সারা সময় মেয়েকে সেকথা শোনায় হৈমন্তী।

এই নিরাপদকে অফিসের কাজে একবার দিল্লীতে যেতে হয়েছিল। দিল্লীতে হৈমন্তীর দিদি থাকেন। কোন অসুবিধে হয়নি। ফেরার সময় কলকাতার টিকিট পাওয়া গেল না। সেকেণ্ড ক্লাশ স্লিপারে সে

www.boiRboi.blogspot.com

বেশী স্বচ্ছন্দ।

ভায়রাভাই রাজধানীর চেয়ারকারের টিকিট ম্যানেজ করে দিল। বড়লোকী পরিবেশ একদম সহ্য হয় না নিরাপদর। এয়ার কণ্ডিশণ্ড মানে সেই রকম ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল তার। কিন্তু সিটে বসে দেখল তার মত পোশাক ও চেহারার অনেক যাত্রী যাচ্ছে। সে সাইড ব্যাগ থেকে আগাথা ক্রিষ্টির একটা বই বের করে চোখ রাখল হেলানো চেয়ারে মাথা রেখে। আগাথা ক্রিষ্টি ওর খুব প্রিয় লেখিকা! গাড়ি চলল। ভেতর থেকে গতি বোঝার উপায় নেই, ধুলো নেই। নিরাপদর ভাল লাগল। এই সময় বেয়ারা গোছের একটি লোক এসে সামনে দাঁড়িয়ে সেলাম করল। চমকে উঠে বসল নিরাপদ। তারপর লোকটিকে লক্ষ্য করে বুঝল সেলামটা তার পাশে বসা যাত্রীর জন্যে।

বেয়ারা খুব বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'সাব্, কফি চাহিয়ে?'

'কফি? হোলে মন্দ হয় না।'

'ঠিক হ্যায় সাব।' বেয়ারা চলে গেল।

নিরাপদ অবাক। কম্পার্টমেণ্টের কাউকে এ প্রশ্ন করেনি বেয়ারা। এই লোকটি কি এমন তালেবর যে তাকেই খাতির করতে হবে! কিন্তু এ প্রশ্ন মনে এলেও মুখে কিছু বলল না নিরাপদ। সেটা তার স্বভাবে নেই। নিজেকেই বোঝাল, নিশ্চয়ই রেলের কোন বড় কর্মচারী। সে আড়চোখে তাকাল। বছর পঁয়ত্রিশেক হবে। রোগা, ফর্সা চশমা পরা। এধরণের চেহারার বয়স চট করে অবশ্য আন্দাজ করা যায় না।

কফি এল। আরাম করে খেলো লোকটা পাশে বসে। কম্পার্টমেণ্টের অনেকেই এই খাওয়াটা দেখছে। সবার চোখেই বিস্ময়।

পাশাপাশি বসেও কথা হচ্ছিল না। আগ বাড়িয়ে কথা বলার স্বভাব নেই নিরাপদর। সে বই-এ দৃষ্টি রেখেছিল। বেয়ারাটা আবার এল কাপ প্লেট নিতে। জিজ্ঞাসা করল, 'সাব, আপনি কি আলাদা কোন মেনু ডিনারে যাবেন?'

লোকটি বলল, 'না, না। যা সবাইকে দিচ্ছ তাই আমাকে দিও।'

নিরাপদ নিশ্চিত হল লোকটি রেলের অফিসার। তার অবশ্য রেলের অফিসারের সঙ্গে আলাপ রাখার প্রয়োজন নেই। কালেভদ্রে কলকাতা থেকে সে বের হয়।

'ওটা কি আগাথা ক্রিস্টি?'

www.boiRboi.blogspot.com

চমকে উঠল নিরাপদ। দ্রুত মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'আমার খুব প্রিয় লেখক। কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি থেকে আমাদের ফেলুদা, হাতে পেলে পৃথিবী ভুলে যাই আমি।'

নিরাপদ হাসল। অথবা বলা যেতে পারে, হাসবার চেষ্টা করল।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'দিল্লীর লোক নন নিশ্চয়ই?'

'না, না, আমি কলকাতায় থাকি। কাজে এসেছিলাম। সরকারি কাজে।'

'প্রায়ই আসেন?'

'না। হঠাৎই আমাকে আসতে হল।'

'কোন ডিপার্টমেণ্ট আপনার?'

নিরাপদ সেটা জানাল। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'যাক খুব দুশ্চিন্তা ছিল, আমার পাশে যদি কোন উটকো লোক বসত তাহলে সারাটা রাত মুখ বন্ধ করে থাকতে হত। আপনার নামটা কিন্তু জানা হল না!'

'আমি নিরাপদ বসু। আপনি?

'অম্লান মিত্র।'

ভদ্রলোক কি করেন, রেলের অফিসার কিনা তা জানা গেল না। জিজ্ঞাসা করতেও সঙ্কোচ হচ্ছিল নিরাপদর। নিজের ওপর এই কারণেই তার ক্ষোভ হয়। হৈমন্তী রেগে যায় এই কারণে। ডিনার এল। ভদ্রলোক বেয়ারাকে বললেন, খাবার দেওয়ার আধঘণ্টা বাদে আবার যেন কফি দিয়ে যায়। এবার দুকাপ।

না, লোকটা খারাপ নয়। রাত্রে ঘুমোবার আগে অনেক কথা হল। সকালেও। নিরাপদর অফিস এবং বাড়ির ফোন নম্বর নিলেন ভদ্রলোক। নিজের ফোন নম্বর দিলেন না। বললেন, টালিগঞ্জের নাম্বার শুনছি পাল্টে যাবে। গিয়ে দেখব হয়তো এরই মধ্যে পাল্টে গিয়েছে। আপনাকে পরে জানিয়ে দেব।'

এই লোকটির কথা বাড়িতে ফিরে হৈমন্তীকে বলেনি নিরাপদ। বললেই হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করত, 'একটা লোককে সব জানিয়ে দিলে অথচ সে কি করে কোথায় থাকে তা জানলে না?' খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন। কিন্তু নিরাপদ বোঝাতে পারবে না যে তার মনে হয়েছিল লোকটি নিজের সম্পর্কে বেশী কথা বলতে চায় না। তাই জিজ্ঞাসা করতে তার ভদ্রতায়

www.boiRboi.blogspot.com

লেগেছিল। তাছাড়া একজনের সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হয়েছে এবং সেখানেই শেষ, তাই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা করে কি হবে। হৈমন্তীকে একথা বলা মানে ঝামেলা পাকানো। হৈমন্তীকে খুশী করার জন্যে ও রোজ সকালে বাজারে যায়, গ্যাস বুক করে, তাগাদা দেয়, রেশনের দোকানে যায়, শুধু কেরোসিনের লাইন দেয় না। সেটা হৈমন্তীই নিষেধ করেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বস্তির লোকেদের সঙ্গে স্বামীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে চায় না সে। কিন্তু ইলেক্‌ট্রিক বা টেলিফোনের বিলটা ওর পকেটে গুঁজে দেয়। ডাবল সিলিণ্ডার থাকায় গ্যাস ফুরোবার আগেই দ্বিতীয় সিলিণ্ডার পাওয়া যায়। হেমন্তীর সমস্যা থাকে না। এবার দিল্লী থেকে এসে শুনল যে কোন মুহূর্তে আগের গ্যাস শেষ হয়ে যাবে কিন্তু দোকানে বলা সত্ত্বেও দ্বিতীয় সিলিণ্ডার পাওয়া যাচ্ছে না! বলছে সাপ্লাই নাই। পাড়ার দোকানে গ্যাস সাপ্লাই না থাকলে নিরাপদ কি করতে পারে? হৈমন্তী অবশ্য কাজের মেয়েকে দিয়ে অনেকটা কেরোসিন তুলিয়ে রেখেছে।

একদিন অফিস থেকে ফিরে নিরাপদ দেখল লোডশেডিং। মেজাজ খারাপ হয় না আজকাল। এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রথম প্রথম ফোন করত অদিতির তাড়নায়। শুনত কেবল ফল্ট। আজ কাল করে না। মোমবাতি জ্বলে, গরমে পচতে হয়। আজ টেলিফোন বাজল।

হৈমন্তী কথা বলে জানাল অম্লান মিত্র নামে একজন তাকে ডাকছে।

নিরাপদ ফোন ধরল। অম্লানের গলা পাওয়া গেল, 'কি মশাই চিনতে পারছেন? আমি অম্লান। রাজধানীতে আলাপ হয়েছিল।'

নিরাপদ শুকনো হাসল, 'হেঁ হেঁ। কেমন আছেন।'

'ফার্স্টক্লাশ। আপনাদের পাড়ায় এসেছিলাম। ভাবলাম যোগাযোগ করি। কি করছেন?'

'কিছু না।'

'তাহলে আপনাদের ওখানে ঢুঁ মেরে আসি। ঠিক কোথায় যেন বাড়িটা?'

নিরাপদ মোটামুটি বুঝিয়ে দিল।

টেলিফোন রেখে সে কিন্তু কিন্তু করে হৈমন্তীকে বলল, অম্লান-বাবুর সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। খুব বড় অফিসার।'

'কোথাকার।'

www.boiRboi.blogspot.com

'রেলের বোধহয়।'

'বোধহয় মানে? উনি বলেন নি?'

নিরাপদ অস্বস্তিতে পড়ল, 'সেই রকম মনে হল।'

'আশ্চর্য! একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হল, টেলিফোন নাম্বার দিলে অথচ সে কোথায় কাজ করে জানলে না! কি করে সরকারি চাকরি কর? কি বললেন?'

'এ পাড়ায় এসেছিলেন। তাই ঘুরে যেতে পারেন।'

'এই অন্ধকারে? নিষেধ করলে না?'

'কেউ যদি আসতে চায় নিজে থেকে তো মানা করব কি করে?'

'আমি লোডশেডিং-এর মধ্যে চা-ফা খাওয়াতে পারব না।'

মিনিট দশেক বাদে অম্লান এল। এসেই বলল, 'একি দাদা, অন্ধকারে বসে আছেন?'

নিরাপদ বলল, 'কি করব, উপায় তো নেই।'

উপায় নেই হয় নাকি? আপনার টেলিফোন কোথায়?'

নিরাপদ অবাক হলেও টেলিফোন দেখিয়ে দিল। মোমবাতির আলোয় ডায়াল ঘোরাল অম্লান। নিরাপদ শুনল অম্লান বলছে, 'হেলো চিফ ইঞ্জিনিয়ার আছেন?'

'ও, অম্লান বলছি। আমি এখন তিনশো-বাইশ সার্কুলার রোডে আছি। এখানকার ফ্রেজটা অন করে দিতে বলুন। ধন্যবাদ।'

রিসিভার রেখে দিয়ে অম্লান বলল, 'এই গরমে কোন ভদ্রলোক থাকতে পারে?'

নিরাপদ অবাক। সে একেবারেই হতভম্ব হয়ে গেল যখন এর মিনিটখানেক বাদেই আলো এসে গেল। চার পাশে উল্লাস শোনা গেল। ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে হৈমন্তী সমস্ত ব্যাপারটা শুনল! আলো জ্বলতে সেও অবাক। নিরাপদ না জিজ্ঞাসা করে পারল না, 'ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাইতে আপনার চেনাজানা আছে বুঝি?'

'ওই একটু আধটু।' অম্লান বসল। এই সময় অদিতি ছুটে এসে জানাল একমাত্র তাদের বাড়ি এবং রাস্তায় এপাশের কয়েকটিতে আলো এসেছে। উল্টোদিকটায় এখনও লোডশেডিং। অম্লান অদিতিকে দেখছিল। হেসে বলল, 'যাতে তোমাদের এই বাড়িতে কখনও লোড-শেডিং না হয় সেই ব্যবস্থা করবো?'

www.boiRboi.blogspot.com

'আপনি পারবেন ? অসম্ভব।'

'দেখি।' রহস্যের হাসি হাসল অম্লান।

নিরাপদ স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে অম্লানের আলাপ করিয়ে দিল। অম্লান খুবই ভদ্রভাবে কথা বলল। অদিতি টিভি খুলেছিল। ছবি এখনও কাঁপছে। দুবছরের টিভি, মিস্ত্রি দেখিয়েও ঠিক হচ্ছে না। অম্লান বলল, 'এই টিভি দেখবেন না দাদা, চোখ খারাপ হয়ে যাবে।'

হৈমন্তী বলল, 'কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না গ্যারান্টি পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ার পর কয়েকবার মিস্ত্রি দেখালাম, যখন করে দিয়ে যায় তখন ঠিক থাকে তারপর থেকে সেই। আর একটা যে কালার টিভি কিনব তা তো উপায় নেই। যা দাম।

'আহা কিনবেন কেন বউদি। দুবছর তো বেশীদিন নয়। কোম্পানিকে লিখছেন না কেন ? ঠিক আছে, টিভি কেনার রসিদটা আছে ? অম্লান জিজ্ঞাসা করল।'

রসিদ পাওয়া গেল। সে সেটা পকেটে রেখে বলল, 'এটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। দেখি কি করা যায়।

অনেকক্ষণ গল্প করে চা খেয়ে চলে গেল সে। এর মধ্যে হৈমন্তী জানতে পেরেছে বিয়ে থা করার সুযোগ হয়নি এখনও ওর। টালিগঞ্জে বাড়ি। বাড়িতে মা আছে। সরকারি চাকরি করে। কিন্তু কোন ডিপার্টমেণ্ট তা বের করতে পারে নি হৈমন্তী। অম্লান বলেছে, 'বউদি মাপ করবেন, এটা বলতে অসুবিধে আছে।'

তাজ্জব ব্যাপার। সেদিনের পর আর লোডশেডিং হচ্ছে না। এ বাড়িতে প্রতিবেশীরা এতে অবাক। ঈর্ষান্বিত অনেকেই ! হৈমন্তী বলল, 'সত্যি ভদ্রলোক খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল।'

হৈমন্তীর ভাই এসেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন করে। বলল, 'সত্যি দিদি, এই কারণে তোমরা এত সহজে টুপি পরো।'

হৈমন্তী চটে গেল, 'আজে বাজে কথা বলিস না।'

ভাই বোঝাল, 'ধরো, আমার সঙ্গে খুব জানপয়চান আছে ইলেকট্রিসিটির ইঞ্জিনিয়ারের। এপাড়া এসে জানলাম তোমার বাড়িতে লোডশেডিং। সঙ্গে সঙ্গে ফোনে তাকে অনুরোধটা করলাম। তারপর তোমার বাড়িতে এসে যেন প্রথম লোডশেডিং দেখছি এমন অভিনয় করে লোকটাকে দ্বিতীয়বার ফোন করলাম। ব্যাস, আলো এসে গেল। আর

www.boiRboi.blogspot.com

তুমি ভাবলে, বাপস, লোকটার কি ক্ষমতা।'

হৈমন্তী এতটা বোঝেনি। এবার বুঝে বলল, 'যাক বাবা, আমাদের তো আর লোডশেডিং হচ্ছে না, সেইটেই উপকার।'

কিন্তু দিন তিনেক বাদে টিভি কোম্পানি থেকে টেলিফোন এল। তাঁরা পুরোন টিভি ফিরিয়ে নিয়ে নতুন সেট দিয়ে দিতে চান। আজ বিকেলে তাঁদের লোক সেটা পৌঁছে দেবে। হৈমন্তী হতভম্ব। গ্যারান্টি কার্ডে এক বছর সময়সীমা ছিল তবু এটা সম্ভব হল কি করে? সে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করল নিরাপদকে। নিরাপদ ছুটে এল বাড়িতে। কোম্পানির লোক বিকেলবেলায় এসে পুরোন সেট নিয়ে গেল নতুন সেট বসিয়ে। তারা জানাল ওপর-তলার হুকুমে কাজটা করা হচ্ছে। নতুন সেট অনেক বেশী আধুনিক এবং দামের তফাৎ তিন হাজার টাকা।

হৈমন্তী বলল, নাঃ, ক্ষমতা আছে বটে অম্লানের। তবে গায়ে পড়ে এত উপকার করছে, এটা আমার ভাল লাগছে না।'

নিরাপদ বলল, 'তুমি বড্ড সন্দেহবাতিক।'

'হয়তো। কিন্তু আমার মন সায় দিচ্ছে না।'

তাহলেও আত্মীয়স্বজনরা ব্যাপারটা জানল। অনেকেই অম্লানের সঙ্গে আলাপ করতে চায়। হৈমন্তী ঠেকিয়ে রাখে। দিন দশেক বাদে ছুটির দশ মিনিট আগে নিরাপদ দেখল তার সামনে অম্লান, 'এদিকে এসেছিলাম ভাবলাম দাদাকে নিশ্চয়ই অফিসে পেয়ে যাব।'

নিরাপদ টিভিটার জন্যে তাকে অনেক ধন্যবাদ দিল।

অম্লান বলল, 'এ কিছু নয়। আসলে আমরা অনেকেই নিয়ম জানি না। কোন কোম্পানি চাইবে না বিক্রির দুই বছরের মধ্যে তাদের জিনিষ খারাপ এটা বাজারের চালু হোক। নিজেদের মান বাঁচাতে ওরা পাল্টে দেবে।'

নিরাপদ অম্লানের সঙ্গে বের হল। সামনের গাড়িতে তাকে নিয়ে উঠল অম্লান। গাড়ির ওপর লাল আলো। ড্রাইভার নেই। অম্লানই চালান। ডালহৌসী এলাকায় অত স্পীডে গাড়ি চালাতে কাউকে দ্যাখেনি নিরাপদ। মাথার ওপর লাল আলো থাকায় মোড় পার হবার সময় সেপাইরা সেলাম ঠুকছে।

নিরাপদ বাকশক্তি রহিত। নিরাপদ কোনমতে অনুরোধ করল আস্তে চালাতে। অম্লান হাসল, 'আস্তে চালাতে কোন মজা নেই দাদা।'

www.BanglaBook.org

'কিন্তু আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।' আর্তনাদ করল নিরাপদ।

গাড়ির গতি কমাল অম্লান। নিরাপদ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার গাড়িতে লাল আলো কেন হে? শুনেছি মন্ত্রীমশাই, জাজ ছাড়া লাল আলো কোন সাধারণ নাগরিক জ্বালাতে পারে না।'

অম্লান গম্ভীর হল, 'তাহলে আমাকে অসাধারণ নাগরিক মনে করুন।'

বাড়িতে পৌঁছে দিল অম্লান। নিরাপদ তাকে নিমন্ত্রন করল চা খেয়ে যেতে। ওপরে এল ওরা। অদিতি দরজা খুলল। অম্লান তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ? লোডশেডিং-এর কষ্টটা নেই তো?'

অদিতি হাসল, 'না নেই। থ্যাঙ্কস। সে ভেতরে চলে গেল।

নিরাপদ দেখল ওর চলে যাওয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে অম্লান। সেই সময় হৈমন্তী ভেতর থেকে আসছিল। অম্লানের বিহ্বল দৃষ্টি দেখে সেও লজ্জা পেল। জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

সম্বিত এল যেন, অম্লান বলল, 'কিছু না। কেমন আছেন?'

'ভাল। হৈমন্তী স্বামীর দিকে তাকাল, 'সর্বনাশটা হল।'

'কি ব্যাপার?' নিরাপদ জিজ্ঞাসা করল।

'গ্যাস ফুরিয়ে গিয়েছে। দোকানে গিয়েছিলাম। বলল, দিন দশেক লাগবে।'

হৈমন্তী চিন্তিত, 'আগামী পরশু মেয়ের জন্মদিন। সবাইকে আসতে বলেছি, কি হবে।'

অম্লান জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের ডাবল সিলিণ্ডার নেই?'

নিরাপদ জবাব দিল, 'ডাবল সিলিণ্ডারেই এই দশা।

অম্লান মাথা নাড়ল, 'এটা কোন প্রব্লেমই নয়।'

হৈমন্তী রেগে গেল, 'প্রব্লেম নয় মানে? কেরাসিন পাওয়া যায় বাজারে?'

'যায়। দাম বেশী দিতে হয়। কিন্তু বউদি, চিন্তা করবেন না, আপনি গ্যাসই পাবেন। কাল সকালে আপনাকে টেলিফোনে জানিয়ে দেব।'

অম্লানের কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল নিরাপদর। যে ইলেকট্রিক এনে দিতে পারে, টিভি সেট পাল্টাতে পারে সে হয়তো গ্যাসও

www.boiRboi.blogspot.com

পারবে। একটু বাদে নিরাপদর শ্যালক অবিনাশ এল। তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হল অম্লানের। অবিনাশ ট্রেড ইউনিয়ন করা মানুষ। সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি চাকরি করেন মশাই।'

অম্লান হাসল, 'আমি যে চাকরি করি সেটা সাধারণকে বলা যাবে না।'

'কেন ?'

'নিষেধ আছে।'

'আপনার বাড়ির ঠিকানা ?'

'টালিগঞ্জে থাকি, এটুকু জানলেই চলে না ?'

'না। চলে না, আপনি কেমন লোক মশাই ? হুট করে ট্রেনের আলাপ সম্বল করে ভদ্রলোকের বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছেন অথচ নিজের পরিচয় কাউকে জানাচ্ছেন না ? এটা কোন ভদ্রতা ?'

নিরাপদ শালাকে সামলালো, 'আহা, নিশ্চয়ই ওঁর অসুবিধা আছে।'

'অসুবিধে না ধান্দাবাজি। আপনাকে ফাঁসাবে এই লোকটা।'

অম্লান হাসল, আপনি আমাকে অপমান করছেন। এখানে এখন আপনি আমাকে যা ইচ্ছে করতে পারেন, গায়ের জোরে আমি পারব না। কিন্তু এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আপনাকে কোন কারণ না দেখিয়ে কয়েকমাস জেলের ভাত খাওয়াতে পারি। আচ্ছা বউদি, বলুন তো, আমি কি আপনার কোন ক্ষতি করেছি ?'

'তা নয়।' আমতা আমতা করল হৈমন্তী।

'আপনার খুব ক্ষমতা, না ?' অবিনাশ তেজী গলায় বলল।

'খুব না, সামান্য।'

'আমি একটা ফ্ল্যাট বুক করেছিলাম গড়িয়ায়। নাইনটি পার্সেন্ট টাকা জমা দেওয়া হয়ে গিয়েছে কিন্তু প্রমোটার এখন এক্সট্রা এক লাখ চাইছে। এটা সমস্ত রীতিনীতি ভদ্রতার বাইরে। প্রমোটার এখন বেশী দাম পাচ্ছেন বাইরে থেকে। বলছেন হয় আমাকে এক্সট্রা টাকাটা দিতে হবে নয় উনি আমার জমা দেওয়া টাকা ফেরত দিয়ে দেবেন। কেস করে কোন লাভ হবে না। কারণ সবাই জানে প্রমোটার ফ্ল্যাট একেবারে সাদা টাকায় বিক্রি করে না। কিছু উপায় হতে পারে ?'

অম্লান নিরাপদর দিকে তাকাল, 'দাদা, আপনি কি চান কিছু হোক ?'

www.boiRboi.blogspot.com

নিরাপদ নিজের মাথায় হাত বোলালো, 'হওয়া খুব শক্ত। এক, পাড়ার ছেলেরা যদি লোকটাকে চাপ দেয় তাহলে—।'

অবিনাশ মাথা নাড়ল, 'সেটা আর সম্ভব নয়। লোকটা ওদের হাত করে ফেলেছে।'

অম্লান আবার হৈমন্তীকে জিজ্ঞাসা করল, 'বউদি আপনি কি চান?'

হৈমন্তী একটু গদগদ গলায় বলল, দেখুন না, চেষ্টা করে।

অম্লান অবিনাশের কাছে ঠিকানা, প্রমোটারের নাম ধাম চাইল। তারপর আগামীকাল কিছু করা যাবে বলে চলে গেল। অদিতি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিল, দেখল লাল আলো লাগানো গাড়িতে ওঠার আগে অম্লান ওপর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল।

পরদিন দুপুরে অফিসে অবিনাশের ফোন পেল নিরাপদ। সে খুব উত্তেজিত হয়ে বলল তাকে থানা থেকে ডেকে পাঠিয়েছে আজ বিকেল পাঁচটায় ফ্ল্যাট নিয়ে কথা বলার জন্যে। প্রমোটার বোধহয় থানাকেও ম্যানেজ করছে। জামাইবাবু যদি সঙ্গে আসেন তাহলে সে সাহস পায়। নিরাপদ স্ত্রীর ভাই-এর দুর্দিনে সঙ্গী হল।

দারোগার সামনে বসেছিলেন প্রমোটার এবং এক ভদ্রলোক। অবিনাশ নিজের পরিচয় দেওয়া মাত্র দারোগা তাকে বসতে বললেন। প্রাথমিক আলোচনার পর প্রমোটার যখন জিনিসপত্রের বাজারদর বেড়ে যাওয়ার গল্প শোনাচ্ছে তখন দারোগা স্পষ্ট বলে দিলেন 'মাসখানেকের মধ্যে যদি আপনি অবিনাশবাবুর হাতে ফ্ল্যাটের চাবি না তুলে দেন তাহলে ভীষণ বিপদে পড়বেন। আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবেন না।'

প্রমোটার ভদ্রলোক প্রতিবাদ করতে চাইলেন কিন্তু দারোগা কোন কথা শুনতে চাইলেন না। এবার প্রমোটার প্রস্তাব দিলেন একটু আলাদা করে তার সঙ্গে বসে কথা শুনতে। দারোগা সেটাকেও নাকচ করলেন। এবার প্রমোটারের সঙ্গী ভদ্রলোক কথা বললেন বেশ গম্ভীর গলায়। দারোগা শুনলেন। হেসে বললেন, 'অজিতবাবু, পলিটিক্যাল প্রেসার দিয়ে কোন লাভ হবে না। অর্ডারটা এসেছে এত ওপরতলা থেকে যেখানে আপনারাও পৌঁছাতে পারবেন না। এর পরে প্রমোটার দারোগাকে লিখিতভাবে জানালো যে তিনি এক মাসের মধ্যে ফ্ল্যাটের চাবি অবিনাশকে দিয়ে দেবেন।

নিরাপদ তো বটেই অবিনাশেরও মাথা খারাপ হয়ে গেল। এ সবই

www.boiRboi.blogspot.com

অম্লানের জন্যে হয়েছে বুঝতে অসুবিধে হল না। লোডশেডিং দূর করা বা টিভি সেট পাল্টানো খুব দারুণ ব্যাপার নয় কিন্তু ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়া ?

নিরাপদ বাড়িতে ফিরে শুনল হৈমন্তী বেরিয়ে গিয়েছে।

অদিতি বলল, দুপুরে অম্লানকাকু ফোন করেছিল। ভবানীপুরের এক গ্যাস ডিলারের কাছে গিয়ে নিরাপদর নাম বললেই নাকি সিলিণ্ডার পাওয়া যাবে। নিরাপদ হতভম্ব। সেই দোকানে তাদের নাম লিস্টে নেই।

বললেই দেওয়া যায় নাকি ? কিন্তু হৈমন্তী ফিরে এল একটি কুলি-গোছের লোকের সঙ্গে যার হাতে সিলিণ্ডার। পুরোনটা নিয়ে নতুনটা দিয়ে সে চলে যাওয়া মাত্র হৈমন্তী যেন সাতমুখে কথা বলে উঠল, 'তুমি জানো অম্লান কে ?'

'কে ?' ফ্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞাসা করল নিরাপদ।

'ডেপুটি গভর্ণর অফ ওয়েস্টবেঙ্গল। ভাবতে পারো ?'

'যাঃ।'

'হ্যাঁ গো। আমি সেই ডিলারের কাছে গিয়েছিলাম। তোমার নাম শুনে উনি একটি চিরকুট বের করলেন। ওদের ওপরতলায় এক সাহেব লিখেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের ডেপুটি গভর্ণরের ইচ্ছা অনুযায়ী তোমাকে যেন একটা গ্যাসের সিলিণ্ডার এখনই দিয়ে দেওয়া হয়।' হৈমন্তী বসে পড়ল।

'ডেপুটি গভর্ণর ? এরকম পোস্ট তো পশ্চিমবাংলায় আছে বলে শুনিনি।'

'আমি নিজের চোখে দেখে এলাম।'

নিরাপদ বিড় বিড় করল, 'একবার অজয়বাবুর আমলে ডেপুটি চিফ মিনিস্টার পোস্ট তৈরী হয়েছিল, ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট মাঝে মাঝে হয় কিন্তু ডেপুটি গভর্ণর ?' সে উঠে টেলিফোন গাইড দেখে রাজভবনে ফোন করল। রাজভবন জানাল অম্লান মিত্র নামে কাউকে তারা চেনে না। নিরাপদ পরিচিতজনের ফোন করল। সবাই হাসাহাসি করল ডেপুটি গভর্ণর নামে কোন পোস্ট আছে শুনে। অথচ হৈমন্তী জোর দিয়ে বলছে সে ওই শব্দ দুটো কাগজে দেখেছে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় জনাদশেক আত্মীয়স্বজন এল এ বাড়িতে

www.boiRboi.com

অদিতির জন্মদিন উপলক্ষ্যে। হৈচৈ হচ্ছে। অবিনাশের ছোটভাই বিকাশ থাকে বিরাটিতে। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে রাত করতে চাইল না। সে যখন আটটা নাগাদ বের হচ্ছে তখন অম্লান এল লাল আলো জ্বালানো গাড়ি চালিয়ে। এসে বলল, 'দাদা, অদিতির জন্মদিনে আমাকেই বাদ দিলেন? তবু অযাচিতের মত এসে পড়লাম।'

অবিনাশ তাকে দেখে খুব খুশী। হৈমন্তীও। সে বলল, 'আপনার ঠিকানা জানা ছিল না বলে নেমন্তন্ন করতে পারিনি। খুব খুশী হয়েছি এসেছেন বলে।' তার সঙ্গে বিকাশেরও আলাপ করিয়ে দেওয়া হল।

বিকাশ চলে যাচ্ছে শুনে ব্যস্ত হল অম্লান, 'সেকি এখন তো সবে সন্ধ্যে, এখনই চলে যাচ্ছেন কেন?'

বিকাশ বলল, 'ফ্ল্যাটে তালাচাবি দিয়ে এসেছি। খুব চুরি হচ্ছে এখন ওপাড়ায়। তাই বেশী রাত করতে চাই না।'

'এটা কোন প্রব্লেম নয়। ঠিকানাটা বলুন।'

ঠিকানা শুনে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিচু গলায় কিছু বলে এসে অম্লান হাসল, 'নিন, আড্ডা মারুন। দশটা নাগাদ উঠবো।'

'কিন্তু—।' বিকাশ আপত্তি করতে যাচ্ছিল।

অবিনাশ বলল, 'আর কিন্তু করিস না। অম্লানবাবু যখন বলছেন তখন মন ঠিক করে আড্ডা মার! কোন ভয় নেই।'

হঠাৎ অম্লান নিরাপদকে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, আপনার জমি কেনা আছে?

'জমি? না। ওসব আর হয়ে উঠল না।'

হৈমন্তী বলে উঠল, 'একদম বিষয়ী মানুষ নয়। এর ভাড়ার ফ্ল্যাটেই সারাজীবন পচতে হবে।'

অম্লান হাসল, 'তা কেন? আপনি সল্টলেকে পাঁচ কাঠা জমি নিন। স্টেডিয়ামের ঠিক পেছনে। খুব ভাল জায়গা। নেবেন?'

নিরাপদ কিছু বলার আগে অবিনাশ চেঁচিয়ে উঠল, 'সল্টলেকে? ওরে ব্বাস। ওখানে এখন তিনলাখ করে কাঠা।'

নিরাপদ বলল, 'আমাকে বিক্রী করলেও পাওয়া যাবে না।'

অম্লান হাসল, 'তিন লাখ তো ব্ল্যাক। বারো হাজার করে কাঠা পাবেন। নিয়ে নিন দাদা। ষাট হাজার দিয়ে জমিটা কিনে ফেলুন।

www.boiRboi.blogspot.com

ওটাই আইনসম্মত দাম। পরে বাড়ি করতে ইচ্ছে না হলে না হয় বিক্রী করে দেবেন।'

অবিনাশ উল্লাসিত, 'নিয়ে নিন জামাইবাবু। বাড়ি না করলে চৌদ্দ লাখ চল্লিশ হাজার এখনই প্রফিট। এত লাভ ভাবা যায় না। জমি এখন সোনা।'

অম্লান বলল, ভেবে দেখুন। যদি চান তাহলে একটা চেষ্টা হতে পারে।'

নিরাপদ বলল, 'ভেবে দেখি।'

হঠাৎ অম্লানের যেন মনে পড়ল এমন ভঙ্গীতে সে উঠে অদিতির সামনে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে ছোট প্যাকেট বের করে ওর হাতে দিয়ে বলল, 'হ্যাপি বার্থ-ডে টু ইউ।' অদিতি বলল, 'থ্যাঙ্কু।'

বিকাশরা চলে গেল নটা নাগাদ। দেখে বোঝা যাচ্ছিল স্বস্তিতে নেই। নিরাপদই যেতে বলল তাকে। খাওয়া দাওয়া হৈচৈ করতে করতে এদের দশটা বেজে গেল।

এক ফাঁকে অম্লান নিরাপদকে বলল, 'দাদা আপনারা সবাই ভাবছেন আমি কে অথচ আমি সেটা জানাতে পারছি না। খুব খারাপ লাগে। এবার আমার সঙ্গে আপনাদের দেখা আর ঘনঘন হবে না।'

'সেকি, কেন?' নিরাপদ অবাক।

'আমাকে মাদ্রাজে বদলি করা হয়েছে। এখনও কিছু দেরি আছে যাওয়ার।'

মন খারাপ হয়ে গেল নিরাপদর। লোকটার পরিচয় অস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ওর ব্যবহার তার খুব ভাল লাগে। তাছাড়া অযাচিত উপকার গুলোর কথা ধরলে—! সে বলল, 'আমরা আপনার কাছে শুধু উপকার নিয়ে গেলাম, বদলে কিছুই করলাম না।'

'ছি ছি। আপনি একথা বলেছেন কেন? আমি যা যা করেছি ভালবেসে করেছি। সবাইকে কি খুশী করা যায়? আমরা মাকেই খুশী করতে পারলাম না।'

'কেন?'

'মা চান আমি বিয়ে করি, সংসারী হই।'

'এতে অসুবিধে কোথায়?'

'মেয়ে কোথায়? তেমন মেয়ে না পেলে বিয়ে করে কি লাভ?'

www.boiRboi.blogspot.com

'কি রকম মেয়ে আপনার পছন্দ?' সরল গলায় জানতে চাইল নিরাপদ।

এইসময় হৈমন্তী পাশে এসে দাঁড়াল। তার কানেও গেছে শেষ প্রশ্নটা। অম্লান হাসল, 'বউদি যদি রাগ না করেন তাহলে বলতে পারি।'

হৈমন্তী হাসল, 'বাঃ, রাগ করব কেন?'

'তাহলে বলি। ঠিক আপনার মত মেয়ে পেলে বিয়ে করতে পারি।'

হৈমন্তী লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করল। নিরাপদ হেসে উঠল। আর তখনই টেলিফোন বাজল। নিরাপদ এগিয়ে গেল সেটা ধরতে। হৈমন্তী বলল, 'আপনি খুব ফাজিল।'

'সত্যি কথা বলেছি বউদি।'

'আমার মত মেয়ের কি অভাব বাংলাদেশে?'

'খুঁজে দিন। আপনাকেই দায়িত্ব দিলাম।'

এইসময় অদিতি এসে দাঁড়াল পাশে, 'মা, দ্যাখো!'

হৈমন্তী দেখল। একটি দামী হাতঘড়ি। সে বলল, 'একি, এত দামী জিনিষ কেন আনলেন?'

'অপরাধ হয়ে গেছে?'

হৈমন্তী জবাব দিতে পারল না। হঠাৎ তার মনে সন্দেহটা এল। অম্লান কি অদিতির জন্যে এসব করছে? তার মতই তো দেখতে অদিতি। প্রথমদিন যেভাবে তাকিয়েছিল মেয়ের দিকে, গাড়িতে ওঠার আগে হাত নাড়া, দামী ঘড়ি উপযাজক হয়ে এসে উপহার দেওয়া—এসব কি তারই ইঙ্গিত? অসম্ভব। এই দুজনের বয়সের পার্থক্য অন্তত আঠারো বছরের। ডাবল বয়সী লোকের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে পারে না হৈমন্তী। আর অদিতি কিছুতেই রাজী হবে না তাতে। ওর বন্ধুর দাদারাই পাত্তা পাচ্ছে না।

নিরাপদ ফিরে এল টেলিফোন রেখে, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'কেন?' হাসল অম্লান।

বিকাশ ফোন করেছিল। ও ট্যাক্সি থেকে নেমে দ্যাখে একটা পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে ওদের ফ্ল্যাটের সামনে। ওর পরিচয় পেয়ে তারা জানায় যে অর্ডার পেয়ে এসেছিল ফ্ল্যাট পাহারা দিতে। কোন বিপদ হয়নি। বিকাশ এসে যাওয়ায় ওরা চলে গেছে। বিকাশ আপনাকে ধন্যবাদ দিতে বলেছে।'

www.boiRboi.blogspot.com

অবিনাশ ছিল। সে বলল, 'অম্লানবাবু, আপনি কে মশাই? আরব্যরজনীর আলাদীনের প্রদীপের দৈত্যের গল্প শুনেছি, এ যে তার মত ব্যাপার।'

অম্লান হাসল, 'প্রদীপের দৈত্য কিনা জানি না তবে এসব করলে দেখেছি একসময় যাদের জন্য করছি তাদের কাছে ভীতিকর দৈত্য হয়ে যাই।' তারপর ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এত পারেন আর এটুকু পারেন না?'

অম্লান হাসল, 'এখানে আমার সঙ্গে প্রদীপের দৈত্যের মিল আছে। পার্থিব জিনিষ আমরা এনে দিতে পারি। কিন্তু দয়ামায়া ভালবাসা পারি না। আপনি তা পারেন।'

'অসম্ভব। আপনার কথা আমি যেটুকু বুঝেছি তাতে কিছুতেই মত দিতে পারছি না।'

'জানতাম।' অম্লান মাথা নাড়ল। তারপর নিরাপদকে বলল, 'চলি দাদা।'

রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে হৈমন্তী তার সন্দেহের কথাটা নিরাপদকে জানাল। নিরাপদ চমকে উঠল। অসম্ভব। অদিতি ওর হাঁটুর বয়সী। হৈমন্তী বলল, লোকটা এই মতলবে এসেছিল।'

নিরাপদ অবশ্য একমত হল না। ট্রেনে অদিতির কথা ও জানত না।

দুদিন পরে লোডশেডিং হলে, গ্যাস ফুরিয়ে গেলে, জমি কেনার কথা মনে হলে হৈমন্তী নিরাপদর খুব কষ্ট হত। তাদের মনে হত অদিতিকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। এখন সেটা করে কোন লাভ নেই। অম্লান সম্ভবত মাদ্রাজে চলে গিয়েছে। হয়তো সেখানে কোন দাদা বউদি পেয়ে তাদের উপকার করছে। হৈমন্তী সেটা ভেবে ঈর্ষান্বিত হয়।

www.boiRboi.blogspot.com

দুই মলাটের গল্প

বাঙালিরা বিদেশে বেড়াতে গেলে যাঁদের সঙ্গে জানপয়চান হয় তাঁদের অধিকাংশই বাঙালি, কিন্তু ভারতের অন্য প্রদেশের মানুষ থাকতে কিন্তু যেদেশে বেড়াতে গেছেন সেই দেশের মানুষের সঙ্গে হৃদ্যতা হচ্ছে এমন ঘটনা খুব একটা দেখা যায় না। এর অনেকগুলো কারণের প্রধান হল পরিচিত কোন বঙ্গসন্তানের বাড়িতে উঠে তাঁরই সাহায্যে দেশ দেখা। প্রধানত বড় শহরের মানুষেরা নিজেদের একটু গুটিয়ে রাখেন। সেক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য স্থান দেখতেই বেড়ানোর সময় চলে যায়।

এই লেখকের পায়ের তলায় যখন সরষে জমল তখন একদিন সে হাজির হয়েছিল লণ্ডন থেকে অনেক দূরে বোস্টন নামের এক গ্রামে। সেই গ্রামের একটি বর্দ্ধিষ্ণু হোটেলের মালিক আমাদের বঙ্গসন্তান পাল। মোগলাই রান্না তার রেস্টুরেণ্টের বৈশিষ্ট্য। বোস্টনে দ্বিতীয় কোন বাঙালি ছিল না। ভারতীয় খুব কম। সাহেব মেমরা দলবেঁধে প্রতি রাত্রে সেই রেস্টুরেণ্টে ভারতীয় খাবার খেতে আসত। কে বলে ঝাল অথবা মশলা সাহেবরা পছন্দ করে না। আমি তো তাদের চিকেন চাপ চেটেপুটে খেতে দেখেছি। পাল ছিল তখন একা। আমি ওর অতিথি। গ্রামটি ছোট। আমাদের কালিম্পং শহরের মত। নামেই গ্রাম। কিছুদিন থাকলেই সবার চেনাজানা হয়ে যায়। পালের রেস্টুরেণ্ট দিনের বেলায় বন্ধ থাকত। কারণ তখন কারো খাওয়ার সময় নেই। সোম থেকে বৃহস্পতি সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত বারোটা আর শুক্র শনিবার ভোর তিনটে পর্যন্ত রেস্টুরেণ্ট গমগম করত। দিনের বেলায় আমি ঘুরে বেড়াতাম পাবে পাবে, কফিখানায়। এইরকম এক রাত্রে পালের রেস্টুরেণ্টে আমার সঙ্গে আলাপ সাইমনের।

পালের রেস্টুরেণ্টে একজন ডোরকিপার থাকত। ব্যায়াম করা চেহারা। কোন খদ্দের ঝামেলা করলে সে হাত চালাত। আমার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল লোকটার। এক সন্ধ্যায় সে আমাকে বলল, 'সাইমনের সঙ্গে আলাপ হয়নি?'

'কে সাইমন?'

www.boiRboi.blogspot.com

‘ওই যে কোণের দিকে বসে আছে সুন্দরীকে নিয়ে।’

দেখলাম। ব্রিটিশ মহিলা সুন্দরী হলে সেটা সত্যি চোখে টানে? জিজ্ঞাসা করলাম, ‘লোকটার বিশেষত্ব কি। বউকে নিয়ে নিশ্চয়ই খেতে এসেছে।’

‘বউ? ওর বউকে দেখলে তুমি ভিরমি খাবে। বিশাল চেহারা। ও রোজ এখানে আসে। ছয়দিন ছয় সুন্দরীকে নিয়ে। পালকে বলো, আলাপ করিয়ে দেবে।’

রেস্টুরেণ্টটা এত বড় যে সব খদ্দেরকে রোজ দেখা মুস্কিল। ভদ্রলোক আমায় আকর্ষণ করলেন। প্রতি সন্ধ্যায় একজন সুন্দরী ওঁকে ডিনার খেতে সঙ্গ দেন, ভাবাই যায় না। দূর থেকে দেখলাম মানুষটির বয়স চল্লিশের নিচে নয়। অর্থাৎ যুবক বলা চলে না।

পালকে বলতেই সে জানাল, ‘সাইমন খুব দুঃখী। দুঃখী বলেই খুব হাসে।’

বললাম, ‘দুঃখী মানুষ অত সুন্দরী পেয়ে দুঃখ ভুলে যাচ্ছে না কেন?’

পাল বলল, ‘দুঃখ ক্যানসারের মত। কোন ওষুধেই সারে না। আসুন, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। কথা বললে ভাল লাগবে।’

সাইমনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে পাল ফিরে গেল কাউণ্টারে। লোকটা পরিচয় জেনে হৈ হৈ করে উঠল, ‘আরে আপনি গল্প লেখেন, বাঃ। এই প্রথম আমি কোন লেখককে দেখলাম। বসুন বসুন। লিজা, একটু সরে বসো, ওকে বসতে দাও।’

সুন্দরী হাসিমুখে সরলেন। বসলাম। সাইমন বলল, ‘ভারত বলতে আমি জানি ইন্দিরা আর তাজমহল। ইন্দিরা খুব সুন্দরী ছিলেন, তাই না?’

‘হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।’

হঠাৎ লিজা ঘাড় বেঁকালেন, ‘আমার চেয়েও?’

হকচকিয়ে গেলাম, বললাম, ‘ওঁর বয়স হয়েছিল। তুলনা করা ঠিক হবে না।’

আমার কত বয়স বলে মনে হচ্ছে?’

কোন মহিলা, বিশেষ করে সুন্দরী মহিলার বয়স অনুমান করা বোকামি। সাইমন আমাকে উৎসাহিত করছিল অনুমানটা বলার জন্যে।

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু কিন্তু করে বললাম, 'তিরিশ।'

তিনি হেসে উঠলেন এমন জোরে যে সবাই আমাদের দিকে ঘুরে তাকাল। লিজা কোনরকমে হাসি সামলে বললেন, 'আমি পঞ্চাশে দাঁড়িয়ে আছি। আমার বড়মেয়ের বয়স এখন আপনি যা বললেন তাই।

চমকে গেলাম। ভদ্রমহিলার চোখ মুখ, গলার চামড়ায় বয়স একটুও আঁচড় টানেনি। হেসে বললাম, 'আপনারা দুজনেই সমান সুন্দরী।'

প্রশংসা শুনলে কে না খুশী হয়। ইনিও হলেন। টুকটাক গল্প চলছিল। আমি ইচ্ছে করেই বললাম, 'সাইমন, আপনার স্ত্রী কিন্তু খুব সোজা কথা বলেন।'

লিজা হেসে উঠলেন। সাইমন মাথা নাড়লেন।

'না ভাই। লিজা আমার স্ত্রী হবে কেন? ওর স্বামী একটা গম্ভীর-মুখো ব্যবসায়ী। এর কোন বন্ধু নেই। তাই আমি সঙ্গ দিচ্ছি। তা আপনি ইচ্ছে করলে লিজার বন্ধু হতে পারেন। আমার আপত্তি নেই। লিজা আজ তো তোমার স্বামী লণ্ডনে, নতুন বন্ধুকে নিয়ে যাবে নাকি?'

লিজা মাথা নাড়লেন, 'আগে আমি জিজ্ঞাসা করব ওঁর কজন বান্ধবী আছে?'

মজা লাগছিল, বললাম, 'খুবই দুর্ভাগ্য, একজনও নেই।'

লিজা বললেন, 'তাহলে দুঃখিত। আপনার নিশ্চয়ই কোন গলতি আছে।'

আমরা তিনজনেই হেসে উঠেছিলাম।

পরের রাত্রে সাইমনের সঙ্গে আবার দেখা। এদিন অন্য সুন্দরী। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, তুমি কি হে? কেন বললে বান্ধবী নেই। লিজার সঙ্গ হারালে!'

'বান্ধবী থাকাটা কি কৃতিত্বের?'

'নিশ্চয়ই। তাহলে তুমি ওকে বেশী বিরক্ত করবে না। বিবাহিতা মেয়েরা চায় না পুরুষ প্রেমিক সবসময় পেছনে ঘুরুক। তাদের তো স্বামী সংসারও দেখতে হয়।'

'আজকে যিনি এসেছেন তিনিও কি তোমার বান্ধবী?'

'হ্যাঁ। এ একটু গম্ভীর প্রকৃতির। স্বামী পুলিশ অফিসার।'

'তোমার সব বান্ধবীই বিবাহিতা?'

www.boiRboi.blogspot.com

'হ্যাঁ ভাই। এতে ঝামেলা কম।'

'তার মানে?'

'বিয়ে কর বিয়ে কর বলে মাথা খারাপ করে না কেউ!'

'তোমার স্ত্রী?'

'দুঃখের কথা কি বলব ভাই, সে আমার বান্ধবী নয়।'

'তিনি এসব জানেন?'

'খু-উ-ব। রাত্রে বাড়ি ফিরলে তিনি খুশী হন এই বলে যতই হোক সে অন্যের বউ, রেস্টুরেণ্টে সঙ্গ দেবে কিন্তু তোমার ঘর করবে না। কি আনন্দ পায় যে কি বলব!'

'বউকে ডিভোর্স করছ না কেন?'

'আর একজন বউ হতে না চাইলে কেউ পাকা বউকে হাতছাড়া করে? এই বয়সে কোন কচি অবিবাহিতা আমাকে ঝট করে বিয়ে করতে চাইবে না। এই বোস্টন গ্রামের সব কচি মেয়েই আমার কোন না কোন বান্ধবীর সন্তান। এই দুঃখ আমাকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে ভাই।' সাইমন বলেছিল।

সাইমনের সঙ্গে আমার প্রায় বছর চারেক দেখা হয়নি। অবশ্য এর মধ্যে একবার আমি বোস্টনে গিয়েছিলাম। সাইমন তখন ব্যবসার কাজে বাইরে ছিল। তবে লোকটার কথা খুব মনে হত আমার। পাল বলেছিল লোকটা দুঃখী। কিন্তু কতটা দুঃখী আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু বাড়িতে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সপ্তাহে ছ'দিন বান্ধবী পায় যে মানুষ তার মত ভাগ্যবান আর কে আছে। সাইমনকে মনে পড়ত এই কারণেই।

হঠাৎ কিছুদিন আগে কলকাতার বাড়িতে টেলিফোনে কে বিদেশির গলা পেলাম সে সাইমন। আমি অবাক। পালের কাছ থেকে আমার টেলিফোন নম্বর নিয়ে এসেছে। তাজমহল দেখে কলকাতায় এসেছে। কাল সকালের ফ্লাইটেই চলে যাবে। আজ রাত্রেই দেখা করতে চায়। সদর স্ট্রীটের লিটন হোটেলে উঠেছে।

গেলাম। দেখা হওয়া মাত্র জড়িয়ে ধরল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'একা?'

সাইমন গম্ভীর হয়ে গেল, 'হ্যাঁ, একাই। আমার বউ তো সঙ্গে আসবে না। আর আমার বান্ধবীদের স্বামী আছে, তারা কিভাবে এতদূরে আসবে।'

www.boiRboi.blogspot.com

গল্প হল। হঠাৎ সাইমন বলল, 'তোমার বান্ধবীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।'

সাইমন লিজার ব্যাপারে খুব উদার হয়েছিল, মনে পড়ল। বললাম, 'আমার কোন বান্ধবী নেই। তবে তুমি আমার বাড়িতে যেতে পার ইচ্ছে হলে।'

'না। একটাই তো রাত। তুমি আমাকে নাইট লাইফ দেখাও।'

'কলকাতার নাইট লাইফ কি সোদ্বো অথবা পিগ্যালের নাইট লাইফের সঙ্গে তুলনা করা চলে? পানসে লাগবে তোমার।'

সাইমন মানতে চাইল না। সে এদেশীয় রাতের জীবন দেখবেই। আমি পড়লাম ফাঁপড়ে। অনেক চেষ্টা করেও নিরস্ত্র করা গেল না। বাঈজীদের কথা শুনেছে সে। তাদের গান শুনতে চায়।

অথচ কলকাতার বাঈজী পাড়ায় যাওয়ার রাস্তা আমার জানা নেই। হঠাৎ খেয়াল হল চন্দ্রদার কথা। আমি যখন সরকারি চাকরি করতাম তখন চন্দ্রদার ওসব ব্যাপারে কুখ্যাতি ছিল। লোকটাকে কিন্তু আমার ভাল লাগত। উত্তর কলকাতার বনেদী মানুষ। টেলিফোন ডাইরেক্টরী দেখে ফোন করলাম। সেজদাই ধরলেন। এতদিন পরে আমার গলা পেয়ে খুব খুশী। সমস্যাটা জানালাম ওঁকে। চন্দ্রদা বললেন, দ্যাখো ভাই, বাতের ব্যাথায় পঙ্গু হয়ে আমি বসে আছি। ও পাড়ায় যাই না পাঁচ বছর। তবে বিদেশী এসেছে, দেশের সম্মান বলে তো একটা ব্যাপার আছে। আমি একজনকে ফোন করে দিচ্ছি, তার কাছে চলে যাও। লোকটার নাম লোকেন! আমাকে খুব ভক্তি করে। তবে হ্যাঁ, সাড়ে দশটার মধ্যে পাড়া থেকে বেরিয়ে এসো। দাঁড়াও, ওই সঙ্গে তোমাদের কথা থানায় বলে দিচ্ছি।'

'থানা?' আমি আপত্তি জানালাম।

'কোন চিন্তা নেই। লোক্যাল ওসি তোমার খুব ফ্যান।'

চন্দ্রদা যে ডিরেকশন দিলো সেইমত আমি সাইমনকে নিয়ে সোনাগাছির কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। শ্রদ্ধেয় গায়ক রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে যে কয়েকবার গিয়েছি সেই পথ ধরেই এক বাড়ির সামনে পৌঁছে লোকেনবাবুর নাম বলতে একটা লোক ওপরে নিয়ে গেল। বলেছিলাম বাঈজী পাড়ায় যাব, এ দেখছি একেবারে বারবনিতাদের আস্তানা। দুপাশে রঙ মেখে দাঁড়িয়ে তারা। সাইমন চাপা গলায়

www.boiRboi.blogspot.com

বলল, 'এ কোথায় নিয়ে এলে ? এদের কাছে আমি তো আসতে চাইনি।'

বললাম, 'আমার গাইড ভুল করেছে। চল, দেখা করেই ফিরে যাব।'

যে ঘরের দরজায় আমরা পৌঁছালাম সেটি বেশ বড়। খাটের ওপর বাবু হয়ে বসে আছেন যিনি তিনিই লোকেনবাবু। পাকানো চেহারা। বছর ষাটেকের। এক ফোঁটা মেদমাংস নেই। হাতজোড় করে বললেন, 'আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য, চন্দ্রদার লোক আপনারা, ভাবা যায় না। বসুন বসুন।'

দুটো চেয়ার আছে খাটের পাশে, বসলাম। বললাম, 'দেখুন, চন্দ্রদাকে বলেছিলাম এই সাহেবকে বাঈজীদের গান শোনাব—।'

'সব মরে গেছে। কলকাতায় বাঈ-কালচার আর নেই। কি আফশোষ, আজ আমার ওয়াইফ দেশে গেছে, সে থাকলে—।' লোকেন বললেন।

'আপনার ওয়াইফ ?'

'হ্যাঁ। আমার এইটথ ওয়াইফ।'

ইংরেজি শব্দ দুটো শুনে সাইমন বিস্ময়ে আমার দিকে তাকাল। অবাক আমিও কম নই। লোকেনবাবু বললেন, 'ওর দেশ আগ্রায়। এখন সোনাগাছিতে আগ্রাওয়ালিদের রাজত্ব। আমার ওয়াইফ খুব ভাল গায়। চন্দ্রদা শুনেছেন। কিন্তু বেচারার বাচ্চা হবে তো, চারমাসের মধ্যে কাজে আসতে পারবে না। চার মাসের মধ্যে কাজে আসতে পারবে না বলে দেশে রেখে এসেছি।'

'দেশ কোথায় ?'

'ওই যে বললাম, আগ্রায়।'

'ইনি আপনার অষ্টম স্ত্রী ?'

'স্ত্রী নন মশাই, ওয়াইফ। আমার স্ত্রী একটিই, তিনি গত হয়েছেন বছর দশেক হল। আমি থাকি হেদোর কাছে। পৈতৃক বাড়ি।' লোকেনবাবু জানালেন।

কথাগুলো ইংরেজিতে সাইমনকে বলে দিতে হচ্ছিল। সে বলল, 'ইণ্টারেস্টিং।'

লোকেনবাবু বললেন, 'আরও আছে সাহেব। কুড়ি বছর থেকে এখানে আসছি। তা প্রায় চব্বিশ বছর হয়ে গেল। একদিন এই ঘরের মালিক হয়ে গেলাম। এখন এখানকার সবাই আমাকে মামা কাকা বলে ডাকে। কেউ কেউ বাবাও বলে। সবাই সম্মান করে। একি কম

www.boiRboi.blogspot.com

কথা। এখন দিন খারাপ হয়েছে। সাড়ে দশটার পর পুলিশ হামলা করে।' কিন্তু আমার নাম বললে কাজ হবে। বুঝলেন?'

'আপনি এখানেই থাকেন?'

'মাথা খারাপ। এখানে কেউ রাত কাটায়? রোজ আসি। তবে রাত থাকতে থাকতে ফিরে যাই। নিজস্ব রিক্সা আছে। ভোর আমি এখানে বসে কখনও দেখিনি।'

'আপনার আট ওয়াইফের গল্প বলুন।'

'বলছি। কিন্তু একটু খাওয়া দাওয়া হবে না?'

'না, না। আমরা খেতে আসিনি।'

'তা কি হয়? ওয়াইফ ফিরে এসে শুনলে আমাকে ছাড়বে?'

'সত্যি বলছি, আমরা খাব না।'

'অন্য কোন উদ্দেশ্য?'

'কোন উদ্দেশ্যই নেই।'

'ভাল। যা বলছিলাম, বছর পঁয়ত্রিশ আগে বাঙালি মেয়ের সঙ্গে হাজব্যাণ্ড ওয়াইফ রিলেশন হল কালীঘাটে গিয়ে। সে আমার এই ঘরেই ব্যবসা করত। তবে সেটা ন'টার আগে। আমি আসতাম তারপরে। সে বেঁচেছিল পাঁচ বছর। তারপর এক এক করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মেয়ে আমার ওয়াইফ হয়েছে। এখন তো আগ্রাওয়ালী।'

'বাকি সাতজনও মারা গিয়েছেন?'

'নাঃ। কেউ বিট্রে করেছিল বলে তাড়িয়ে দিয়েছি। কেউ এমনি চলে গেছে।'

'বিট্রে মানে?'

'আমার কথা হল, ব্যবসার জন্যে তুমি যা করার কর, কিন্তু আমি ছাড়া আর কাউকে মন দেবে না। দিলে বিট্রে করা হবে।'

'ও! এদের রোজগারের টাকা—!'

'এরাই ভোগ করেছে। সেই টাকা আমি পায়ের নখ দিয়ে ছুঁইনি কখনও।'

'আপনার স্ত্রী, মানে বিবাহিতা পত্নী জানতেন এসব?'

'বিলক্ষণ। প্রথম দিকে রাগারাগি কান্না চলত। পরে যখন বুঝল আমি কখনই সংসার ত্যাগ করব না তখন চুপ করে গেল আনন্দে।'

লোকেনবাবুই আমাদের ট্যাক্সিতে তুলে দিলেন। হোটেলে ফিরে

www.boiRboi.blogspot.com

সাইমন হঠাৎ আমার হাত জড়িয়ে ধরল, 'তোমাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না।'

'কেন ?'

'অদ্ভুত একটা মানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে।'

'কি রকম ?'

'হঠাৎ মনে হচ্ছিল নিজেকে দেখছি। ওই লোকটির স্ত্রীর সঙ্গে আমার স্ত্রীর কোন পার্থক্য নেই জানো।' সাইমনের গলায় বিষন্ন সুর।

'কিন্তু এই লোকটা খারাপ পাড়ায় মেয়েদের সঙ্গে—।'

'কিন্তু লোকটা তাদের খারাপ ভাবে না। যে সব বউ স্বামীদের ঠকিয়ে রোজ রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করে তাদেরও তো আমরা খারাপ ভাবতে চাই না। তাই না ? কিন্তু যে গলায় লোকটা কথা বলল সেই গলায় কথা আমি এ জীবনে বলতে পারব না। এটাই তফাৎ।' সাইমন থেমে গেল।

সাইমনের কাছে বিদায় নিয়ে ফেরার সময় আমার না দেখা সেই দুই মহিলার কথা মনে পড়ছিল। একজন সাইমনের স্ত্রী অন্যজন লোকেন-বাবুর। দুই গোলার্ধের এই দুটি মানুষ যদি পরস্পরের দেখা পেতেন তাহলে কি বান্ধবী হতে পারতেন ?

www.boiRboi.blogspot.com

মৃত্যুদণ্ড চাই

কাল রাত্রেই সর্দি হয়েছিল, সেই সঙ্গে জ্বরো ভাব। মা তখনই একটা ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়েছেন। সকালে বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। বাবা এবং মা আর তামা এ-সময় যন্ত্রের মতো দ্রুত তৈরি হয়। বাবা এবং মায়ের অফিস, আর তামার স্কুল। বাড়িতে তিনটে টয়লেট আছে। অসুবিধে হয় না। আজ ঘুম ভাঙামাত্র মা বলেছিলেন, 'নাঃ, জ্বর নেই। তবে আজ স্কুলে যেও না। আমি ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ রেডি করে রেখে যাচ্ছি। ঠিক সময়ে খেয়ে নিও। মাঝে মাঝে ফোন করব।'

ওঁরা দু'জন একটা গাড়ি নিয়ে স্টেশন পর্যন্ত যান। সেখানে পার্কিং-এ গাড়ি রেখে টিউব ধরেন। বাবার দুটো স্টেশন আগে মা নেমে যান। দু'জনের আলাদা এলাকায় অফিস। ফেরার সময় মা আগে আসেন। বাড়িতে গাড়ি নিয়ে এসে আবার ঘণ্টা-দুয়েক বাদে ফিরে যান বাবাকে টিউব স্টেশন থেকে তুলে আনতে। ঠিক আটটায় তামার স্কুল-বাস আসে দরজায়। সে যখন যায় এবং স্কুল থেকে ফেরে, তখন বাড়িটা তালাবন্ধ থাকে।

তামার বয়স পনেরো। গায়ের রং উজ্জ্বল, মুখ-চোখ ভাল। সে মুখ ধুয়ে কিচেনে এল। মাইক্রোওয়েভের দিকে তাকাল। এখন কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। তবু একটা গরম পানীয় বানিয়ে নিল। ওদের এই কিচেনে হরেকরকম খাবার সব সময় মজুত থাকে। ইণ্ডিয়ায় গেলে এই কিচেনটার কথা খুব মনে পড়ে। ওখানে ঠাম্মা নানারকম খাবার তৈরি করে দেন বটে, কিন্তু সেগুলো চাইলেই পাওয়া যায় না। তৈরি করার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

লিভিং রুমে এসে রিমোট টিপে টিভি খুলল তামা। একটা ক্রাইম ছবি হচ্ছে চ্যানেল সেভেনে। সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারে গুলি ছুঁড়ল অপরাধী। লোকটা পড়ে গেল। অপরাধী পালাল। পুলিশ এবং অ্যাম্বুলেন্স এল। দেখা গেল লোকটা মরে গেছে। পুলিশ অফিসার বললেন, "ওর মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ ও জানত এই এলাকায় কারা ড্রাগ নিয়ে ব্যবসা করে।"

www.boiRboi.blogspot.com

রিমোট টিপে টিভি বন্ধ করল তামা। এটা নিশ্চয়ই অ্যান্টি ড্রাগ বিজ্ঞাপন। এতে কোনও রহস্য সেই। এখন চারপাশে ড্রাগের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেন। তাদের স্কুলে ঢোকার রাস্তায় বোর্ডে লেখা আছে 'ড্রাগ ফ্রি জোন'। স্কুলের গেটেও সাইনবোর্ড টাঙানো, 'ড্রাগ ফ্রি স্কুল'। কিন্তু অনেকেই ড্রাগ খায়। লুকিয়ে-চুরিয়ে। যেদিন খায় সেদিন স্কুলে আসে না। মার্থার বাড়িতে জড়ো হয়। চারজনকে জানে সে। ক্যাথরিন তাকে দলে টানতে চেয়েছিল বলেই জানে। ক্যাথরিন তার অনেকদিনের বন্ধু। বলেছিল, "যেই তুই কিকটা পাবি অমনই মনে হবে পৃথিবীটা কী সুন্দর। কোথাও কোনও প্রব্লেম নেই।

তামা জিজ্ঞেস করেছিল, "তুই রোজ খাস?"

"নো। সপ্তাহে একদিন। রোজ খেলে নেশা হয়ে যাবে। তখন না পেলে শরীর রিভোল্ট করবে। শরীরের ভেতরটা অকেজো হয়ে যাবে। রোজ কেউ খায়, পাগল!"

"খাওয়ার কী দরকার?"

"ওহ্ নো! ইট্স এক্সাইটিং। তুই খুব ভীতু। আঠারো না হলে অ্যাডাল্ট হবি না।"

এটা ওকে খোঁচা দেওয়ার জন্য। বাবা তাকে গাড়ি চালানো শিখিয়েছেন, কিন্তু রাস্তায় বের করতে দেন না। আঠারোর নীচে লাইসেন্স পাওয়া যায় না। ধরলে কড়া শাস্তি। ক্যাথরিন কিন্তু প্রায়ই চালায়। ওর বয়সের তুলনায় শরীরটা বড়। লাইসেন্সের তোয়াক্কা করে না ও। এখনও অবশ্য ধরা পড়েনি। তামাদের ক্লাসে ক্যাথরিন আর তামার রেজাল্ট সবচেয়ে ভাল।

ক্যাথরিন ড্রাগ নিতে শিখেছিল মার্থার কাছে। মার্থা শিখেছে ওর দাদার বন্ধুর কাছে।

ড্রাগ খাওয়া ছেলেমেয়েদের যেসব ছবি ছাপা হয়, তার সঙ্গে ওদের কোনও মিলই নেই। স্কুলে কড়া সার্কুলার দেওয়া আছে, কোনও ছেলেমেয়ে যদি ড্রাগ খাচ্ছে প্রমাণিত হয়, তা হলে তাকে সঙ্গে-সঙ্গে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। যারা ড্রাগ বিক্রি করে তারা অন্য স্কুলের পাশা-পাশি পার্কে গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু ড্রাগ ফ্রি জোনের নোটিশ থাকায় ওদের স্কুলের দিকে কেউ বিক্রি করতে আসে না। স্কুলের পাহারাদাররা ওদের ছাড়বে না। তামা ক্যাথারিনকে জিজ্ঞেস করেছিল

www.boiRboi.blogspot.com

ওরা কোথায় ওসব কেনে? ক্যাথি বলতে চায়নি। কিন্তু একদিন স্কুলে যাওয়ার সময় ডিমফিল্ডের মার্কেট প্লেসে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু কালো মানুষকে দেখিয়ে বলেছিল, এদের কাছে চাইলেও পাওয়া যায়।

বাড়িতেও এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিটের দেওয়ালে যেসব মানুষ সারাদিন সারাসন্ধ্যা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের প্রায়ই পুলিশ ধরে ড্রাগ ব্যবসায় সাহায্য করার অভিযোগে। ওয়াসিংটন ব্রিজ টানেলেও ওদের দেখতে পাওয়া যায়। মা-বাবার সঙ্গে ওই পথে গিয়ে লোকগুলোকে দেখেছে তামা। দেখলেই ভয় লাগে। বাবা বলেন, "শুধু কালোরা নয়, সাদারাও আছে সমান-সমান।" পানামা দখল করে নুরিয়েগাকে যখন ভার্টিকান এমব্যাসির ভেতর আটকে রাখা হয়েছিল তখন বাবা খুব খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, এই লোকটা পৃথিবীর অন্যতম ড্রাগ-কারবারি। একটা ক্যাসেট বেরিয়েছিল। তখন নুরিয়েগাকে গালাগালি দিয়ে। স্কুলের মেয়েরা তা গাইত। এমনকী ক্যাথিও। অথচ ক্যাথি সপ্তাহে একদিন ড্রাগ খায়। মা ক্যাথিকে চেনে। মাকেও কথাটা বলতে পারেনি সে। আগে যা জানত তাই মাকে বলত। এখন বড় হওয়ার পর সে বুঝে নিয়েছে কোনটা বলা দরকার। মা ক্যাথির ওপর রাগ করবেন। হয়তো স্কুলে ফোন করে বলে দেবেন। স্কুল যদি ক্যাথির শরীর টেস্ট করে তা হলে সত্যিটা প্রকাশ পাবেই। তা হলেই ওরা ওকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে। অত-দিনের একটা ভাল বন্ধুকে হারাবে তামা। তাই বলেনি কিছু। ক্যাথি প্রতি সপ্তাহে ওজন নেয়। ওর ওজন কমার বদলে একটু বেড়েছে। ড্রাগ যদি ক্ষতি করত তা হলে ওজন কমত।

টেলিফোন বাজল। এ-বাড়ির প্রতি ঘরে টেলিফোন। কিচেনেও। রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই দূর থেকে গলা ভেসে এল, "হেলো! তামা নাকি? আমি বড়মামা!"

খুশি হল তামা, "হাই! তুমি কেমন আছ?"

"ভাল না। মা-বাবা কোথায়?"

"অফিসে। আমার শরীর খারাপ বলে স্কুলে যাইনি।"

"রাত্রে লাইন পাইনি। আমি খুব প্রব্লেমে পড়েছি অন্তুকে নিয়ে। মাকে বলবি ফোন করতে।"

"কী প্রব্লেম?" জিজ্ঞেস করা মাত্র লাইনটা কেটে গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

বড়মামা ফোন করেছিলেন ইণ্ডিয়া থেকে। খুব মজার মানুষ। গত বছর তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। অন্তু বড়মামার ছেলে। চার বছর আগে সে যখন ইণ্ডিয়ায় গিয়েছিল তখন অন্তুকে দেখে তার ভাল লেগেছিল। আমেরিকা সম্পর্কে খুব আগ্রহ অন্তুর। আমার থেকে দু' বছরের বড়।

ইণ্ডিয়ার আত্মীয়দের ভাল লাগে তামার, কিন্তু সেখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। এত ভিড়, এত গরম যে, হাঁপিয়ে ওঠে। ওখানে যাঁরা জন্মেছেন এবং বড় হয়েছেন তাঁদের শরীর নিশ্চয়ই জল, খাবার আব-হাওয়ার সঙ্গে একটু একটু করে মানিয়ে নিয়েছে! কিন্তু তামা পারে না। রাস্তায় ট্রাফিক রুল বলতে কিছু নেই। খাবারদাবার ফ্রেশ না নিয়ে এলে ভাল পাওয়া যায় না। মাঝে-মাঝে মনে হত সবাইকে যদি এদেশে সে নিয়ে আসতে পারত, কী মজা হত! বাবা-মা ইণ্ডিয়ায় গিয়ে প্রথম ক'দিন খুব উৎসাহে থাকেন। একটু পুরনো হওয়ামাত্র কেমন ঝিমিয়ে পড়েন।

অন্তুর কী হয়েছে? এমন কী সমস্যা যার জন্য বড়মামাকে অতদূর থেকে ফোন করতে হল? ভেবে পাচ্ছিল না তামা। সে এখন ইণ্ডিয়ায় টেলিফোন করতে পারে। কিন্তু লংডিসট্যান্স কল করলে বাবা রাগ করবেন। সে মাকে ফোন করে বড়মামার ব্যাপারটা জানিয়ে দিল। তার শরীর এখন ভাল আছে, একটু বাদেই ব্রেকফাস্ট খাবে। মা যেন চিন্তা না করেন।

টিভি দেখতে ইচ্ছে করছে না। সারাটা দিন বাড়িতে একা বসে থাকা, কী বিরক্তিকর ব্যাপার। স্কুলের বাস এসে দাঁড়াল রাস্তায়। জানলা দিয়ে দেখল সে। দু' মিনিট দাঁড়াবে বাসটা। না গেলে চলে যাবে। ক্যাথরিন যে জানালায় বসে সেখানে আজ কেউ নেই। ওই সিটটা ক্যাথির পাকা। তবে কি আজ ক্যাথিও স্কুলে যাচ্ছে না। বাস বেরিয়ে গেল।

ক্যাথরিনের বাড়িতে ফোন করল সে। ক্যাথিই ধরল, "ও, তুই। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।"

"ভয়? কেন?"

"কিছু না। তুই স্কুলে যাসনি?"

"না। শরীর ভাল না। তুই যাসনি কেন?"

www.BoiRboi.blogspot.com

"এমনই।" একটু চুপ করল ক্যাথি, "তামা, তুই আমাকে সাহায্য করবি?"

"নিশ্চয়ই। কী ব্যাপারে বল?"

"আমি তোর কাছে যাচ্ছি।" লাইন কেটে দিল ক্যাথি।

মিনিট পনেরো বাদে ক্যাথি গাড়ি চালিয়ে এল। ওর মায়ের গাড়ি এটা। মা গতকাল নিউ অরলিন্সে গিয়েছেন তাঁর বাবাকে দেখতে। দরজা খুলতেই সোফায় ধপ করে বসে পড়ল ক্যাথি। ওকে খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। অথচ গতকালও স্বাভাবিক ছিল।

ক্যাথি বলল, "মার্থা আমাকে খুব বিপদে ফেলে দিয়েছে।"

"কী বিপদ?"

"কাল রাত্রে আমাকে একটা প্যাকেট দিয়ে গেছে ব্রাউন সুগারের। আজ সকাল পর্যন্ত রাখতে বলেছিল। আমি আপত্তি করেছিলাম, শোনেনি।" ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করল ক্যাথি।

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তামার। একটা অ্যালাম ক্লকের বাক্সের সাইজের প্যাকেট। ব্রাউন সুগার কি জিনিস তা কোনওদিন দেখেনি সে। ক্যাথি বলল, "মার্থা বলেছে এতে নাকি পঞ্চাশ হাজার ডলারের জিনিস আছে। সাধারণ ব্রাউন সুগার নয়।"

"মার্থাকে ফেরত দিয়ে দে।" কোনও মতে বলতে পারল তামা।

"আজ সকালে ওকে ফোন করেছিলাম।"

"কী বলল?"

"ও নেই।"

"নেই মানে? কোথায় গেছে?"

"ওকে কাল রাত্রে কেউ খুন করেছে।"

"সে কী!"

"টিভিতে দেখিসনি? আজ সকাল থেকেই দেখাচ্ছে।" ঘড়ি দেখল ক্যাথি।

"না তো।" বলে তামা টিভির সামনে ছুটল। লোকাল নিউজের সময় এখন। ক্যাথিও ওর পেছনে এল। চ্যানেল অন করে কিছু বিজ্ঞাপন দেখল। তারপর খবর আরম্ভ হল। প্রথমেই, "স্কুল গার্ল মার্ডারড।" হেডলাইন বলে আবার মার্থার খবরে ফিরে এল। মার্থা গতকাল রাত্রে বাড়িতে ফিরছিল। ওদের বাড়ির সামনে আততায়ী দাঁড়িয়ে ছিল।

www.boiRboi.blogspot.com

তখন আশপাশে কেউ ছিল না। শুধু উলটো দিকের একটা বাড়ির বৃদ্ধা মহিলা জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি দেখলেন লোকটা মার্থার সঙ্গে কথা বলল। শেষে ঝগড়া করল। দূরত্বের জন্য বিষয়বস্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন না। লোকটা মার্থাকে হাত তুলে শাসাল। মার্থা সেটা উপেক্ষা করে চলে যেতে লোকটা পেছন থেকে গুলি চালায়। বৃদ্ধা রিভলভার দেখেছেন। সাইলেন্সার লাগানো ছিল বলে শব্দ হয়নি। শুধু মার্থার শরীর উলটে পড়ে যায়। বৃদ্ধা এমন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন যে, চিৎকার করতে তাঁর সময় লেগেছিল। তবে তিনি দেখেছিলেন আততায়ী মার্থা পড়ে যাওয়ার পর তার পোশাকে কিছু সন্ধান করেছিল। সে যে পায়নি এটা তিনি নিশ্চিন্ত। পথের পাশে একটা বাইক দাঁড় করানো ছিল। আততায়ী সেটা চেপে চলে যায়। বৃদ্ধাই পুলিশকে ফোনে জানান। ইতিমধ্যে পুলিশ মার্থা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে যা জানতে পেরেছে তাতে সন্দেহ হচ্ছে সে ড্রাগব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিল। প্রতি সপ্তাহে কিছু মেয়ে দুপুরে ওর বাড়িতে মিলিত হত। এই মেয়েরা কারা তা এখনও জানা যায়নি। জোর তদন্ত চলছে।

এই খবরের সঙ্গে মার্থার বাড়ির বাইরেটা, তার শোবার ঘর, মৃত এবং জীবিত মার্থার ছবি বারংবার দেখানো হচ্ছিল। ওরা দমবন্ধ করে টিভির দিকে তাকিয়ে ছিল। মার্থার পড়ার টেবিল যখন দেখাচ্ছে তখন ক্যাথি চেঁচিয়ে উঠল, "হা ভগবান!"

তামা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"আমার বই। আমার নাম লেখা আছে ওতে। মার্থা পড়তে নিয়েছিল।" মুখে হাত দিল সে, "কী হবে এখন?"

তামা ওর কাঁধে হাত রাখল, "তাতে কী হয়েছে। বন্ধু তো বই নিতেই পারে।"

"কিন্তু আমিও তো দুপুরে ওর বাড়িতে যেতাম।"

ওরা দু'জন চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ক্যাথি উঠল, "আমি যাচ্ছি। তুই ওই প্যাকেটটা কিছুদিন তোর কাছে রেখে দিবি?"

"আমার কাছে রাখতে চাইছিস কেন?"

"যে মার্থাকে খুন করেছে, সে আমার কাছে আসতে পারে। পুলিশ তো আসবেই। আর এসে যদি ওটা দ্যাখে তা হলে—।" ক্যাথি মাথা নাড়ল।

www.boiRboi.blogspot.com

"এটাকে রাখার কী দরকার ? ফেলে দে জলে।"

"না !" দৃঢ় গলায় উচ্চারণ করল ক্যাথি।

"কেন ?"

"সহজে পাওয়া যাবে না ওই জিনিস।"

"পাওয়ার কী দরকার ?"

"তুই বুঝবি না।"

"তোর নেশা হয়ে গেছে ক্যাথি।"

"হলে হোক, তোর কী ?"

"তা হলে আমি এটা রাখতে পারব না। আর রাখলে মাকে বলব।"

"তামা, তুই আমার উপকার করবি না ?" কাতর গলা হয়ে গেল ক্যাথির।

"ওই প্যাকেট আমি রাখতে পারব না। ক্যাথি, তুই এটাকে ফেলে দে।"

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল ক্যাথলিন। ফুঁপিয়ে কাঁদল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "আমি মরে যাব তামা। ওরা যেমন মার্থাকে মেরে ফেলেছে তেমনই আমাকেও মারবে।"

"কারা মার্থাকে মেরেছে ?"

"আমি জানি না। তবে মার্থা আমাকে বলেছিল, ওরা খুব দামী জিনিস দেবে। পঞ্চাশ হাজার ডলার দাম। টাকাটা জোগাড় করতেই হবে। আমার কাছে চেয়েছিল। আমি দেব কী করে ? আমার পাঁচশো ডলার আছে। মার্থা পাঁচ হাজার জোগাড় করেছিল। তাই দিতে চেয়েছিল লোকগুলোকে। ওরা রাজি হয়নি।"

"ওরা তো তোকে চেনে না।"

"কী জানি ! আমার খুব ভয় করছে। যদি মার্থা আমার নাম ওদের কাছে করে থাকে !" ভেঙে পড়ছিল ক্যাথি।

"তুই পুলিশকে সব খুলে বল।"

"না। তা হলে আমার ছবি টিভিতে সবাই দেখবে। ওরাও জানতে পারবে। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে। নেশা হোক বা না হোক একদিন তো সপ্তাহে খাই।"

"তা হলে তুই ওটা জলে ফেলে দে।"

"আমি একা আর ওটা নিয়ে যেতে পারব না তামা।"

www.boiRboi.blogspot.com

বন্ধুর কান্না, চেহারা দেখে একটু ভাবল তামা। তারপর এগিয়ে গিয়ে মাকে টেলিফোন করল, "মা, ক্যাথি এসেছে, ওর সঙ্গে একটু বের হব? না, না, জ্বর নেই। বেশি দূরে না, কে মার্টের দিকে। অ্যাঁ, না, ও স্কুলে যায়নি। কেন? এমনই। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব। প্রমিস।" রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

দরজা বন্ধ করে তামা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ক্যাথির সঙ্গে। একটু শীত-শীত করছিল। যদিও এখন শীত নেই। জিনসের ওপর সুতির পুলওভার পরেছে সে। দেখতে বেশ সুন্দর লাগছিল। ক্যাথি গাড়িতে উঠে বসতেই তামা বলল, "তোর ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। যদি পুলিশ ধরে তা হলে কিন্তু প্যাকেটটা লুকনো যাবে না।"

"যাঃ। কোনদিন ধরেনি, আজও ধরবে না।"

"না। চল হেঁটে যাই।"

ক্যাথি বিরক্ত হল। এখানে একমাত্র জগিং কিংবা মর্নিং ওয়াকের সময় লোকে ফুটপাত দিয়ে হাঁটে। তা ছাড়া তামাদের বাড়িটা নির্জন গাছগাছালিঘেরা এলাকায় বলে পথে মানুষ দেখা যায় না। পুলিশের ভয়েই ক্যাথি গাড়ি থেকে নামল। ওর ব্যাগেই প্যাকেটটা রয়েছে।

দুই বন্ধুতে পাশাপাশি অনেকক্ষণ চুপচাপ হেঁটে গেল। ক্যাথি অবশ্য মাঝে-মাঝেই মুখ ফিরিয়ে পেছনের দিকে তাকাচ্ছিল। বাঁক ঘুরতেই ওরা লেকটাকে দেখতে পেল। রাস্তার এপাশে লেক, অন্যদিকে কে মার্ট। কে মার্টের সামনে পার্কিং লটে এখন বেশি গাড়ি নেই। তবু কিছু মানুষকে সেখানে দেখা যাচ্ছে। আমেরিকার প্রায় সব বড় শহরে এই কোম্পানির বিশাল ডিপার্টমেণ্টাল দোকান রয়েছে। নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত মানুষের যা-যা প্রয়োজন, তা একটা ফুটবল মাঠের আয়তনের ওই দোকানটায় রয়েছে। কে মার্টের উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল ওরা। লেকটার গায়ে একটা ফেন্সিং আছে। একটিও মানুষ লেকের ধারে-কাছে নেই। ওরা ফেন্সিং-এর কাছে চলে এল। তামা বলল, "কেউ নেই। এখান থেকে প্যাকেটটা জলে ছুঁড়ে দে।"

ক্যাথি বলল, "প্যাক না খুলে ছুঁড়ে দিলে এটা ঠিক থাকবে। ওয়াটারপ্রুফ দিয়ে মোড়া। প্যাকেটটা ছিঁড়ব?"

কোনদিন ব্রাউন সুগার দেখেনি তামা। প্যাক খুললে নিশ্চয়ই দেখা যাবে। সে মাথা নাড়তেই পেছন থেকে গলা ভেসে এল, "এই যে

www.boiRboi.blogspot.com

খুকিরা, ওখানে কী করছ ?"

চমকে পেছনে তাকাতেই ওদের দম বন্ধ হয়ে গেল। একটা পুলিশের গাড়ি কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। ড্রাইভিং সিটে বসে একজন অফিসার ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন। ক্যাথি কাঁধ নাচাল, "লেক দেখছি। লেক দেখাটা কি অন্যায় ?"

"মোটেই না। তোমরা কি কারও জন্য অপেক্ষা করছ ?"

"না।" তামা মাথা নাড়ল।

"ওকে, ওকে। দেন পুশ্ অফ। কাল ওই পাড়ায় একটি তোমাদের বয়সী মেয়ে খুন হয়েছে। মেয়েটা ড্রাগ খেত। ওরকম একটা ঘটনা আর ঘটুক আমরা চাই না।"

তামা প্রতিবাদ করল, "আমি ড্রাগ খাই না।"

"ইট্স গুড। কিন্তু খুকি, এই লেকে দেখার কিছু নেই।"

অতএব সরে আসতে হল। ওরা যতক্ষণ না রাস্তা পেরিয়ে কে মার্টের দিকে এগিয়ে গেল ততক্ষণ অফিসার নড়লেন না। গাড়িটা বেরিয়ে গেলে স্বস্তি পেল ওরা। তামা বলল, "ভাগ্যিস তুই তোর গাড়িটা ওখানে পার্ক করিসিনি।"

ক্যাথি বলল, "লোকটা মার্থার কথা বলল। আমাকে সার্চ করলেই..."

"কী করবি এখন প্যাকেটটা নিয়ে ?"

"কী করি !" পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে ক্যাথি বিড়বিড় করল। তামা ঘড়ি দেখল। ইতিমধ্যে পঁয়ত্রিশ মিনিট হয়ে গেছে। মা ঠিক এক ঘণ্টা পরে ফোন করবেন। সে প্রমিস করেছে ওই সময়ের মধ্যে ফিরে আসবে।

ক্যাথি বলল, "চল, কে মার্টের লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড বক্সে ওটা ফেলে দিই।"

"যে লোকটা খুলবে সে যদি ড্রাগ খায় তা হলে ফেরত দেবে ?"

"না দিলে না দেবে, আমাদের কী !"

"বাঃ, তাতে লোকটার সর্বনাশ হবে। ওর বাড়ির লোকজনের ক্ষতি হবে।" বলতে-বলতে তামা দেখল একটা লোক কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিটা ভাল লাগল না। এই সময় ক্যাথি বলল, "মাটিতে পুঁতে ফেললে কীরকম হয় ?"

"কোথায় পুঁতবি ?"

www.boiRboi.com

"আমাদের বাড়িতে তো মাটি নেই। তোদের বাড়ি পেছনের বাগানে যদি পুঁতে দিই? সেই ভাল। কেউ দেখতে পাবে না, বুঝতেও পারবে না।"

সায় দিচ্ছিল না মন। বাবা-মা জানবেন না যে বাড়ির বাগানে অত হাজার ডলারের ব্রাউন সুগার আছে। পুলিশ যদি আসে, যদি সঙ্গে কুকুর থাকে তা হলে খুঁজে পেতে দেরি হবে না। সেক্ষেত্রে ওরা বাবা-মাকেও ধরবে। সে মাথা নাড়ল, "না, আমাদের বাড়িতে না। বরং চার্চের পেছন যে বাগানটা, সেখানে কেউ যায় না আজ চার্চ ডে নয়। সেখানেই পুঁতে দেওয়া যেতে পারে।"

তামা হিন্দু। কারণ তার বাবা-মা তাই। কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে সে কয়েকবার চার্চে বেড়াতে গিয়েছে। ওই বাগানটাকে তার খুব ভাল লাগে। এদিকে লোকটা এখনও তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তামা ওকে এড়াতেই ক্যাথিকে নিয়ে কে মার্টের ভেতরে ঢুকল। লোকজন এই অসময়ে তেমন নেই। কর্মচারীরা ছড়িয়ে আছে আশপাশে। এককোণে টিভি চলছে। সবাই সেদিকে তাকিয়ে। তামারা দেখল মার্থার খবরটাই বলা হচ্ছে।

পুলিশ জানতে পেরেছে গত রাত্রে মার্থা তার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানে সে বন্ধুর কাছে একটা প্যাকেট রেখে এসেছে। মার্থা যে ড্রাগ-চোরাচক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল এটা তার প্রমাণ। এই অবধি শুনেই ক্যাথি তামার হাত আঁকড়ে ধরল। সংবাদপাঠিকা তখনও বলে যাচ্ছেন, "পুলিশ একটু আগে মেয়েটিকে গ্রেফতার করে। মেয়েটির নাম লুসি। ওরা একই ক্লাসে পড়ত। লুসির কাছে যে প্যাকেটটা পাওয়া যায় তাতে সাধারণ চিনির দানা ছিল। লুসি বলেছে মার্থা তাকে রাখতে দিয়েছিল এক রাত্রের জন্য। কী ছিল সে খুলে দেখেনি। এদিকে মার্থার মা জানিয়েছে, তাঁর মেয়ে পাঁচ হাজার ডলারের একটা ক্যাশ সার্টিফিকেট তাঁদের অজান্তে ভাঙিয়েছে। কিন্তু মার্থা কেন লুসির কাছে সাধারণ চিনি রাখতে যাবে তা বোধগম্য হচ্ছে না। পুলিশ সন্দেহ করছে চোরাকারবারীরা মার্থাকে ভুল বুঝেয়েছিল।"

ক্যাথি তামার দিকে তাকাল। হঠাৎ তামা উত্তেজিত হয়ে ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এল, "আমি মাকে ফোন করছি।"

"সে কী! কেন?"

www.boiRboi.blogspot.com

"মা এলে সব কথা খুলে বলব।"

"অসম্ভব।" মাথা নাড়ল ক্যাথি।

"তোর প্যাকেটেও লুসির মতো চিনি পাওয়া যেতে পারে।"

"কী করে বলব?"

"মা এসে প্যাকেটটা খুললেই বোঝা যাবে।" বলতে-বলতে তামা দেখল সেই লোকটা কে মার্টের ভেতরে ঢুকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। চোখাচোখি হতেই লোকটা এগিয়ে এল, "এক্সকিউজমি বেবি, তোমার নাম কি ক্যাথলিন?"

"কেন? নামে কি দরকার?"

"আমি তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে শুনলাম তুমি তামার বাড়িতে এসেছ। তামার বাড়িতে গিয়ে দেখলাম কেউ নেই কিন্তু তোমার গাড়িটা ওখানে রয়েছে। তারপরেই রিপোর্ট পেলাম তোমাদের বয়সী দুটো মেয়েকে লেকের ধারে দেখা গেছে।"

"আপনি কে?" ক্যাথি জিজ্ঞেস করল কাঁপা গলায়।

লোকটা পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দেখাল, "ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর জন স্মিথ।" জন হাসলো, "তুমি খুব নার্ভাস হয়ে আছ মনে হচ্ছে।"

"না, নার্ভাস কেন?" ক্যাথি মুখ ফেরাল।

"ওয়েল। আমার তামার বাড়িতে বসতে পারি। ওর মা-বাবাও এখনই এসে পড়বেন। তা ছাড়া তোমাদের গাড়িটা ওখানে পড়ে আছে। সেটা নিতে তোমার মা ওখানে আসছেন।" জন হাত তুলল, "চলো, ওইখানে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।"

ক্যাথি কাতর চোখে তামার দিকে তাকাল। জন এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ির দিকে। ক্যাথি ফিসফিস করে বলল, "ব্যাগ থেকে বের করে ফেলে দেব?"

"দেখতে পাবে।" তামা জবাব দিল।

"কিন্তু আমার ব্যাগ থেকে ওটা পেলে জেল হবে, স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে।"

ডিটেকটিভ জন চেঁচিয়ে ডাকতেই ওরা এগিয়ে যেতে বাধ্য হল। গাড়িতে পথটা ফুরিয়ে গেল কয়েক মুহূর্তেই। তামা দেখল বাড়ির বারান্দায় মা দাঁড়িয়ে আছেন চিন্তিত মুখে। ক্যাথির মা গাড়ির কাছে। বাবাকে দেখতে পেল না। গাড়ি থেকে নামতেই তামার মা দৌড়ে নেমে

www.boiRboi.blogspot.com

এলেন। হাত তুলল জন, "না, না, উত্তেজিত হবেন না। চলুন ভেতরে গিয়ে কথা বলি।"

তামার মা তামার হাত ধরেছিলেন। ক্যাথিকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তার মা। ক্যাথি কাঁদছিল। ভেতরে ঢুকে সবাইকে সোফায় বসতে বললেন জন। তারপর শুরু করলেন, "আমি একটু খুলেই বলি। লুসি, মার্থার বন্ধু স্বীকার করেছে ওরা সপ্তাহে একদিন মার্থার বাড়িতে মজা করতে যেত। ওরা ড্রাগ খুব সামান্যই নিত, তাই নেশা হয়নি। ক্যাথি, কী বল?"

ক্যাথি নীরবে মাথা নাড়তেই জন খুশি হলেন, "দ্যাটস গুড। চতুর্থ মেয়েটির নাম লিজা। সে-ও এরই মধ্যে কথাটা স্বীকার করেছে। মার্থা কাল রাত্রে লিজার বাড়িতেও গিয়েছিল। লিজা এবং ক্যাথির নাম আমরা জানতে পারি লুসির কাছ থেকে। মার্থা তার তিন বন্ধুকে তিনটি প্যাকেট দিয়ে এসেছিল। ক্যাথি, তোমার প্যাকেটটা দাও।"

ক্যাথি চুপ করে বসে রইল। তার মা বললেন, "ক্যাথি, উনি যা বলছেন তাই করো।"

ক্যাথি তখন ব্যাগ খুলে প্যাকেটটা টেবিলে রাখল। সেটা তুলে নিয়ে চটপট খুলে ফেললেন জন। সেলোফেন কাগজের প্যাকেটের ভেতরে লালচে-সাদায় দ্রব্যদানা চোখে পড়ল সবার। সেই মোড়কটা খুলে একটা দানা জিভে নিয়ে চোখ বন্ধ করলেন জন। তারপর হেসে ফেলে দিলেন টেবিলে, "হ্যাঁ, এটাও চিনির দানা।" সঙ্গে সঙ্গে তামা এবং ক্যাথির মায়ের স্বস্তির নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। জন বললেন, "মার্থা জানত না এই তিনটে প্যাকেটে চিনির দানা আছে। পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে সে পঁচিশ সেন্টের চিনি কিনেছিল। ওকে কেউ ধাপ্পা দিয়েছে। ওকে যেমন ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে তেমনই আর-একজন ধাপ্পা খেয়েছে। যে মার্থাকে বিক্রি করেছে সে আর-এক নেশাখোরকে খবর দিয়েছিল মার্থার কাছে জিনিসটা আছে। লোকটা মার্থার কাছে সেটা চায়। মার্থা ভয়ে লুসির নাম করে। কিন্তু সে বিশ্বাস করে না। ঝগড়া হয় এবং গুলি করে। ড্রাগের জন্য ওরা সব করতে পারে। লোকটা এরপরে লুসির বাড়িতে যায়। রাত হয়ে যাওয়ায় ভেতরে ঢুকতে পারে না। অপেক্ষা করে সুযোগের জন্য। কিন্তু সেই সময় তার নেশা প্রবল হয়ে ওঠে। ওই সময় মাথা ঠিক রাখতে পারে না ওরা। বাড়ির পাশের গাছ বেয়ে

www.boiRboi.com

দোতলায় উঠতে যায় সে। শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পড়ে যায়। তার চিৎকারে লুসির বাবা বেরিয়ে আসেন। আহত লোকটিকে হসপিটালাইজ্‌ড করা হয়। ওর অবস্থা খুবই গুরুতর। আজ সকালে সে স্টেটমেণ্ট দিয়েছে, কেন লুসিদের দোতলায় উঠতে গিয়েছিল। ওর সেন্স ফিরলে আমরা মার্থাকে খুন করার স্টেটমেণ্ট নেব। কিন্তু এখন, ক্যাথি, আমি চাই না তোমার মতো সুন্দর মেয়ের নামে বদনাম হোক। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা করো আর কখনও ড্রাগ খাবে না, তা হলে এই ব্যাপারটা গোপন থাকবে। তা ছাড়া তোমার কাছে চিনি ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি।" ক্যাথি কেঁদে ফেলল। দু' হাত মুখ ঢেকে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, "প্রতিজ্ঞা করছি. আমি জীবনে ড্রাগ খাব না।"

ডিটেকটিভ জন হাসলেন, "দ্যাট্‌স লাইক এ গুড গার্ল। এখন মার্থার খুনীকে ধরেই আমাদের কাজ শেষ হয়নি। যারা ওকে বিক্রি করেছিল তাদের ধরতে হবে। ওরাই সত্যিকারের অপরাধী। এবং আপনারা, মায়েরা, আপনাদের বলছি। যখন স্বামী-স্ত্রী কাজে বেরিয়ে যান এবং ওরা একা বাড়িতে থাকে, তখন আমাদের একটু ফোন করে জানিয়ে রাখবেন। ওরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক। কত বিপদ হতে পারে ওদের।" জন বেরিয়ে গেলেন।

ক্যাথির মা তামাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। কে জানে তাঁর মেয়ের মার্থার মতো অবস্থা হতে পারত যদি তামা ওকে সঙ্গ না দিত। ওঁরাও চলে গেলেন।

তামার মা গালে হাত দিয়ে বসেছিলেন। তামা বলল, "মা, তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ, না? আমি কিন্তু তোমাকে ফোন করার কথা বলেছিলাম।"

তামার মা মাথা নাড়লেন, "তোমায় আমি বিশ্বাস করি তামা।"

"তা হলে মুখ ভার করে আছ কেন?"

"তোমার বড়মামাকে টেলিফোন করেছিলাম।"

"ও। কী বললেন?"

"অন্তুর সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।"

"কী হয়েছে?" চমকে উঠল তামা।

"ও ড্রাগ খাচ্ছে। ফেরোসাস হয়ে গিয়েছে। কণ্ট্রোল করা যাচ্ছে না। ঘরে বন্ধ করে রাখলেও ড্রাগ খেতে দিতে হচ্ছে। পড়াশোনা চুলোয়

www.boiRboi.blogspot.com

গিয়েছে। আমি বড়মামাকে বললাম, ওকে এখানে নিয়ে আসতে। এখানে অনেক নতুন চিকিৎসা হচ্ছে এখন। এখনই না বাঁচাতে পারলে তোমার বড়মামার পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে।"

চুপ করে রইল তামা। তারপর বলল, "মা, ইণ্ডিয়াতেও ড্রাগ খায় ওরা?"

"তোমাকে বলেছি ইণ্ডিয়া বলবে না নিজেদের মধ্যে। দেশ বলবে। হ্যাঁ, খায়। এই সর্বনেশে জিনিস যারা বিক্রি করে তারা পৃথিবীর সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।"

"কিন্তু তুমি বলো দেশের লোক গরিব। গরিবরা কেনে কী করে?"

"সেইরকম জিনিসই বিক্রি হয়, যা ওরা কিনতে পারে।"

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল তামা। সোজা চলে গেল নিজের ঘরে। কাগজ বের করে চিঠি লিখতে বসল, "পৃথিবীর সব দেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী মহাশয়েরা, আপনাদের কাছে আমি, একটি পনেরো বছরের মেয়ে, বিনীত আবেদন করছি যে, আপনাদের দেশে যারা ড্রাগ নিয়ে ব্যবসা করে তাদের একমাত্র শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দিন। ওরা মার্থাকে মেরেছে, ক্যাথির বিপদ ডেকে এনেছিল এবং আমার মামাতো ভাই অন্তুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আপনারা এদের কখনও ক্ষমা করবেন না। কোনও অল্প শাস্তি দেবেন না।"

www.boiRboi.blogspot.com

একশ একত্রিশ বছর

এই সেদিন কাগজে পড়লাম ডেনমার্কের এক কৃষক একশ একত্রিশ বছর বয়স নিয়ে দিব্যি বেঁচে আছেন। ভদ্রলোক সারা জীবনে মদ, সিগারেট কিংবা অন্য নেশা করেননি। মাছ মাংস ডিম খাননি চল্লিশের পরে। সকালে নিয়মিত মাটি কোপান, বিকেলে লাঠি নিয়ে প্রতিবেশীদের খোঁজ-খবর করতে বেরিয়ে পড়েন। এই দীর্ঘজীবনের রহস্য কি সাংবাদিকরা তা জানতে চেয়েছিলেন। তিনি জবাব দিতে পারেননি। খবরটা পড়ার পরে মনে হয়েছিল বেঁচে থাকলে তাঁর বয়সও ওইরকম হত। ডেনমার্কের সেই মানুষটি বেঁচে থাকলে তিনিও—। কিন্তু এখানেই গোলমাল বাঁধল।

আজ যদি তাঁর শরীর বেঁচে থাকত ওই দীর্ঘজীবী মানুষটির মত, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর শান্তিনিকেতনে থাকতেন। কারণ জোড়া-সাঁকোর হট্টগোল, ঘিঞ্জি রাস্তা, দূষিত আবহাওয়া সহ্য করতে পারতেন না। তারপরেই খেয়াল হল, তিনি শান্তিনিকেতনেও থাকতে পারতেন না। উপাচার্যবিহীন শান্তিনিকেতন, কিছু লোভী মানুষের আখড়া শান্তিনিকেতন, ছাত্র আন্দোলনের নামে যাবতীয় আধুনিক দোষের আকর শান্তিনিকেতনে তাঁর দম বন্ধ হয়ে যেত নিশ্চয়ই। তাহলে তিনি কোথায় থাকতেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকার সত্যজিৎ রায়কে যেভাবে সাহায্য করেছেন তাতে বিশ্বাস করি তাঁকে আরও বেশী সম্মান দেখাতেন। হয় পাহাড়ে, নয় সমুদ্রের ধারে তাঁর জন্যে একটা সুন্দর বাংলো করে দিতে পারতেন এমনটা ভাবা যেতে পারে। কিন্তু রানী মহলানবীশ বা মৈত্রেয়ী দেবীরা আজ নেই। তাঁকে দেখাশোনা করার জন্যে অবশ্য মানুষের অভাব হত না।

কিন্তু এই বয়সে তিনি বৃক্ষরোপণ বা হলকর্ষণ উৎসবে যোগ দিতে পারতেন না। সারা জীবন যিনি পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছেন তাঁকে ওই বাংলোয় চুপটি করে বসে থাকতে হত স্বাস্থ্যের কারণে। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই কবিতা লিখতেন।

কথা হল, কি রকম কবিতা লিখতেন তিনি? মিল মিলাইয়া দুরূহ ছন্দে নাকি অন্য কিছু? কবিতা নিয়ে বেশী কিছু ভাবার ধৃষ্টতা আমার

www.boiRboi.blogspot.com

নেই। কিন্তু তাঁকে নিয়ে আমি চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখে ফেললাম। স্বপ্নটি মনের ভিসিআরে রেকর্ড করা হয়ে গেলে বেশ লাভ হল। ভিডিও ছবির মত যখনই ইচ্ছে আগুপিছু করে দেখে নিই। আর দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়।

তিনি শেষ উপন্যাস লিখেছিলেন তাঁর সোওয়া'শ বছর বয়সে। ঠিক বলা হল না, তিনি নিজের হাতে লিখতে পারেন না অঙুলগুলো বিদ্রোহ করায়। তিনি বলে গিয়েছিলেন আর স্টেনোগ্রাফার সেটা লিপিবদ্ধ করেছিল। ওটা পড়ার পর আমি তিন রাত ঘুমোতে পারিনি। আমার কল্পনামাফিক পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে যে দুটি বাংলো দিয়েছে তার একটি দীঘার কাছে শক্তিপুরায়। আমাদের পরিচিত মন্ত্রী কিরণময় নন্দ সেখানে চমৎকার বিচ তৈরী করেছেন। ওখানে কবির দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁর ওপরে। ভীড় এড়ানোর জন্যে পাহারাদার আছে। কিরণবাবুকে বলে এক দুপুরে রওনা হয়ে বিকেলেই পৌঁছে গেলাম রামনগর হয়ে কবির বাংলোয়।

অনুমতি নিয়ে তাঁর বাংলোয় ঢুকেই তাঁকে দেখতে পেলাম। সিঁড়ির পাশে বালির ওপর দাঁড়িয়ে কাঁকড়াদের ছুটোছুটি দেখছেন মুগ্ধ হয়ে। কিছুটা দূরে সমুদ্রের ঢেউ আসছে আর ফিরে যাচ্ছে। পরনে ঘিয়ে রঙের আলখাল্লা, শীর্ণদেহ একটু ঝুঁকে পড়েছে, চুল প্রায় নেই বললেই চলে, দাড়ি তেমনি, চোখে মোটা কাঁচের চশমা। খানিক তফাতে একজন সেবক দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি তাকালেন, 'আপনি?' সসংকোচে পরিচয় দিলাম।

তিনি হাসলেন, 'ও আজকাল নামগুলো মনে রাখতে পারি। মুশকিল হত বিংশ শতাব্দীর তিন-চারের দশকে। ভাল ভাল।'

'কেন মুশকিল হত তখন?'

'হবে না। কত লোক লিখত বলুন তো! কাকে ছেড়ে কাকে মনে রাখি! বামুনরা যেমন সংখ্যায় ভারি ছিল, কায়েৎরাও কম ছিল না।'

'কারো নাম কি আপনার মনে পড়ে না?'

'পড়ে।' বাঁড়ুজ্যেরা ভাল লিখত। খুব ভাল। বিভূতি আর তারাশংকর, আপনার নামটি যেন কি?'

'আপনি বলবেন না আমাকে।' নিজের নামটি দ্বিতীয়বার জানালাম।

'হ্যাঁ। এই নামে আর একজন লিখতেন। খুব ভাল লেখা। বেশী

www.pathagar.blogspot.com

পড়তে পারিনি আমি। তোমাদের লেখা তো পড়ার জো নেই। চোখ গেছে একেবারে।'

'ও!' কষ্ট পেলাম একটু।

'তাই বলে ভেবো না নাম জানি না। পুজো সংখ্যায় বিজ্ঞাপনগুলো পড়ে শোনাতে বলি। কয়েকটা নামই তো ঘুরে-ফিরে শুনি। মনে থেকে যায়।' তিনি হাসলেন, 'তা তোমার তো নাম হয়েছে। লেখা ছাড়া আর কি কর?'

'আজ্ঞে লিখেই সংসার চলে।'

'বাঃ। ভাল ভাল। আমাদের সময়ে এমনটা ভাবা যেত না।'

'আপনার জন্যেই বাঙালিরা বই কেনে। আপনিই বাংলা সাহিত্যকে সাবালক করেছেন। কিন্তু সত্যি কথা হল, আপনাকে আমরা কেউ অতিক্রম করতে পারিনি।'

তিনি ফিক্ করে হাসলেন, 'একটা ব্যাপারে পেরেছ। লিখে আমি টাকা পাইনি। এক সময় বিশ্বভারতী করে তাদের দায়িত্ব দিয়েছিলাম। তারা তো সব নয়ছয় করে দিল। একজন এসে দেশ পত্রিকায় ছাপা অমিত্রসূদনের একটা লেখা পড়িয়ে গেল। বিশ্বভারতীর কেচ্ছা! ছি ছি ছি।'

'আপনি ইচ্ছে করলে ওদের হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে নিতে পারেন।'

'একবার দান করলে কি আর ফিরিয়ে নেওয়া উচিত। তবে বেশীদিন নয়। আমি মরে গেলে পঞ্চাশ বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তদ্দিন যা হচ্ছে হোক।'

তিনি ইশারা করতেই সেবক একটি চেয়ার নিয়ে এল। তাকে ধরে সেই চেয়ারে আরাম করে বসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন এলে?'

'আপনার নতুন উপন্যাসটা পড়েছি। আমি মুগ্ধ।'

'পুরনো মদ নতুন বোতলে।'

'তার মানে?'

'চতুরঙ্গ নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলাম অনেককাল আগে। জানো'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার খুব প্রিয় উপন্যাস।'

'সেটাকেই ঢেলে সাজিয়েছি।'

'ধরতে পারিনি একদম।'

www.boiRboi.blogspot.com

'কারণ তোমাদের পাণ্ডিত্যে চালাকিটাই সব। তার সঙ্গে হৃদয়বাদ মেশেনি। দ্যাখো সজনীকান্ত আমাকে প্রায়ই গালাগাল করত। কিন্তু প্রথম প্রথম সে যেটাকে সত্যি মনে করত তাই লিখে ফেলত। পরে গালাগাল দেওয়াটা অভ্যেসে পরিণত হলেও ও আমার লেখা বুঝত। এখন আদ্দেক লোক সব বুঝে গেছে। নাক সিঁটকে না থাকলে ছোট হয়ে যাবে মনে করে নাকের আকৃতিই পাল্টে ফেলল তারা। ভাল করে তলিয়ে বোঝার সময় কোথায় তাদের ?'

'আজ্ঞে, আমি সত্যি বুঝতে পারিনি।'

'অনেকদিন চতুরঙ্গ পড়নি তাহলে।'

'না, তা নয়। আজকাল একই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন লেখক বছরের পর বছর ঘুরিয়ে-ফিরেয়ে লিখে যাচ্ছে। আমরা ধরতেও ধরতে পারি না বলে হাল ছেড়ে দিয়েছি।'

'একই বিষয় ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'লেখা তো হবে মানুষকে নিয়ে। মানুষই বিষয়। সেটা তো এক হতে বাধ্য। তবে কি বলছে, বলার ধরনটা কেমন তার ওপর লেখকের মুন্সিয়ানা নির্ভর করছে। আমি যখন লিখতে শুরু করলাম তখন বিহারীলালের কবিতা ছিল আধুনিক। তারপর কত এলেন, কত গেলেন। খেয়ালও করিনি। জীবনানন্দ, সুধীন, বিষ্ণু। সবাই নিজের মত লিখেছে। আমি আমার মত।'

'আপনি সুনীল-শক্তির কবিতা পড়েছেন ?'

'পড়িনি। শুনেছি। বেশ ভাল। ওদের পরে কেউ নাম করেনি ?'

'হ্যাঁ। জয়। ভাল লিখছে। অল্প বয়সে। মালতীমালা বালিকা বিদ্যালয়—।'

'কবিতার নাম ?'

'আজ্ঞে। কেউ কেউ বলে 'সাধারণ মেয়ে' কবিতার আদর্শে লেখা।'

'আদর্শ তো থাকবেই। বিহারীলাল একসময় আমার আদর্শ ছিলেন না ? তবে জানো, আমার আগের বা সময়ের কবিতার চেয়ে আমি অন্যরকম লিখেছি। আমার পরে কিন্তু মন্দ লেখা হচ্ছে না। উপন্যাস আমি যা লিখেছি তার থেকে অনেক ভাল লিখেছে তারাশংকর। এমনকি বঙ্কিমের উপন্যাস আমার চেয়ে ভাল। ছোটগল্পও অনেক ভাল লেখা হয়েছে।

হয়নি প্রবন্ধ। হয়নি গান। এই একটা ব্যাপারে আমার বড় সুবিধে। আজকের কবিরা তো গান লেখেন না। তাই আমি যা লিখেছি তাই আধুনিক হয়ে আছে যদ্দিন তোমাকে কেউ হারিয়ে না দিচ্ছে ততদিন তুমি অপরাজিত। তাই না?' তিনি হাসলেন।

'আপনার গান আমাদের জীবন।'

'তাই নাকি? কি জানি! তবে ওগুলো কি শুধুই গান? কবিতা নয়?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে সেই কবিতা আধুনিক। কি বল?'

'নিশ্চয়ই।'

'তোমাদের তো অনেক পাঠক। তারা তোমাদের সম্পর্কে কি ভাবে?'

'বুঝতে পারি না। বই বিক্রী হয়, তারা বইমেলায় অটোগ্রাফ নেয়, এই পর্যন্ত।'

'বুঝতে চেষ্টা কর।'

'কিভাবে?'

নিজের লেখা তিনবার পড়ার চেষ্টা কর। যদি বিরক্তি আসে তাহলে বুঝবে পাঠকও তোমায় ভুলতে বেশী দেরি করবে না। আকাশ দেখেছ?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আকাশের চেহারা কি রকম?'

'এক এক সময় এক এক রকম।'

'ঠিক। লেখা হবে তাই। পাঠক যতবার পড়বে ততবার এক এক রকম মানে আবিষ্কার করবে।

'আপনি এখন কি লিখছেন?'

'কিছু না।'

'সেকি? কেন?'

'কিছুদিন আগে এরা আমাকে 'শেষের কবিতা' পড়ে শোনাল। এমন বানানো সাজানো লেখা আমিই লিখেছি ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল।'

'সেকি? আপনি একথা বলছেন? শেষের কবিতা তো জনপ্রিয় উপন্যাস।'

'একজন লেখকের সবচেয়ে শত্রু হল ওই জনপ্রিয় লেখা লেখবার ইচ্ছে।

www.boiRboi.blogspot.com

আচ্ছা, চারদিন ধরে দুর্গোপুজো হয়। দেবীর সামনে ভিড় জমে কোন্ সময় ?'

'অঞ্জলির সময়।'

'হল না। কজন অঞ্জলি দেয় ? ভিড় জমে সন্ধ্যেবেলা, আরতির সময়। ঢাকঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা, সাজগোজ আর ধুনুচিনৃত্য। দেবী ধোঁয়ায় ঢাকা। সেইসময় আর যাই হোক ভক্তিভাব চলে যায়। জনপ্রিয়তা হল সেই জিনিস। কিন্তু মধ্যরাত্রে সব যখন শুনশান, মণ্ডপে দেবী যখন একা তখন তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াও, নিজেকে বুঝতে পারবে। কজন যায় ?'

সেবক এসে তাঁকে জানাল এবার ওঠা দরকার। সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

প্রণাম জানিয়ে আমি বিদায় নিলাম।

কলকাতায় ফিরে তাঁর শেষ উপন্যাস আবার পড়লাম। চতুরঙ্গ কিনা জানি না কিন্তু মনে হল আমার লেখা বন্ধ করা উচিত। ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনাল খেলার পাশের মাঠে যদি মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা চলে তাহলে খেলোয়াড়রা কি নিজেরাই লজ্জিত হয়ে খেলা বন্ধ করে দেবে না ?

মুশকিল হল লজ্জিত মানুষেরা জেদী হয়ে নিজেকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করে। আমরা তো লজ্জিত হবার বোধই খুঁজে পাই না।

www.boiRboi.blogspot.com

রাত ১টায় রাতের খাবার শেষ করেন নির্মলেন্দু। টেবিলের ওপাশে স্ত্রী বসে থাকেন চুপচাপ। খাওয়া শেষ হলে দশ মিনিট ছাদে হেঁটে এসে বিছানায় চলে যান। আজ একটু অন্যরকম হল। স্ত্রী বললেন, 'তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

নির্মলেন্দু ওষুধ কোম্পানীর জাঁদরেল সাহেব ছিলেন। ছয়মাস আগে অবসর নিয়েছেন। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। স্ত্রী কিন্তু কিন্তু করে বললেন, 'রোজ সিনেমায় না গেলেই কি নয়?'

নির্মলেন্দু সোজা হলেন। খানিক চোখ বন্ধ রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার কে বলল?'

'ছোটখোকা।' স্ত্রী নিচু গলায় জানালেন।

'হুম।' উঠে গেলেন নির্মলেন্দু। হাতমুখ ধুয়ে সোজা অন্ধকার ছাদে। এখনও ছেলেরা বাড়ি ফেরেনি। সল্টলেকের এই বাড়ি তারই টাকায় তৈরি। বড় ছেলের স্ত্রী এই বাড়িতে থাকতে চান না। কিন্তু তাঁর স্বামীর জন্য সেটা পারছেন না। ছোট ছেলে এখনও বিয়ে করেনি। করলে একই অবস্থা হতে পারে।

এখন প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃভ্রমণে যান নির্মলেন্দু। সাদা কেডস্ এবং শর্টস গেঞ্জি পরে। ফিরে এসে চা খান, কাগজ পড়েন এবং বাথরুমে ঢোকেন। দাড়ি কামানো, স্নান সেরে এসে একেবারে তৈরী হয়ে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে যান। ঠিক নটা নাগাদ পুরোদস্তুর পোশাক পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ফেরেন ঠিক ছটায়। বাড়ি ফিরে পরিস্কার হয়ে এক কাপ চা আর সামান্য কিছু খেয়ে বই নিয়ে বসেন। রাত নটায় রাতের খাবার। স্ত্রী বলেছিলেন অবসর নেবার পর নিত্যদিন এভাবে বেরুনো কেন? তিনি কি নতুন করে কোথাও চাকরি নিয়েছেন? জবাব দেননি নির্মলেন্দু। চাকরি যতদিন ছিল ততদিন কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করার সাহস স্ত্রীর ছিল না।

আগে অফিসের গাড়ি আসতো দরজায়। এখন হেঁটে টার্মিনাসে যান। প্রয়োজন হলে দুটো বাস ছেড়ে দিয়ে লাইনে দাঁড়ান সিট পাবার

www.boiRboi.blogspot.com

জন্যে। ডালহৌসিতে নেমে ধীরে ধীরে ফুটপাত ধরে চক্কর মারেন কয়েকটা। এতবছর এ পাড়ায় এসেছেন কিন্তু ডালহৌসিটাই ভাল করে দেখার সুযোগ পাননি। এখন দেখছেন। ফুটপাতে মানুষ হাঁটতে পারে না। এত ভাঙাচোরা, নোংরা জানা ছিল না। রাজভবনের দিকটায় তবু হাঁটা যায়। এগারটা নাগাদ তিনি ইডেন গার্ডেনে পৌঁছে যেতেন। সেখানে বসে থাকতেন ঠিক পাঁচটা পর্যন্ত। সেই ছেলেবেলায় তিনি ইডেনে আসতেন মিলিটারিদের ব্যাণ্ড শুনতে। আর আসা হয়নি প্যাগোডার কি দুরাবস্থা। তবু গাছপালার মধ্যে বসে থাকাটা খুব খারাপ লাগত না। আশেপাশের গাছতলায় রোজ নতুন নতুন প্রেমিক-প্রেমিকার ভিড়। সবাই নিম্ন অথবা মধ্যবিত্ত। স্কুলের মেয়েও আছে। প্রথম প্রথম খুব রাগ হত। একটানা সকাল এগারটা থেকে সমানে প্রেম করে গেলে দেশ তাদের কাছে কি পাবে? শেষ পর্যন্ত এসব উপেক্ষা করেছিলেন। তখন ঘুম আসত। ঘুমালে সময় দিব্যি চলে যেত।

এক রাত্রে স্ত্রী বললেন, 'বড় খোকা খুব রাগ করছিল।'

'কেন? তার আবার কি হল?'

'তুমি দুপুরে ইডেন গার্ডেনে গিয়েছিলে?'

হকচকিয়ে গিয়েছিলেন নির্মলেন্দু। উত্তরের অপেক্ষা না করে স্ত্রী বলে গেলেন, 'ওর অফিসের লোকজন কি সব সার্ভে করার জন্য ওখানে গিয়েছিল। তাদের একজন তোমাকে চিনতে পারে। তুমি ঘুমোচ্ছিলে বলে ডাকেনি। বড় খোকা বলছিল, কাজকর্ম নেই যখন তখন বাড়িতেই ঘুমালে ভাল হয়।'

চোয়াল শক্ত হয়েছিল নির্মলেন্দুর কিন্তু মুখে কিছু বলেননি। তবে রোজ বেরিয়ে যাওয়ার পিছনে যে রহস্য ছিল তা এদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়াতে একটু খারাপ লেগেছিল। কিন্তু পরের দিনও ঠিক নটায় সেজে গুজে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। হাঁটাহাঁটি করে মেট্রো সিনেমায় দুপুরের ছবি দেখে সময় কাটালেন ভালভাবে। কিন্তু কি ছবি? চোখ খোলা রাখতে ইচ্ছে করছিল না। তবে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে তাঁকে চিনে ফেলবে কেউ এমন সম্ভাবনা নেই বলে প্রতিদিন বাড়ি ফেরার আগে ধর্মতলা অঞ্চলের সমস্ত সিনেমার নুন এবং ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট আগাম কেটে ফেলতে লাগলেন।

একবার না জেনে কাটার ফলে সোসাইটি প্রেক্ষাগৃহের তামিল

www.boiRboi.blogspot.com

ছবিতেও গিয়েছিলেন তিনি, তবে চোখ বন্ধ করে বসে থাকলে ছবি নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। তখন ছবি সামনে নেই আর শব্দ ধীরে ধীরে কান থেকে সরিয়ে ফেললেই চমৎকার ঘুম, শুধু সতর্ক থাকতে হয় যাতে পাশের লোক সেটা বুঝতে না পারে। দুবার এই অবস্থায় তাঁকে কিঞ্চিত কথা শুনতে হয়েছে। কি মশাই, টিকিট কেটে হলে এসে ঘুমাচ্ছেন?

আজ ছাদে পায়চারি করতে করতে ঠোঁট কামড়ালেন নির্মলেন্দু। ওরা কি খুব হাসাহাসি করছে এই নিয়ে? তিনি যে সিনেমায় গিয়েছেন তা ছোট খোকা জানল কি করে? কাজ ফেলে সেও যাচ্ছে নাকি? ওই বয়সের ছেলেদের বেলা বারোটার শোয়ে তিনি দেখেছেন বটে কিন্তু তাঁর ছেলে—! স্ত্রী বললেন, রোজ রোজ না গেলে নয়? রোজ যে যাচ্ছেন এই তথ্য কোথায় পেল ওরা।

পরদিন ঠিক নটায় বের হলেন নির্মলেন্দু। বেরুবার আগে মনে হচ্ছিল প্রথমে স্ত্রী, পরে ছোট খোকা তাঁকে কিছু বলবে। কিন্তু তিনি মোটেই আমল দিলেন না। গম্ভীর মুখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে টার্মিনাসে চলে এলেন। এবং সেখানে হরিপদবাবুর সঙ্গে দেখা। খুব বিচলিত অবস্থা ভদ্রলোকের। পাড়ার লোকদের সঙ্গে এতকাল নিরাপদ দূরত্ব রাখতেন তিনি। রাসভারী অফিসার হিসেবে সবাই তাঁকে জানে। তবু হরিপদবাবু কথা বললেন, 'রায়সাহেব, আপনার সঙ্গে কি মেডিক্যাল কলেজের কারো চেনা আছে?'

'মেডিক্যাল কলেজ? কেন?' অবাক হলেন নির্মলেন্দু।

'আর বলবেন না, আমার ভাই ওখানে কাল রাত্রে ভর্তি হয়েছে। হঠাৎ হার্ট এ্যাটাক, মাঝ রাতে, ভোরে জেনে এসেছি এমার্জেন্সিতে ফেলে রেখেছে, বললে কোন বেড খালি নেই, কি যে করি!' হরিপদবাবু বিচলিত।

মনে মনে মেডিক্যাল কলেজের কাউকে খুঁজে পেলেন না নির্মলেন্দু। হ্যাঁ, বেলভিউ বা ক্যালকাটা হসপিটাল হলে এখনই দু'দশটা নাম বলে দিতে পারতেন। তার পর্যায়ের অফিসারদের ওসব জায়গায় ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। হরিপদবাবুর দিকে তাকালেন তিনি। ওষুধ কোম্পানীর বড়কর্তা হিসেবে অনেক বিখ্যাত ডাক্তারকে তিনি চিনতেন। বললেন, 'চলুন দেখি'।

হরিপদবাবু অবাক, 'আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?'

'আপনি বিপদে পড়েছেন, তাই না ?'

আজ রুট বদল করতে হবে। পকেটে নুন শোয়ের টিকিট যা তিনি অ্যাডভান্স কেটেছিলেন, মেডিক্যাল কলেজের সামনে নামতে প্রচণ্ড কষ্ট হল। এত ভিড় ঠেলে গুঁতোগুঁতি করে কখনও নামেননি তিনি। হরিপদবাবু বারংবার বলছিলেন তাঁর জন্যে নির্মলেন্দুর খুব কষ্ট হচ্ছে। নির্মলেন্দু কিছু বললেন না।

এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ঢুকে নির্মলেন্দু হতবাক। এই নোংরা পরিবেশে প্যাসেজের মধ্যে পাশাপাশি কিছু অসুস্থ মানুষকে ফেলে রেখেছে ওরা। একটি স্বাধীন আধুনিক রাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা! সারা জীবন আয়কর দেওয়া একটা লোক এখানে এসে সরকারের কাছ থেকে একটু ভাল পরিবেশ আশা করতে পারে না? হরিপদবাবুর ভাইয়ের মাথার পাশে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রমহিলা হাওয়া করছেন। সম্ভবত স্ত্রী। কাতর গলায় বললো, সকালে বড় ডাক্তার রাউণ্ডে এসে একবার দেখে গিয়েছেন কিন্তু চিকিৎসা তেমনভাবে শুরু হয়নি। নির্মলেন্দু বুঝলেন এদের লোকবলও নেই। ঠিক তিন হাত দূরে শোওয়া এক রুগী এমনভাবে কাঁকিয়ে উঠল যে তিনি প্রায় ছিটকেই বাইরে চলে এলেন।

রুমালে ঘাড় মুছলেন নির্মলেন্দু। দরিদ্র মানুষেরা তাদের আত্মীয়-দের সুস্থ করতে এসে ভিড় জমিয়েছেন চারপাশে। কি করা যায়? নির্মলেন্দু হাঁটতে হাঁটতে একটা বোর্ড দেখে ভেতরে ঢুকলেন। দুজন বসেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন বড়কর্তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে কি করতে হয়? একজন ভেতরের দরজা দেখালো, 'ওখানে আর. পি. আছেন। চলে যান।'

নির্মলেন্দু সেই দরজায় পৌঁছে ইংরেজীতে প্রশ্ন করলেন, 'ভেতরে আসতে পারি?'

মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আর একজনকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, মুখ ফিরিয়ে মাথা নাড়লেন। নির্মলেন্দু ভেতরে ঢুকে বললেন, 'আমি নির্মলেন্দু রায়। কিছুদিন আগেও চাকরি করতাম। এখন অবসর প্রাপ্ত নাগরিক। আপিন?'

'আমি এই হাসপাতালের রেসিডেন্সিয়াল ফিজিসিয়ান। কোন সমস্যা থাকলে বলতে পারেন। বলুন।'

'গুড। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের ভাই গত রাত্রে অসুস্থ

www.boiRboi.blogspot.com

হয়ে এই নরকে পড়ে আছেন। তাঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব কি ?'

আর. পি. হাসলেন, 'সুচিকিৎসা নিশ্চয়ই করা হবে বা হচ্ছে। তবে আপনি যাকে নরক বললেন সেটাকে স্বর্গে পরিণত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যখন সমস্ত দেশ এই শহরটা বিশৃঙ্খলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে তখন আমার একার চেষ্টায় হাসপাতালে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা অসম্ভব।'

'বাট ইউ আর পেইড ফর দ্যাট।'

'ঠিকই। কিন্তু দশটা সিটের হাসপাতালে যদি একশটা রুগী আসেন তাহলে হয় নব্বইজনকে ফিরিয়ে দিতে হয়, নয় তাঁদের চিকিৎসার সুবিধে দেবার জন্যে এই ব্যবস্থা মানতে হয়। যারা এখানে কাজ করেন তারা যদি মনে করেন অন্য পাঁচটা সরকারি চাকরির সঙ্গে এর কোন পার্থক্য নেই তাহলে পরিবেশের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। কি হয়েছে আপনার পেসেণ্টের ?'

'শুনলাম হার্ট এ্যাটাক হয়েছে।'

আর. পি. উঠলেন। নির্মলেন্দুকে নিয়ে সোজা পৌঁছে গেলেন হরিপদবাবুর ভাইয়ের কাছে। পরীক্ষা করলেন। তারপর একটু এগিয়ে আর একটা ঘরে পৌঁছে হাউস সার্জেনকে ডেকে প্রশ্ন করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নির্মলেন্দুকে বললেন, 'আমি আপনাকে এটুকু বলতে পারি চিকিৎসার ত্রুটি হচ্ছে না। আমাদের কাছে যথেষ্ট ওষুধপত্র আছে। যদি অন্য কিছু পরীক্ষার দরকার হয় তবে আপনারা তাতে সাহায্য করবেন। হাসপাতালেও ব্যবস্থা আছে কিন্তু আনঅফিসিয়ালি করলে ব্যবস্থা দ্রুত নেওয়া যাবে। আর পেসেন্টের যা কণ্ডিশন তাতে নাড়াচাড়া করা ঠিক নয়। একটু ভাল বুঝলে বেডের কথা ভাবা যাবে। নমস্কার! আর. পি. চলে গেলেন।

হরিপদবাবু সব শুনছিলেন। এবার গদগদ গলায় বললেন, 'উঃ, তবু স্যার আপনার জন্যে এসব শুনতে পেলাম। আমি তো থৈ পাচ্ছিলাম না।'

সারাটা দিন হরিপদবাবুর ভাইকে নিয়ে কেটে গেল। অসুস্থ মানুষের চিকিৎসায় সাহায্য করতে প্রচুর উৎসাহ দরকার। নির্মলেন্দু সেটা দেখালেন। এবং এরই মধ্যে আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ, যাঁর স্ত্রী এমার্জেন্সিতে ভর্তি হয়েছেন সাতদিন জ্বরে ভুগে। বুকে

www.boiRboi.blogspot.com

নিমোনিয়া হয়েছে। লোকবল নেই। ডাক্তার তাঁর রক্ত পরীক্ষা করতে দিয়েছেন। তিনি সেটা জমা দিতে তালতলায় গেলে রুগী একা পড়ে থাকবেন। নির্মলেন্দু আগবাড়িয়ে সেটা নিয়ে ছুটলেন। বিকেলে দুই রুগী নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করলেন তিনি। দেখা গেল দুটি পরিবারের সঙ্গে একদিনেই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন নির্মলেন্দু। বিকেলে আত্মীয়াকে দেখতে আসা ভিজিটররা তাঁকেই প্রশ্ন করছেন অসুস্থতা সম্পর্কে। সারাটা দিন বেশ উন্মাদনার সঙ্গে কেটে গেল। ক্রমশ মেডিক্যাল কলেজের নোংরা পরিবেশ অভ্যেসে এসে যাচ্ছিল। তিনি দেখলেন এখানকার হাউস সার্জেন, ডাক্তার, পেসেণ্ট নিয়ে খুব ভাবেন। একটি দাড়িওয়ালা হাউস সার্জেনের কাজ দেখে তিনি তো মুগ্ধ।

আজ বাড়িতে ফিরতে দেরি হল। গম্ভীর মুখে বাথরুমে ঢুকে গেলেন তিনি। স্নান করলেন। খুব ক্লান্ত লাগছিল। কাল ওই ভদ্রমহিলার রিপোর্ট পাওয়া যাবে। সকালে সরাসরি তালতলায় চলে যাবেন তিনি রিপোর্ট নিতে। একটা বাচ্চা ছেলে ভর্তি হয়েছে। নাক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। কেসটা কি?

রাত্রে খাবার খেতে বসলেন তিনি। স্ত্রী সামনে। এই সময় হরিপদ-বাবু এলেন। স্ত্রী উঠে গেলেন। ফিরে এসে জানালেন, 'হরিপদবাবু এসেছেন? ওঁর ভাইকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে গিয়েছে বললেন।'

'উনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন?' নির্মলেন্দু জানতে চাইলেন।

'না। কি ব্যাপার?'

নির্মলেন্দু অনেকদিন বাদে হাসলেন, 'তোমার খোকারা এখন থেকে আর আমার ঠিকানা খুঁজে পাবে না! দিন কাটাবার চমৎকার উপায় খুঁজে পেয়েছি আমি। বুঝলে?'

www.boiRboi.blogspot.com

বিয়ের তিন মাস বাদে এক সকালে চা খেতে খেতে তিয়া বলল, 'শ্যাম, তোমাকে কিছু কথা বলা দরকার হয়ে পড়েছে।'

চায়ের সঙ্গে আনন্দবাজার পড়া ছয় পুরুষের অভ্যেস, তবু কথা-গুলো কানে যাওয়ামাত্র চমকে উঠল শ্যাম। এত মোলায়েম গলায় আজকাল কোন মেয়ে কথা বলে না। মোলায়েম গলায় স্ত্রীর কথা শুনতেন তার প্রপিতামহ। পুরাতত্ত্ব লাইব্রেরিতে ভিডিও টেপে সে ব্যাপারটা দেখে ও শুনে এসেছিল বিয়ের আগে। এখন যেন সেই গলা, নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

তিয়া বলল, 'স্বামী হিসেবে তুমি চলেব্‌ল। অ্যাট লিস্ট আমি যা বলি তা তুমি শোন। স্ত্রী হিসাবেও আমি খারাপ নই। কাজের জন্যে তুমি আমাকে ওয়ান ভোল্টের রোবট কিনে দিতে চেয়েছিল, আমি নিইনি।'

'আসলে দামী রোবট কিনতে পারিনি, বিয়ের আগেই তোমাকে বলেছিলাম। কম দামীটায় কিছু কাজ চালানো যেত; তুমি নিলে না।

'টাকাটা জমিয়েছি। এরপর তো কিনতেই হবে পাঁচ ভোল্টের রোবট। এখন তো কোন কাজ আটকে যাচ্ছে না, তুমি দারুণ কো-অপারেট করছ। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, স্বামী হিসেবে তুমি চলেব্‌ল কিন্তু আমার সন্তানের বাবা হিসেবে তোমাকে মানতে পারছি না।' তিয়া চায়ের কাপ শেষ করল।

'কেন?' শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল শ্যামের।

'তোমার পেডিগ্রি দ্যাখো। তোমার বাবা সাধারণ লোক ছিলেন, তাঁর বাবা এমন কিছু করেননি যা তুমিও মনে রাখতে পার। তাঁর বাবা শুনেছি অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন, তুমিই বলেছ। তাঁর বাবা নাকি এই আনন্দবাজারেই গল্প লিখতেন। অথচ এখনকার আনন্দবাজারে তাঁর নাম কখনোই উল্লেখ করা হয় না। এই ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে তোমার সন্তান কি হতে পারে। সাধারণ একটি মানুষ। তাই না?'

মাথা নাড়ল শ্যাম, 'হুঁ।'

'তোমরা সন্তান কিরকম হলে তুমি খুশি হও?'

www.boiRboi.blogspot.com

'খুব নামকরা একজন বিজ্ঞানবিদ্। দারুণ আবিষ্কার করবে।'

'ওই পেডিগ্রিতে কোন চান্স নেই। আমিও একটি দারুণ সন্তানের মা হতে চাই। সারা জীবন গর্ব করতে পারব।' তিয়া উঠে এসে শ্যামের শরীরের সঙ্গে নিজের মাপা শরীর ঘনিষ্ঠ করে বলল, 'আমি, তোমাকে খুব প্রাউড ফাদার করতে চাই। তোমার মন খারাপ শুরু হয়ে গেছে তো! বারো ঘন্টা থাকবে, তারপর আবার এ নিয়ে আমরা কথা বলব। আজ ছুটির দিন। কোথাও বের হবো না, এই বারো ঘন্টা আমি তোমাকে চোখে চোখে রাখব।' তিয়া শ্যামের মাথায় হাত বোলালো।

দেড়শ বছর আগেও পৃথিবীর মানুষের মন একবার খারাপ হলে কিছুতেই ভাল হতে চাইত না। আত্মহত্যা, যুদ্ধ, খুন—অনেক কিছু করে ফেলত সেই অবস্থায়। তখন মন ছিল ভারি স্যাঁতসেতে, শ্রাবণের রাস্তাঘাটের মত, কাদা প্যাচপেচে।

কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্রা যেসব অসাধ্যকে সাধ্যে এনেছেন তার মধ্যে একটি হল মানুষের মন কখনই বারো ঘন্টার বেশি খারাপ থাকছে না। জন্মাবার সময় আর ট্রিপল অ্যান্টিজন পোলিও ভ্যাকসিন প্রয়োজন পড়ছে না। তার বদলে অন্য কয়েকটি ওষুধ দেওয়া হয়। ওরই একটার ফল হল বারো ঘন্টা কাটিয়ে দিতে পারলে মন একদম চৈত্রের দুপুরের মত তপ্ত হয়ে যায়। গরম হৃদয় যাকে বলে। বিজ্ঞানবিদ্রা চেষ্টা করছেন যাতে সময়টা আরও কমানো যায়। বারো ঘন্টার মন খারাপে কিছুদিন আগে দুটো দেশের মধ্যে যুদ্ধ লাগব লাগব হচ্ছিল। সময়টা কেটে যেতেই শান্তি এসেছে।

সেইদিন রাত এগারোটার সময় শ্যাম টিভি দেখছিল। এখন কলকাতায় বসে সাতানব্বুইটা চ্যানেল ধরা যায়। আইরিশ ফোক সঙ শুনছিল সে। নাইনটিনথ সেঞ্চুরির গান। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা তিয়াকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তিয়া, তুমি কবে মা হতে চাও?'

'ফাইভ ভোল্টের রোবটটা কিনতে পারলেই।'

'সেটা তো আমরা ইনস্টলমেন্টেও কিনতে পারি।'

'এখন পারি। টাকাটা আমি মাসে মাসে দিতে পারব। গত মাসেই তো দুজনের ইনক্রিমেন্ট হয়েছে। খুব ভাল বলেছ।'

www.boiblogspot.com

শ্যাম খুশি হল। তিয়া প্রশংসা করলে তার খুব ভাল লাগে।

তিয়া একটু ভেবে বলল, 'আমার বয়স এখন আঠাশ। আর তিরিশ বছর আমার যৌবন থাকবে। তার মধ্যেই ওকে বিখ্যাত হতে হবে।'

শ্যাম টিভির চ্যানেল পাল্টালো। কোপেনহেগেন। স্পষ্ট আসছে। ডেনিশ ভাষায় কোন আলোচনা সভা চলছে। হঠাৎ ইংরেজিতে সাব টাইট্‌ল ফুটল। 'খুব জরুরী ঘোষণা করা হচ্ছে। আজ কোপেনহেগেনে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানবিদ্‌ সম্মেলনে আমেরিকার বিজ্ঞানবিদ্‌ যোশেফ পয়টার একটি আলোড়ন তোলা আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানবিদ্‌রা তা মেনে নিয়েছেন।'

তিয়ার নজর টিভির ওপর পড়েছিল। সে বিছানা থেকে নেমে শ্যামের পাশে এসে বসল। একজন কালো আমেরিকান এবার ক্যামেরায়। তিনিই যোশেফ পয়টার। ছিপছিপে, পঞ্চাশের মধ্যে বয়স। যোশেফ ইংরেজিতে বললেন, 'আমি এই পৃথিবীর মা এবং বোনদের জন্যে একটা চমৎকার খবর পরিবেশন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। সন্তান জন্মাবার আগে মাতৃগর্ভে দশমাস সময় কাটাতে বাধ্য হত। আর এই সময়টা হবু মায়েরা অত্যন্ত কষ্টে কাটাতেন। শেষের কয়েক মাস তাঁদের প্রায় জড়ভরত হয়ে থাকতে হত। গত দশ বছর ধরে আমি চেষ্টা করেছিলাম এই সময়টাকে কমানোর জন্যে। আমার বিশ্বাস হয়েছিল ভ্রূণ থেকে পূর্ণ মানুষ করতে প্রকৃতি বড্ড বেশি সময় নিচ্ছে। আমি শেষ পর্যন্ত এই সময়টাকে কমিয়ে তিন মাসে আনতে সক্ষম হয়েছি। এখন থেকে আর কোন মাকে বাড়তি সাত মাস কষ্ট করতে হবে না। এর ফলে মায়েদের কাজের ক্ষমতা এবং অন্যান্য সৃজনশীলতা বহুগুণ বেড়ে যাবে বলে বিশ্বাস।'

যোশেফকে জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁর স্ত্রী কি করেন? তিনি বললেন, 'মার্থা বিজ্ঞানচর্চা করে। তার বিষয় রোবট।' পর্দায় এবার তিন মাসে মা হওয়া এক আমেরিকান যুবতী এবং তার সন্তানকে দেখানো হল।

খবরটা শেষ হওয়ামাত্র উল্লাসে চিৎকার করে তিয়া লাফ দিল। তারপর শ্যামকে জড়িয়ে ধরে তিনপাকে নেচে নিল, 'উঃ, কি ভাল, কি ভাল।'

শ্যাম গদগদ গলায় বলল, 'তুমি সাত মাস গেইন করছ।'

'গ্র্যান্ড।' তিয়া শ্যামকে আদর করল, 'সাত মাসে বাচ্চাটাকে আরও অভিজ্ঞ করা যাবে। ওর জীবন সাত মাস বেড়ে গেল।

www.boiRboi.com

এই সময় টেলিফোন বাজতেই শ্যাম সেটা ধরে বলল, 'তোমার মা।'

'কর্ডলেস রিসিভার তুলে তিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'শুনেছ?'

'শুনছি। কি হবে রে!'

'কি আর হবে! বাঁচা গেল। তোমার কষ্টটা আমাকে ভোগ করতে হবে না।'

'দূর। তাড়াহুড়ো করে তিন মাসে নিয়ে এল, হাত পা না হয় ডেভলপ্ করালো, কিন্তু ব্রেন? ওইটে তো আসল। পরে ক্যাবলা হয়ে রইল। তুই বরং একটু অপেক্ষা কর। ধর, বছর তিনেক। বাচ্চাগুলো জন্মাক, কি হয় দ্যাখ, তারপর বুঝে-সুঝে সিদ্ধান্ত নিস। বুঝলি?'

মা, তুমি এখনও প্রাগৈতিহাসিক রয়ে গেলে।

'শ্যামু কি বলছে?' মায়ের গলা পাল্টে গেল।

'ওর মন খারাপ ছিল বারো ঘণ্টা। এখন ঠিক হয়ে গিয়েছে।'

কলকাতা শহরে এখন আটটা স্পার্ম ব্যাঙ্ক আছে। ওরা পরদিন বিকেলে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে গেল। সুবিধে হল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক কম্পুটারে অন্যান্য ব্যাঙ্কের স্টকের বিবরণ দিয়ে দেয়। সাধারণত তিন মাসের বেশি ব্যাঙ্ক ওগুলো প্রিজার্ভ করে না। কি ধরনের মানুষ, তাদের জীবন এবং কাজ কিরকম ছিল তা পর্দায় দেখানো হচ্ছে। আরও কয়েকজন মহিলা রয়েছেন সেখানে। ওরা দুজন বসে পড়ল। বিভিন্ন মানুষের স্তর অনুযায়ী দাম ঠিক করা আছে। কোনটাই পছন্দ হচ্ছিল না ওদের। এই শহরে সবচেয়ে বড় যিনি বিজ্ঞানবিদ্ তিনি দৃষ্টিশক্তি খারাপ হলে চশমা অথবা কণ্ট্যাক্ট লেন্স ছাড়াই শুধু একটি প্রত্যহসেব্য ট্যাবলেটের মাধ্যমে দৈনিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন। এঁকে পছন্দ হল না তিয়ার। তারপরে যার ছবি ফুটে উঠল তাকে দেখেই এক মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমি একেই চাই।'

সেলসম্যান আঁতকে উঠল, 'কি বলছেন ম্যাডাম? এই লোকটা খুনী!'

'আপনারা রেখেছেন কেন?'

'স্রেফ মজা করার জন্যে। গতমাসে ওর প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে।'

'জানি। কিন্তু আমি ওরটাই চাই।' মহিলা শক্ত গলায় বললেন।

'কিন্তু ম্যাডাম্ আপনার সন্তান খুনী হতে পারে!'

'আমি তো তাই চাইছি।' মহিলা হাসলেন।

www.boiRboi.blogspot.com

তিয়া আর শ্যাম বেরিয়ে এল বিরক্ত হয়ে। পর পর তিনদিন ওরা ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ রাখল, যদি নতুন কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু এমন কোন আশাও পাওয়া গেল না, যা তিয়াকে উজ্জীবিত করতে পারে। সে রেগে-মেগে বলল, 'যাচ্ছেতাই শহর এই কলকাতা।'

মাথা নাড়ল শ্যাম, 'ঠিক বলেছ। প্রতিভাবান মানুষের বড় অভাব।'

সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখল তিয়া। ঘুম ভাঙামাত্র সে সরকারি মনোবিজ্ঞান দপ্তরে টেলিফোন করল। আধঘণ্টার মধ্যে কর্মীরা এসে গেলেন। তিয়াকে ওদের বাড়িরই একটা সাদা দেওয়ালওয়ালা ঘরে নিয়ে গিয়ে অন্ধকার করে দেওয়া হল। তার আগে সম্মোহন শক্তি ইলেকট্রিক চার্জারের মাধ্যমে তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে চৈতন্য স্তিমিত এবং মানসিক অবস্থা রি-উইণ্ড করা শুরু হল। বিজ্ঞানীরা এইটুকুই করতে পেরেছেন। স্বপ্ন দেখার সময় কিছু করা সম্ভব হয়নি, তার চার ঘণ্টার মধ্যে সেই দেখা অংশটিকে মনের মধ্যে থেকে তুলে এনে দ্বিতীয়বার দেখার কায়দা এখন করায়ত্ত। ফলে ঘুমন্ত অবস্থার স্বপ্ন জেগে উঠেও দিব্যি দেখা যাচ্ছে। অতএব সামনের সাদা দেওয়ালে স্বপ্নের ছবি পড়ল। একটা সুন্দর মেয়ের গা ঘেঁষে একদল বক উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের কেউ ডিম পাড়ল। ডিম মাটির দিকে দ্রুত পতিত হচ্ছিল। কিন্তু মাঝপথে সেটি ফেটে গেল এবং তার শাবক শূন্যে ডিগবাজি খেয়েই পাখা নাড়তে নাড়তে পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ করল। এই হল স্বপ্ন।

স্বপ্নটা ভিডিও রেকর্ডারে ধরে তিয়াকে পূর্ণ চৈতন্যে ফিরিয়ে এনে দেখানো হল। এবার ব্যাখ্যা দেওয়া হল, তিয়া মা হতে চাইছে। সাম্প্রতিক আবিষ্কারের সুযোগ নিয়ে খুব অল্প সময়ে মা হতে চায় সে। এবং তার সন্তান অত্যন্ত দ্রুত গতিময় হোক এই বাসনা।

ব্যাখ্যা শুনে তিয়া খুব খুশি হল। একা হওয়ামাত্র সে শ্যামকে বলল, 'অ্যাই শোন, তুমি যোশেফকে ফোন করে একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট চাও।'

'কোন যোশেফ?' বুঝতে অসুবিধে হল শ্যামের।

'আঃ। তোমার মাথা এত ডাল হয়ে যাচ্ছে! এখন আমি যোশেফ পয়টার ছাড়া আর কারো কথা ভাবতে পারি? ভদ্রলোকের গায়ের রঙ ব্রাউন হলেও কি ছিপছিপে শরীর। আর মেধা? ভাবতেই পারা যায় না।' তিয়া চোখ বুজল।

www.boiRboi.blogspot.com

দুদিন বাদে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পাওয়া গেল। এখন কলকাতা থেকে নিউইয়র্ক পৌঁছতে মাত্র আট ঘণ্টা সময় লাগে। উনি অবশ্য থাকেন মায়ামির কাছে। ওরা সেখানে পৌঁছে সোজা বিচে চলে এল।

কয়েক শ' নারী পুরুষ প্রায় জন্মদিনের পোশাকে সূর্যের সমস্ত উত্তাপ শরীর দিয়ে শুষে নিচ্ছে। সেদিকে এক পলক তাকিয়েই তিয়া ঠোঁট ওল্টালো, 'বিজ্ঞান এত উন্নতি করছে অথচ মানুষের মনে প্রিমিটিভ নেচার রয়েই গেল।'

'প্রিমিটিভ?' শ্যাম জানতে চাইল।

'নয়তো কি? জন্তু-জানোয়ারের মত শুয়ে থাকা। ড্যাব ডেবিয়ে দেখো না হাঁদারাম! পিত্তি জ্বলে যায়!'

শ্যাম বালিতে চোখ রাখল। রেগে গেলে তিয়া টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরির কিছু নির্বাচিত শব্দ ব্যবহার করে। এগুলো ও পেয়েছে মায়ের কাছ থেকে, তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে! একটা সংস্কৃতির মত যুগ যুগ ধরে এইভাবে বেঁচে আছে।

যোশেফ পয়টারের নাম এখন মুখে মুখে। ওরা জানতে পারল বিয়ের আগে নাকি যোশেফের স্ত্রী মার্থা বেশি সম্ভাবনাময় ছিলেন বিজ্ঞানবিদ্ হিসেবে। যোশেফকে সাহায্য করার জন্যে নাকি তিনি নিজেকে পর্দার আড়ালে রেখেছেন। তিয়া শ্যামকে বলল, 'শুনে রাখ। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।'

সমুদ্রের ধারে খানিকটা ঘেরা জায়গায় যোশেফ পয়টারের বাড়ি। মূল দরজার বেল বাজাতে লাগল শ্যাম। মিনিট তিনেকেও কারও সাড়া নেই। হঠাৎ ওপরের ঘরের জানলা খুলে এক ভদ্রমহিলা, তাঁর কালো মুখে বিরক্তি নিয়ে বললেন, 'কাকে চাই?'

শ্যাম মিনমিন করল, 'মিস্টার পয়টার।'

'অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করা আছে?' খেঁকিয়ে উঠলেন মহিলা।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কানের মাথা খেয়েছে। বন্ধ ঘর থেকে আমি শুনতে পাচ্ছি আর উনি বাগানে বসে শুনতে পাচ্ছেন না। বাঁ-দিকের দরজাটা ঠেলে ভেতরে চলে যান। দড়াম করে জানলা বন্ধ হল।

খিড়কি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে কিছুটা হাঁটতেই দেখতে পেল একজন মধ্যবয়স্ক ছিপছিপে মানুষ খুরপি থেকে বালি খুঁড়ছেন। ওদের

www.boiRboi.blogspot.com

দেখতে পেয়ে উঠে এলেন তিনি। তিয়া চাপা গলায় বলল, 'দারুণ।'

আলাপ হবার পর তিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার মত এত বড় একজন মানুষ এসব ঘরোয়া কাজ করছেন?'

যোশেফ হাসলেন, 'আর বলবেন না। তিন তিনটে রোবটকে আমার স্ত্রীর জ্বালায় সরিয়ে দিতে হয়েছিল। এখন বাড়িতে কাজের রোবট নেই।'

'কেন? উনি কি রোবট পছন্দ করেন না?' তিয়া অবাক।

'বরং উল্টো। উনি বড্ড বেশি পছন্দ করেন। তবে তাদের কাজ করতে দেননি। তিনি তাদের বুকে হৃদয় ঢোকাবার চেষ্টা করছেন।'

'বাঃ।' উৎফুল্ল হল শ্যাম।

'আপনি বাঃ বললেন?' বিরক্ত হলেন যোশেফ, 'রোবটেরা যদি মন পায় তাহলে কি আর আমাদের কথা শুনবে? নিজেদের নির্যাতিত ভাববে। আর তারপরেই ইউনিয়ন, বিংশ শতাব্দীর ব্যাপার আমদানি করবে। আমি তাই এ-বাড়িতে রোবট ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছি। যন্ত্র যন্ত্র আর মানুষ মানুষই।'

তিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার ছেলেমেয়ে?'

'নাঃ, নেই। আমার শারীরিক কিছু বিচ্যুতি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' যোশেফ যেন এক মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

'কিন্তু আপনার স্ত্রী তো মা হতে পারেন।' শ্যামকে খুব উজ্জীবিত দেখাল।

মাথা নাড়লেন যোশেফ, 'পাচ্ছি না। খুবই দুঃখের ব্যাপার কিন্তু ঘটনাটা তাই। আমরা দু'জনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের সন্তান খুব সহজ সরল সাধারণ। সে তার নিজের মত বড় হবে। আমাদের জটিলতা রক্তে নিয়ে সে পৃথিবীতে আসবে না। ব্যাঙ্কে গেলে আপনি জটিল মানুষের স্পার্ম পাবেন। তাঁরা আর যাই হোন সরল হবেন না। গত বছর আফ্রিকায় গিয়েও আমরা সহজ মানুষ খুঁজে পাইনি। একটাও মানুষ পেলাম না যে জটিলতার বাইরে আছে। খুব স্যাড ব্যাপার।'

'আপনি সহজ সরল খুঁজছেন কেন?' কাঁপা গলায় জানতে চাইল তিয়া।

'দেখুন, এখন মাতৃগর্ভে থাকার সময় তিন মাস। ফলে জন্মানোর পরেই ওরা বেশি সময় পাবে নিজেকে গড়ার। সহজ সরল মানুষ তার

www.boiRboi.blogspot.com

স্বাভাবিক প্রকৃতিতে পথ খুঁজে নেবে। আমার বা কোন ডাক্তারের সন্তান একটি বিশেষ খাতে চলবে। যাক, আমার কাছে আপনাদের আসার কারণ জানতে পারি ?'

এবার শ্যাম বলল, 'ওঁর সাধ ছিল খুব বড় বিজ্ঞানবিদ্-এর সাহায্যে মা হতে'।

এই সময় ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল। নারীকণ্ঠের।

আতঙ্কিত যোশেফ দৌড়ালেন। পেছন পেছন ওরা। দেখা গেল মিসেস পয়টার লাফাতে লাফাতে একটি বন্ধ ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসছেন। স্বামীকে দেখামাত্র তিনি চেঁচিয়ে উঠে দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন, 'আমি পেরেছি, পেরেছি।'

'কি পেরেছ ?'

'রোবট !'

'মানে ? তুমি রোবট নিয়ে এসেছ ?' খেপে গেলেন যোশেফ !

'হ্যাঁ ! তুমি যখন বাইরে গিয়েছিলে।'

'তুমি, তুমি আমার অনুরোধ রাখলে না মার্থা ?'

'তুমি যে পরীক্ষায় আপত্তি করেছ তা কি আমি করতে পারি ?'

'ও।' যোশেফ হাসতে চেষ্টা করেন। 'থ্যাঙ্ক ইউ ! কিন্তু—?'

'আমি ওকে পুরুষ করেছি। ও একটা মানুষের মত, সেই প্রিমিটিভ মানুষের মত, সরল বাচ্চার বাবা হতে পারবে।' মিসেস পয়টার বলামাত্র যোশেফ তাঁকে জড়িয়ে ধরে আদর করে ছুটলেন টেলিফোনে খবর দিতে। মানুষের সৃষ্ট রোবট সরল মানুষের জন্ম দিতে পারবে। বিরাট আবিষ্কার।

তিয়া শ্যামের হাত ধরে টানল, 'অ্যাই, চল।'

'যাবে ? মানে—।' শ্যাম অবাক।

'ডাকছি, চল।' গম্ভীর মুখে বলল তিয়া।

'কিন্তু রোবটটাকে দেখবে না ?'

'রক্তমাংসের থাকতে আমি যন্ত্রের দিকে হাত বাড়াব কেন ? এসো।'

তিয়ার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল শ্যাম।

www.boiRboi.blogspot.com

অমরাবতীর দরজায়

দু'পকেটে দু' হাত ঢুকিয়ে দরজায় দাঁড়িয়েছিল নায়োরিবি। সামনে একটা ছোট্ট বাগান। বাগানের এক পাশ দিয়ে সিঁড়িটা নেমে গেছে রাস্তায়। সাউথ ব্রুকসের এই তল্লাটে বাড়িগুলো পরস্পরের সঙ্গে এমন গা লাগিয়ে যে কেঁচোর মত রাস্তাগুলোকে খুঁজে বের করাই মুশকিল। দরজায় দাঁড়াতেই এক ঝলক বাতাস এলো। নোন্তা নোন্তা বাতাস। পকেট থেকে হাত বের করল সে। বারো ডলার হতের মুঠোয়। এই ঘর খুঁজলে আর একটিও সেণ্ট পাওয়া যাবে না। সারা পৃথিবীতে তার সম্বল বারো ডলার।

চাতালে এসে দাঁড়াতেই সে পার্লকে দেখতে পেল। নিজের ঘরের জানালায় পার্ল একটা ব্রা পরে নিশ্চয়ই দাঁড়াতে পারে। কিন্তু পার্ল যা বলতে পারে তাই বলল, 'হাই হোয়াইটি!'

নায়োরিবির চোয়াল শক্ত হল। কিন্তু চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস নেওয়া ছাড়া সে যখন কিছুই করল না, তখন বিশ্রী রকমের একটা হাসি ছুঁড়ে পার্ল জানলা ছেড়ে চলে গেল। দিস ইজ ব্যাড, ভেরি ব্যাড। বিড়বিড় করল নায়োরিবি। এ পাড়ার সবাই তাকে বিদ্রূপ করে হোয়াইটি বলে ডাকে। ডেকে মজা পায়। যেসব ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় এবং সেখানে পড়াশুনা চালাবার জন্যে জেদ ধরে তাদের সবাই হোয়াইটি বলে ডাকে, ঠাট্টা করে। বিয়ারের খালি ক্যান ছুঁড়ে মারে। স্কুল শেষ করে নায়োরিবি যে আর একটু এগিয়েছিল সেটা মিসেস জোন্সের জন্যেই। বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। ভদ্রমহিলার বাড়ি বোস্টনে। পাঁচ বছরের মা-মরা সতীনপুত্রকে ভদ্রমহিলা অস্বাভাবিক ভাবেই ভালবেসে ফেলেন। হাইস্কুল শেষ করার পর নায়োরিবি যখন নাটকের কলেজে ভর্তি হতে চাইল তখনও তিনি আপত্তি করেননি। কলেজে গ্রাজুয়েশন কোর্সে ভর্তি হবার ক্ষমতা নায়োরিবির ছিল না। অত টাকা মিসেস জোন্স দশ ঘণ্টা কাজ করেও জমাতে পারেননি। ভদ্রমহিলা মারা গেলেন মাস তিনেক আগে। র‍্যালফ হাউসের সামনে গুলি চলছিল। বিকেলে পাড়ার একজন ক্যারিয়ার খুন হয় তার বদলা। মিসেস জোন্স তার

www.boiRboi.com

মধ্যে পড়ে গেলেন। হাসপাতালে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

দরজাটা বন্ধ করে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এল নায়োরবি। ছেলে-গুলো এখনই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। চোখাচুখি হতেই একজন চেঁচাল, 'হাই হোয়াইটি।'

নায়োরবি হাসল। তর্ক করে কোন লাভ নেই। ছুরি তো আছেই, পিস্তলও কেউ কেউ সঙ্গে রাখে। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল। ছেলেটা একটু প্রসন্ন হল। ওর নাম টিটো। এদের সে ছেলেবেলা থেকেই চেনে। টিটো চিৎকার করল, 'কামন হোয়াইটি! তোমাকে একটা সমাধান করে দিতে হবে।' টিটো সঙ্গীদের নিচু গলায় কিছু বলতে তারা মাথা দোলাল। রাস্তা পার হয়ে নায়োরবি ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জনা পাঁচেক। প্রত্যেকের চেহারা পোড় খাওয়া। টিটো জুলপির দুই ইঞ্চি কামিয়ে ফেলেছে। টিটো একটু ঝুঁকে দাঁড়াল, দ্যাখো হোয়াইটি, আমরা এই পাঁচজন, সবাইকে তুমি চেনো, চেনো তো? গুড! এই রাস্তাটা আমাদের। তোমার কাজ হল আমাদের গ্রেড ঠিক করে দেওয়া। স্ট্রীটনলেজ যার বেশি সে 'এ' গ্রেড পাবে, তারপর বি সি ডি ই। ওকে?'

নায়োরবির একই সঙ্গে মজা এবং ভয় লাগছিল। এখনও এদের ছেলেমানুষী গেল না। সেইসঙ্গে নিজেকে সি ডি ই হিসেবে ভাবতে কেউ চাইবে না আর না চাইলে হাত মুঠো হবে।

সে মাথা নাড়াল, 'আমি তো কোন ফারাক দেখছি না। তোমরা, যারা ক্র্যাক বিক্রি করে বেঁচে আছ তাদের প্রত্যেকেরই স্ট্রীটনলেজ খুব ভাল, নইলে ব্যবসাটা করতে পারতে না।'

'সিট! এটা এক ধরনের জ্ঞান দেওয়া। তোমাকে তার জন্যে ডাকিনি হোয়াইটি। যা বলছি তাই করো। বলতে বলতে টিটো ঘুরে দাঁড়াল, 'হেই লিমো, ওকে এ্যাডেণ্ট কর।'

নায়োরবি দেখল, স্টিফেনদের ফাস্টফুডের দোকানের পাশের গলির ছায়ায় দাঁড়ানো লোকটার দিকে এগিয়ে গেল লিমো। যারা কিনতে আসে তারাও জানে কোথায় পাওয়া যাবে, কি দাম দিতে হবে। এক মিনিটের মধ্যেই তাই লিমোকে ফিরে আসতে দেখা গেল শিস্ দিতে দিতে।

'ইয়া হোয়াইটি।' টিটো থুতু ফেলল।

www.boiRboi.com

'লুক টিটো, আমি কালো হয়ে জন্মেছি, আমি বেঁচে আছি কালো হয়ে, আমি মারা যাব কালো হিসেবেই। সুতরাং কেউ আমাকে হোয়াইটি বললে আমার ভাল লাগে না।'

'হু কেয়ার্স? তুমি শালা স্কুলে পড়েছ, আমাদের সঙ্গে মেশোনি, রাস্তায় দাঁড়াওনি। তুমি সাদাদের নকল করতে চাও! কোন কালো মেয়ে তোমার সঙ্গে শুয়েছে? উত্তর দাও?'

'না। তার কোন দরকার হয়নি।'

'শী উইল নেভার আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইউর লাঙ্গুয়েজ। উই ওয়াণ্ট মানি, উওম্যান এ্যাণ্ড গুড ফুড। দ্যাটস অল। আর এগুলো পেতে গেলে টেনসনে থাকতেই হবে। বুম বুম বুম। ওকে! এবার বল, আমাদের মধ্যে কাকে এ গ্রেড দেবে?' টিটো পা ফাঁক করে দাঁড়াল।

নায়োরবি পাঁচজনের মুখের দিকে তাকাল পরপর। হঠাৎই প্রত্যেকটা মুখ প্রচণ্ড শক্ত হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকের চোখের তারা এখন স্থির। এইভাবেই প্রায় অকারণে এরা উত্তেজিত হতে খুব ভালবাসে। উত্তেজনা ছাড়া এদের বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু সেই সঙ্গে আক্রমণের আশংকা নায়োরবিকে ভীত করল। সে গলা পরিষ্কার করল, 'তার আগে আমাকে তোমাদের সম্পর্কে জানতে হবে।'

লিমো চেঁচিয়ে উঠল, 'হাপ্! সময় নষ্ট করছে হোয়াইটিটা।'

টিটো হাত তুলল, 'এখন কিছুক্ষণ হোয়াইটি বলবি না। ওয়েল, কি জানতে চাও?'

চটপট মাথা পরিষ্কার করে নিল নায়োরবি, 'কে প্রথম খুন হতে দেখেছে? কে নিজে কটা খুন করেছে? ক্র্যাক বিক্রী করতে গিয়ে কে ক'বার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে? রাস্তায় কাজ করতে এসে তোমাদের কার কি মনে হয়েছে? এসব প্রশ্নের জবাব চাই।'

লিমো চেঁচাল, 'হোয়াইটিটা প্রিস্টের মত কথা বলছে!'

টিটো সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে পা চালাল। ঝট করে সরে গিয়ে নিজেকে বাঁচাল লিমো। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে অন্যদিকে তাকাল। টিটো এবার নায়োরবির দিকে এগিয়ে এল, 'তোমার কাছে কত ডলার আছে?'

'বারো ডলার।' ভয়ে ভয়ে জানাল নায়োরবি। সত্যিই বলাই ভাল।

'এটা যখন ফুরিয়ে যাবে তখন তুমি কি করবে?'

'আই ডোণ্ট নো।'

www.boiRboi.blogspot.com

'উইদাউট সাম ক্যাশ ইন ইওর পকেট ইউ এইণ্ট নোবডি !'

নায়োরবি চুপচাপ মাথা নাড়ল।

'তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছ না কেন ?'

'আই এ্যাম নট দ্যাট টাফ ! ইফ ইউ আর সফ্‌ট ইউ অ্যার লস্ট্‌।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসার আওয়াজ উঠল। পাঁচজনেরই কথাটাকে খুব পছন্দ হয়েছে।

টিটো বলল, 'ঠিক আছে, তুমি জোকে চেনো ?'

বাফেলো জোকে কে না চেনে এখানে ? চেহারার জন্যেই ওর খ্যাতি। ফর্টিসেকেণ্ড স্ট্রীটের একটা সেক্সশপে ডোরম্যানের কাজ করে জো। নায়োরবি মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

'আমি জোকে তোমার কথা বলব। তুমি আজ বিকেলে ওর সঙ্গে দেখা কর।' টিটো কথাটা বলতেই নিকিকে দেখতে পেল সবাই। এই ভরসকালেই থাই পর্যন্ত চামড়ার জুতো আর মিনি চামড়ার স্কার্ট পরে শরীর দুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। দলের একটা ছেলে শিষ দিতে দিতে নিকির সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'তোমার শুনলাম এইডস হয়েছে !'

সঙ্গে সঙ্গে শরীর বেঁকিয়ে তারস্বরে চিৎকার শুরু করল নিকি। পৃথিবীর সমস্ত কুৎসিত শব্দ একসঙ্গে ছুঁড়ে মারতে লাগল আকাশে। ছেলেরা হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগল তাই শুনে। আশেপাশের বাড়ির জানলার অলস মুখগুলোকে দেখা গেল এবার। গালাগাল দিতে দিতে নিকি চলে যেতেই সিটি বাজল। সঙ্গে সঙ্গে টিটোরা লাফিয়ে গলিতে নামল। চোখের পলক ফেলার আগেই তারা উধাও। নায়োরবি কি করবে বুঝতে পারছিল না এবং তখনই পুলিশের গাড়িটাকে সে দেখতে পেল। পেট্রল গাড়িটা থেকে একটা কালো অফিসার চেঁচিয়ে উঠল, 'গেট অফ দ্য কর্ণার।' নায়োরবি পা চালাল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নামল অফিসার গাড়ি থেকে, 'হে বয় ! স্টপ আই সে !' নায়োরবি দাঁড়াল। লোকটা তার সামনে পৌঁছালে সে কালো রিভলভারটাকে দেখতে পেল, 'ইউ আর স্লিঙ্গিং হেয়ার ?'

নায়োরবি চটপট মাথা নাড়ল, 'নো।'

'তাহলে এখানে কি করছ ?'

'আমি টেলিফোন করতে যাচ্ছি।'

'তুমি ওদের চেনো ?'

www.boiRboi.blogspot.com

'কাদের ?'

'এ্যাই তোমার পেটে এমন একটা লাথি মারব যে প্রশ্ন করা বেরিয়ে যাবে। দাঁড়াও।' অফিসার ঘুরে দাঁড়িয়ে সামনের বাড়ির জানলায় অলস মুখটাকে প্রশ্ন করল, 'হেই বাডি, ডু ইউ নো হিম ?'

'ইয়া ! দে কল হিম হোয়াইটি !'

সঙ্গে সঙ্গে মুখটা হাসিতে ফুলে উঠল অফিসারের, 'ওয়া !' তারপর ফিরে গেল পেট্রল গাড়ির দিকে। ঠোঁট কামড়াল নায়োরবি। কালো অফিসার বলেই মজা পেল কথাটা শুনে। সে হাঁটতে লাগল। টিটোর কথাটা তার মাথায় পাক খাচ্ছিল, 'উইদাউট সাম ক্যাশ ইন ইওর পকেট ইউ এইণ্ট নোবডি !'

রাস্তার মোড়েই বিগ ম্যাক-এর পাশে পরপর চারটে টেলিফোন। দুটোর বাক্স ভেঙে কেউ কয়েন কালেক্ট করে গেছে। দুটো এখনও সচল। পকেট থেকে কাগজ বের করে সে নাম্বার টিপল। সাড়া পাওয়ামাত্র সে মিসেস ওয়ার্ডের্র সঙ্গে কথা বলতে চাইল। মিসেস ওয়ার্ড লাইনে এলে সে নরম গলায় বলল, 'আমি নায়োরবি, নায়োরবি জোন্স। আমাকে আপনার মনে আছে ?'

'তোমার নাম্বার কি ?'

'ওয়ান জিরো টু ফোর।'

'হোল্ড অন।'

টেলিফোন ধরে থাকল নায়োরবি। বিপ বিপ শব্দ হতেই আবার পয়সা ফেলল। মিসেস ওয়ার্ডের্র গলা পাওয়া গেল, 'সরি নায়োরবি এখনও কোন খবর নেই।'

'আই নিড এ জব ম্যাম। আই উইল ডু গুড।'

'আই নো দ্যাট। তুমি আমাকে নেক্সট উইকে একটা ফোন করতে পার। ওহো, তোমার তো উনিশ বছর বয়স, তাই না ?'

'ইয়েস ম্যাম, উনিশ বছর বয়স, গায়ের রঙ জেড ব্লাক, চুল অবশ্য খুব কোঁকড়া নয়—।'

'দ্যাটস গুড। শোন, ইণ্ডিয়া বলে একটা দেশের নাম শুনেছ ?'

'কোথায় এটা ?'

'ইট্স পার্ট অফ এশিয়া। বিগ কাণ্ট্রি বাট ভেরি পুওর।'

'ও। আমাকে কি করতে হবে ?'

www.boiRboi.blogspot.com

'ইণ্ডিয়া থেকে একটা পার্টি এসেছে নিউইয়র্কে স্যুটিং করতে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। কিন্তু এরা বেশী পেমেণ্ট করতে পারবে না বলে আমি ইণ্টারেস্ট নিচ্ছি না। কিন্তু তোমার মত, লুক, এদের কাছে কাজ করলে তুমি কোন পয়েণ্ট আর্ন করবে না, তবে সামান্য কিছু ডলার পেতে পার।'

'বেশ, আমাকে তারই ব্যবস্থা করে দাও।'

'ওকে! ঘণ্টা দুয়েক বাদে টেলিফোন করো।'

রিসিভার নামিয়ে নায়োরবি চারপাশে তাকাল। আইলিন আসছে। মেয়েটা ওর সঙ্গে পড়ত। চোদ্দ বছরেই গর্ভবতী হয়ে যায়। রুবেনের সঙ্গে প্রকাশ্যেই তখন হাত ধরে হাঁটত। রুবেন দশ বছরেই স্কুল ছেড়ে দিয়েছিল। ওই বয়সেই শরীরটা বেশ বড়সড় বলে আলি হবার স্বপ্ন দেখত। খুব হাত চালাতো সেই সময়। নিজেকে টাফ দেখানোর জন্যে কায়দাকরা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জামাকাপড় কিনত। সেই রুবেন জেনে গেল যখন পিস্তলের দরকার পড়বে তখন ঠিক কোন জায়গায় গেলে চটপট সেটা পাওয়া যায়। কিন্তু পনের বছরে পা দিতেই টিটোদের সঙ্গে মারপিটে রাস্তায় পড়ে গেল রুবেন। সাউথ ব্রঙ্কসে একবার যদি তুমি পড়ে যাও তো চিরকালের জন্যে পড়লে। পরদিন ইস্ট রিভারের জলে রুবেনের মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে। এখানে এটাই স্বাভাবিক ঘটনা, এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

আইলিন সামনে এসে বলল, 'হাই, এখানে দাঁড়িয়ে?'

'ফোন করছিলাম।'

'কোন দিকে যাবে?'

'ম্যানহাটন। তবে ঘণ্টাদুয়েক বাদে।'

আইরিন কাছে এল, 'আচ্ছা, তুমি এখন ঠিক কি কাজ করছ বল তো?'

'এ্যাক্টিং। ভাল সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'ইউ উইল নেভার গেট ইট।' আইলিন ঠোঁট বেঁকাল, 'কজন মরগ্যান ফ্রিম্যান হতে পারে। গতসপ্তাহে চেল্‌সাতে ওঁর 'ড্রাইভিং মিস ডেইজি' দেখেছি। ফ্যাণ্টাস্টিক।'

নায়োরবি বলল, 'ফ্রিম্যানকে গোল্ডেন গ্লোব নমিনেশন দেওয়া হয়েছে বেস্ট অ্যাক্টরের জন্যে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে কে দেবে? এইসব উল্টোপাল্টা ভাবো বলেই তোমাকে সবাই হোয়াইটি বলে। শোন, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। তুমি আমার বাড়িতে একটু আসবে?' আইলিনের গলার স্বর নরম হল। দু'ঘণ্টা অনেক সময়। নায়োরবি মাথা নাড়ল। আইলিনের বাড়িতে একটা টেলিফোন আছে। গেলে আর বাক্সে পয়সা ফেলতে হবে না।

সিঁড়ি ভেঙে বাচ্চাদের চিৎকার শুনতে শুনতে ওরা তিনতলায় উঠে এল। সিঁড়ি বারান্দা এমন নোংরা করে রাখাই এখানকার রেওয়াজ! সাউথ ব্রঙ্কস অথবা হার্লেম একই চরিত্র নিয়ে রয়ে গেছে। নায়োরবির মাঝে মাঝে মনে হয় পরিষ্কার হয়ে থাকলে সাদাদের নকল করা হবে বলেই কেউ সেভাবে থাকতে চায় না। বেশ কয়েকবার বেল বাজাবার পরে আইলিনের মাতাল বাপ দরজা খুলল। মেয়েকে দেখে জড়ানো গলায় বলল, 'বাড়িতে ক্লায়েণ্ট আনতে তোর মা নিষেধ করেছে, তবু সেটা কানে যায় না? তা এনেছিস যখন তখন আর কি করা যাবে! পাঁচটা ডলার দে, আমি একটু ঘুরে আসি।'

সঙ্গে সঙ্গে আইলিন কাকচিৎকার আরম্ভ করল, 'ইউ ব্লাডি বাস্টার্ড, মা যে কেন তোমার সঙ্গে ঘর করে, চোখের মাথা খেয়েছে বুড়ো শকুন, এত লোক প্রতিদিন রাস্তায় গুলি খেয়ে মরছে তুমি কেন যে মর না! ও মা! শুধু মদ খাওয়ার ধান্দা, ছি ছি ছি।'

অন্য ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বিভিন্ন বয়সী নারী পুরুষ দাঁত বের করে এই দৃশ্য দেখছিল। বুড়ো চোখ কচলালো, 'তুমি কে বাবা দেবদূত?'

নায়োরবি জবাব দিল, 'আমি নায়োরবি।'

'অ। তুমি! এখানে কি মনে করে? অ্যাঁ?'

আইলিন বলল, 'বাবার কথায় কান দিও না, ভেতরে এসো।'

ঘরে পা দিতেই বোঁটকা রসুনের গন্ধ ধক্ করে নাকে এল। ছেঁড়া সোফার পাশে খালি মদের বোতল, জিনিষপত্র আগোছালো ভাবে রাখা। আইলিনরা দুটো ঘর নিয়ে থাকে। তাকে দ্বিতীয় ঘরটায় নিয়ে গেল আইলিন। তিনটে বিছানা। তৃতীয়টা বাঙ্ক। দেওয়ালে আইলিনের ছেলের ছবি সযত্নে রাখা। এই ঘরটা অপেক্ষাকৃত ভদ্র।

একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে আইলিন নিজে বিছানায় বসল, 'আমি

www.boiRboi.com

খুব ক্লান্ত।'

নায়োরবি কি বলবে বুঝতে না পেরে পা ফাঁক করে চেয়ারে বসল।

একটু সময় নিয়ে আইলিন বলল, 'শোন, এ্যাক্টিং-এর ধান্দা তুমি ছেড়ে দাও।'

'কেন? এটাই একমাত্র লক্ষ্য আমার।'

'কিন্তু তুমি জানো না, কবে তুমি সফল হবে।'

'জীবনের আর এক নাম হল লড়াই করা। লড়াই ছাড়া সাফল্য আসে না।'

'কিন্তু ফিল্ম বল আর ভিডিও বল, নাইনটি পার্সেন্ট চরিত্র হল সাদাদের জন্যে।'

'ছিল। এখন কালোদের নিয়ে সপ্তাহে দু'দিন সোপ অপেরা হচ্ছে।'

'তোমার তো কোনো গার্ল ফ্রেন্ড নেই?'

'না।' হাসল নায়োরবি, 'আমার বন্ধুই নেই।'

'তুমি এই বয়স পর্যন্ত কোন মেয়ের সঙ্গে শুয়েছ? লুক, আমরা সেই ছেলেবেলাকার বন্ধু, তুমি স্বচ্ছন্দে জবাব দিতে পার।'

নায়োরবি মাথা নাড়ল, 'ইয়া। একবার। দুবছর আগে।'

'অদ্ভুত! তুমি কি মনে করো না এটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার? এ পাড়ার সব ছেলেই রোজ একবার—। থাক গে, আমি জানি তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে রোজগার করবে না, অন্য কোন কাজের ধান্দা করছ না কেন? একটু খাটলেই দিনে তিরিশ ডলার কামাতে পার।'

'ভেবে দেখি। একজন আমাকে বাফেলো জো-এর সঙ্গে দেখা করতে বলেছে।'

'মাই গড। ও তোমাকে ফার্টিসেকেন্ড স্ট্রীটে কাজ দিতে পারে।'

'তেমন দরকার হলে করতে হবে।'

'আরে তাই যদি করবে তো আমাকে বল।'

'কি করবে তুমি?'

আইলিন একটু এগিয়ে আনল শরীরটাকে, নিচুগলায় বলল, 'গত সপ্তাহে আমি সেক্সোফোনে জয়েন করেছি। ফার্টিসেকেন্ড স্ট্রীট আর এইট্থ এভিনুার মোড়ে। আমাকে শুধু জন্মদিনের পোশাকে বক্সের মধ্যে নাচতে হয়। কাউকে স্পর্শ করতে দিই না। কোম্পানি আমাকে আট ঘণ্টার জন্যে একশ পেমেন্ট করে। সপ্তাহে চারদিন। ওখানকার

www.boiRboi.com

অফিসে কাজ পাইয়ে দিতে পারি তোমাকে।'

'খুব ভাল।' 'নায়োরাবি হাসল, 'আমাকে যদি ওরা নাইট ডিউটি দেয় তাহলে করতে পারি। দিনের বেলাটা কাজে লাগাতে অসুবিধা হবে না।'

আমার ছেলের ছবি দেখেছ?' দেওয়ালের দিকে তাকাল আইলিন।

'খুব সুন্দর।'

'ও এখন শিকোগায় আমার মাসীর কাছে আছে।'

'ও।'

'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি?'

'আমরা? একসঙ্গে?'

'হোয়াই নট? আমিও একা তুমিও একা। তারপর যদি ভাল লাগে বিয়ে করা যাবে। তুমি এখনই একটা সুন্দর বাচ্চাকে ছেলে হিসাবে পেয়ে যাবে। কেমন লাগছে ভাবতে?'

'নট ব্যাড। তবে নিজের ওপর একটুও ভরসা নেই আমার।'

'আমার ওপর ছেড়ে দাও সব। আসলে দূর থেকে তোমাকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুব খারাপ লাগছিল। আমরা একসঙ্গে ছেলে-বেলায় খেলেছি। আমরা পরস্পরকে জানি, তাই না? মনে হয় এক-সঙ্গে থাকতে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।'

'আমার দিদির সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'ও!' মাথা ঝাঁকাল আইলিন, 'ও কখনই রাজী হবে না। ওরকম হাড়গিলগিলে বুড়ি কোন মেয়েমানুষকে সুখী দেখতে চায় না। তুমি কি বাচ্চা ছেলে যে দিদির অনুমতি নিয়ে আমার কাছে আসবে? ঠিক আছে, ভেবে দ্যাখো।' উঠে দাঁড়িয়ে আইলিন বলল, 'আমাকে এখনই তৈরী হতে হবে। তুমি একটু অপেক্ষা কর।' আইলিন ঘরের বাইরে চলে গেল।

নায়োরাবি চুপচাপ বসে রইল। তার বেশ মজা লাগছিল। এই প্রথম কোন মেয়ে তাকে এই ধরনের প্রস্তাব দিল। আইলিন এখনও কুমারী। কুমারী মেয়ে এমন প্রস্তাব দিতেই পারে। আসলে চৌদ্দ বছর বয়সে যখন ওর পেট বিশ্রী রকমের দেখতে হল শেষ পর্যন্ত তো ও বন্ধুই ছিল। এ পাড়ায় কুমারী মায়ের সংখ্যা প্রচুর। জীবনের শুরুতেই একবার মা হয়ে নেয় তারা। বছর দশ পনের বাদে বিয়ে-থা হলে

www.boiRboi.com

দ্বিতীয়বার মা হওয়া এখন ফ্যাসান।

'আমার দিকে তাকিও না, আমি এখন চেঞ্জ করব।' বলতে বলতে আইলিন ঘরে ঢুকল। ওর হাতে স্কার্ট জামা আর অন্তর্বাস।

নায়োরবি হাসল, 'তুমি যে কাজ কর তার পরেও দেখছি লজ্জা পাও।'

'সেখানে চারপাশে দেওয়াল থাকে। কেউ আমার কাছে পৌঁছাতে পারে না। তুমি প্রভোকড হতে পার। উপোসী বাঘ তো।' আইলিন মিষ্টি হাসল।

'আমি একটা ফোন করতে পারি?' উঠে দাঁড়াল নায়োরবি।

'নিশ্চয়ই। ওখানে রিসিভার আছে।'

নায়োরবি এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে আইলিনের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল।

মিসেস ওয়ার্ড লাইনে এলে সে নিজের পরিচয় দিল, 'আমি নায়োরবি, ওয়ান জিরো টু ফোর।'

'ও হ্যাঁ। তোমার জন্যে সুখবর আছে। ঠিক চারটের সময় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের সামনে চলে যেও। সেখানে স্যুটিং পার্টিকে দেখতে পাবে। ডিরেকটারের নাম রয়। তোমাকে নিউইয়র্কের একটা ভিখিরীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। চার-পাঁচটা ডায়লগ আছে।'

'মেক আপ?'

'ক্যারি ইওর ওন কিটস্। পঞ্চাশ ডলার পাবে এবং তা থেকে আমাদের কিছু দিতে হবে না। বাই।' লাইন কেটে গেল। জোরে নিশ্বাস নিল নায়োরবি। পঞ্চাশ ডলার এখন তার কাছে কম নয়। সে পেছনে না ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি এখন একটু বাড়িতে যেতে পারি?'

'কেন?' আইলিনের গলা ভেসে এল।

'একটা অভিনয়ের কাজ পেয়েছি। জিনিসপত্র নিতে হবে। বিকেল চারটের মধ্যে পৌঁছাতে হবে।'

'ও। তা আমাকে একবার দেখবে না?'

আইলিনকে দেখল নায়োরবি। দেখে বলল, সুন্দর।'

উঁচু গলায় হেসে উঠল আইলিন, তারপর বলল, 'দশ মিনিটের মধ্যে বিগম্যাকের সামনে চলে এস। অবশ্য আমার কাজের জায়গায় যদি

www.boiRboi.blogspot.com

যেতে চাও।'

দিদির আসার সময় নয় এটা। নিজের ঘরে ঢুকে ব্যাগ গুছিয়ে নিতে নিতে নায়োরবি বেশ উত্তেজনা বোধ করছিল। এ্যাক্টিং কোর্সে অনেক কিছুর মত তাকে মেকআপ করাও শিখতে হয়েছে। মিনিট তিনেকের মধ্যে নিজের চেহারা বদলাতে পারে সে।

ব্যাগ নিয়ে বিগম্যাকের কাছে পৌঁছাতেই আইলিন এসে গেল। পাশাপাশি হাঁটার সময় আইলিন বলল, 'আমার জীবনে তুমিই হলে প্রথম পুরুষ যে শরীর দেখেও উত্তেজিত হয় না।

নায়োরবি শব্দ করে হাসল, কিছু বলল না জবাবে।

ইয়াঙ্কি স্টেডিয়াম থেকে ডি ট্রেন ধরল ওরা। এইসময় পাতাল ট্রেন একটু ফাঁকা থাকে। পাশাপাশি বসে আইলিন ওর হাঁটুতে হাত রাখল, 'আমি কিন্তু খুব সিরিয়াস।'

'কিন্তু মনে রেখো পাড়ার সবাই আমাকে হোয়াইটি বলে।'

'আমি ওটা মুছে দেব।'

'আর একটা ব্যাপার তোমার জানা দরকার। টিটো আমাকে কাজের অফার দিয়েছে।

মুহূর্তে শক্ত হয়ে গেল আইলিন, 'তুমি নিয়েছ?'

'না, এখনও নিইনি।'

'তাহলে নিও না। আমি রুবেনকে ভুলতে পারি না। অফকোর্স একটি মানুষ মরে গেলে তাকে সবসময় আঁকড়ে থাকা যায় না। কিন্তু টিটোরা ওকে মেরেছে এটাও তো ঠিক।'

'তুমি পুলিশকে বলনি কেন?'

'কি লাভ হত? আমার বাচ্চাকে ওরা মেরে ফেলতে পারত।'

ঝুপঝুপ করে একশ পঁয়ত্রিশ স্ট্রিটের স্টেশনগুলো পার হয়ে যাচ্ছে। রকফেলার স্টেশন আসামাত্র ওরা উঠে পড়ল। এখন পৌনে দুটো বাজে। ফর্টিসেকেণ্ড স্ট্রীটের বাইরে এসে নায়োরবি বলল, 'আমাকে আর দু'ঘণ্টার মধ্যে ওয়ার্ল্ড ট্রেডে পৌঁছাতে হবে। মনে হচ্ছে এখন তোমার ওখানে না যাওয়াই ভাল।'

আইলিন জিজ্ঞাসা করল, 'লাঞ্চ করেছ?'

'না।'

www.boiRboi.blogspot.com

'ঠিক আছে, ওই ম্যাকডোনাল্ডে চল। তোমার স্যুটিং শেষ করে যদি রাত দশটার মধ্যে আসতে পার তাহলে কথা হবে। আমি তোমার কথা বলে রাখব।'

'লুক বেবি, আমার কাছে দশ-বারো ডলার আছে।' ম্যাকডোনাল্ডের দিকে হাঁটতে হাঁটতে স্পষ্ট জানিয়ে দিল নায়োরবি।

'শীট! তোমাকে কে বলেছে খরচ করতে?'

দুটো বিগম্যাক আর কালো কফি নিয়ে এল আইলিন। রঙিন টেবিলে সেগুলো রেখে মুখোমুখি বসল ওরা। ম্যাকডোনাল্ডে খাবার সস্তা। কিন্তু ব্রঙ্কসে অনেক দোকানে এর চেয়ে সস্তায় খাবার পাওয়া যায়। এখন চারপাশে প্রচুর সাদা, বাদামী, তামাটের ভিড়। সন্ধ্যে হয়ে গেলেই এ পাড়াতে কালোর সংখ্যা বাড়ে। চুপচাপ খাচ্ছিল নায়োরবি। বিগম্যাকের একটা টুকরো গিলে আইলিন বলল, 'তুমি একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছ।'

'কি রকম?'

'আমি বুঝতে পারছি না। তুমি ঠিক কি চাও?'

'আমি, আমি একজন অভিনেতা হতে চাই।'

'ব্যাস?'

'হ্যাঁ। একজন অভিনেতার কোন জাত থাকে না। সে সাদা না কালো না তামাটে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। যে কোন সাদা অভিনেতা ওথেলো করার সুযোগ পেলে ধন্য হয়ে যায় তুমি জানো?'

'কিন্তু কোন সাদাচরিত্রে কালোদের নেওয়া হয় না, তাই না?'

'ট্র্যাশ। অফ ব্রডওয়েতে কালো অভিনেতা ম্যাকবেথ করেছে।'

'বেশ তো, তুমি থিয়েটারে সুযোগ নিচ্ছ না কেন?'

'সবকটা দরজায় নক করেছি। লাইনে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। দিন আসবেই।'

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেণ্টারের সামনে নায়োরবি ঠিক সাড়ে তিনটের সময় পৌঁছে গেল। চমৎকার রোদ্দুর চারধারে। পার্কিং স্ট্যাণ্ডে একটা বড় ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে কয়েকজন এশীয়। স্যুটিং পার্টি বলে মনে হল না ওর। ওখানে সামান্য একটা ভিডিও স্যুটিং—এও বিশাল স্টুডিওভ্যান স্পটে আনা হয়! ইউনিটের লোকজন ক্রাউড কণ্ট্রোল করে। ইতিমধ্যে চারটে ছবিতে এক্সট্রার পার্ট করেছে নায়োরবি।

www.boiRboi.com

অভিজ্ঞতা ভালই।

পৌনে চারটে বাজল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল সেই ভ্যানের জানলায় একটা ইউম্যাটিক ক্যামেরা নিয়ে কেউ ছবি তুলছে। এরাই স্যুটিং করবে নাকি? এত অল্প ব্যবস্থা? সে এগিয়ে গেল টুপি মাথায় লোকটার সামনে, 'মাপ করবেন, আপনারা কি স্যুটিং করতে এসেছেন?'

'কেন বলুন তো?' লোকটা সন্দেহের চোখে তাকাল।

'আমার এজেন্ট মিসেস হার্ডি এখানে পাঠিয়েছেন। আমার নাম নায়োরবি।'

বলামাত্র লোকটা খুব খুশী হল। হাত বাড়িয়ে ওর হাত স্পর্শ করল, 'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। পুলিশ এখানে রিফ্লেক্টার নামাবার অনুমতি দেয়নি। তাই একটু চুরি করে স্যুটিং করব। হ্যাঁ, আপনাকে একটা ভিখিরীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।'

'কি রকম ভিখিরী?'

'এই নিউইয়র্কের রাস্তায় যেমন দেখা যায়।'

'কোন সংলাপ আছে?'

'হ্যাঁ। দুটি ছেলেমেয়ে এখান দিয়ে যাবে। আপনি তাদের কাছে পয়সা চাইবেন। তারা দেবে না। মেয়েটি ভয় পাবে। ছেলেটি বিরক্ত হবে। একটু দাঁড়ান।' পরিচালকের নির্দেশে ভ্যানের ভেতর থেকে দু'জন অভিনেতা অভিনেত্রী বেরিয়ে এল। নায়োরবি দেখল দুজনেরই রঙ তামাটে। সংলাপ পড়ানো হল। শেষ সংলাপটি খুব উত্তেজনাপূর্ণ। আকাশের দিকে মুঠো ছুঁড়ে তাকে বলতে হবে, ও মার্টিন লুথার কিং, তুমি শহীদ হলেও পৃথিবীটা একইরকম রয়ে গেল।' দু'তিনবার নিচু-গলায় রিহার্সাল দিতেই ভিড় জমে গেল। নায়োরবি দেখল দর্শকদের বেশীরভাগই ট্যুরিস্ট। পরিচালক একটু বিব্রত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার মেকআপ নিয়ে কি করা যায়। আমাদের সঙ্গে অবশ্য সরঞ্জাম আছে—!'

নায়োবিবি বলল, 'তিন মিনিট সময় দিন।'

সে ফুটপাতে হাঁটুমুড়ে বসে ব্যাগ খুলল। মেকআপের বাক্স বের করে মুখে কালো রঙ মাখল এমন করে যাতে বোঝা যায়। মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে কপালে লাল ফেট্টি বাঁধল। তারপর সেই ছেঁড়া ওভার-কোটটা চাপিয়ে নিয়ে একটা ভাঙা মগ বের করল। পরিচালক মুগ্ধ

www.boiRboi.blogspot.com

চোখে ওর তৈরী হওয়া দেখছিলেন। এবার বললেন, 'দারুণ! আপনি দেখছি দারুণ প্রফেশনাল। ইণ্ডিয়াতে আমরা এটা ভাবতেই পারি না। ওকে! কাজ শুরু করা যাক।'

ক্যামেরাম্যান এবার ফুটপাতে। নায়োরাবি মগ নিয়ে বসে আছে। ছেলেমেয়ে দুটো কাছে আসতেই সে মগ নাচাল, 'হেল্প মি স্যার, এ ডলার ম্যাম।'

মেয়েটি চমকে উঠল। ছেলেটি চাপা গালাগাল দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নায়োরাবি আকাশের দিকে মুঠো তুলে প্রচণ্ড চিৎকার করে সেই সংলাপটা বলল।

পরিচালক খুব খুশী। শট ওকে হয়েছে শুনে নায়োরাবি কোট খুলে ব্যাগে পুরল। মাথার লাল ফেট্টিটাও। তোয়ালেতে মুখ মুছবে যখন তখন প্রোডাকশনের একজন এসে তার হাতে পঞ্চাশ ডলারের নোট ধরিয়ে দিতে সে ধন্যবাদ জানাল।

তার কাজ শেষ, এবার যেতে পারে। পরিচালক করমর্দন করে ভ্যানে উঠলেন। নায়োরাবি পঞ্চাশ ডলার হাতে নিয়ে ওদের চলে যেতে দেখল।

'ইউ এ্যাক্টর?'

নায়োরাবি মুখ ফিরিয়ে দেখল একজন সাদা বৃদ্ধ তাকে প্রশ্নটা করলেন। সে কাঁঠ নাচাল, 'ইয়া।' তারপর ব্যাগ তুলে নিল।

'দাঁড়াও। আগে তোমার উচিত নিজের মুখ পরিষ্কার করা।'

মুখে আঙুল ঘষতেই রঙ উঠে এল। মাথা ঝাঁকিয়ে আবার ব্যাগ খুলে তোয়ালে বের করল নায়োরাবি। বৃদ্ধ বললেন, 'তোমার উচিত ছিল একটু কম চেঁচানো। যে সংলাপটা বললে সেটা যদি তুমি নিজে অনুভব করতে তাহলে চেঁচাতে না, কিন্তু ব্যথা প্রকাশ করতে পারতে।'

'হতে পারে!' নায়োরাবির এই উপদেশ ভাল লাগছিল না।

'কিন্তু এই দৃশ্যটি বড় পুরোনো। সাদা-কালোর মধ্যে এখনও মিল হয়নি বটে কিন্তু আমাদের শহরের মেয়র একজন কালো চামড়ার মানুষ, তাই না?'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

বৃদ্ধ পকেট থেকে পার্স বের করে তা থেকে একটা কার্ড বের করলেন 'অ্যাক্টর হিসেবে তুমি নিজের নাম রেজেস্ট্রি করেছ?'

www.boiRboi.blogspot.com

'নিশ্চয়ই।'

'কি নাম তোমার?'

'নায়োরাবি জোন্স।'

'এটা নাও। কাল সকাল দশটায় আমার সঙ্গে দেখা করো। সপ্তাহে চারশো দেব। কাজটা বড় নয়। আগে নিজেকে প্রমাণ করা। দশটা মানে কিন্তু দশটা।' বৃদ্ধ চলে গেলেন।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নায়োরাবি। সে কার্ডটার দিকে তাকাল, মাইকেল সিলভার। ন্যাশন্যাল থিয়েটার। লোকটা কে? তরতর করে রাস্তার পাশের টেলিফোন বুথে পৌঁছে মিসেস হার্ডিকে ফোন করল সে, 'সুটিং হয়ে গেছে। আপনাকে ধন্যবাদ। ওরা আমাকে পঞ্চাশ ডলার দিয়েছে।'

'ঠিক আছে। মাঝে মাঝে ফোন করো।'

'মিসেস হার্ডি, ন্যাশনাল থিয়েটারে মাইকেল সিলভার বলে কেউ আছে?'

'মাই গড! তুমি একটা মূর্খ। সিলভার হল ঝুনো নারকেল, সহজে ভাঙ্গে না। থিয়েটারটার মালিক ওই। হ্যাঁ, ও নতুন প্রোডাকশন নামাচ্ছে, কিন্তু কেন বল তো? ও তোমার মতন নতুনদের থিয়েটারের ছায়া মাড়াতে দেয় না।'

ভদ্রলোক আমাকে আগামীকাল দেখা করতে বলেছেন। সপ্তাহে চারশো ডলার দেবেন বলেছেন।

'সত্যি? কি আশ্চর্য! তোমার সঙ্গে যোগাযোগ হল কি করে? মাই গড! তুমি তো জ্যাকপট পেয়ে গেছ। ওয়েল, কন্ট্রাক্ট সাইন হয়ে গেলে এজেন্সির কমিশনটা পাঠিয়ে দেবে। উইশ ইউ গুড লাক!' রিসিভার নামিয়ে রেখে চারপাশে তাকাল নায়োরাবি। নিজের কানকেই এখন বিশ্বাস হচ্ছে না। মাইকেল সিলভার তাহলে থিয়েটারটার মালিক? আর সে উপদেশ শুনে বিরক্ত হচ্ছিল? ব্যাগ হাতে সে লাফিয়ে উঠল। জেসাস, তুমি কত দয়াময়!

টিউবে ওঠার সময় নায়োরাবির মনে হল তার আত্মবিশ্বাস বেশ বেড়ে গেছে। ফার্টসেকেন্ড স্ট্রীট আসতেই আইলিনের কথা মনে পড়ে গেল। মেয়েটা তাকে আজ খুব যত্ন করে লাঞ্চ খাইয়েছে। ওকে ডিনার খাইয়ে দেওয়া উচিত কিন্তু দশটার আগে বেচারার ছুটি হবে না। তার যে

www.boiRboi.blogspot.com

আর কাজের দরকার নেই সেটাও বলা উচিত। দশটা পর্যন্ত কোথায় কাটানো যায়। এখনও সাড়ে তিনঘন্টা বাকি!

হঠাৎ আইলিনকে তার ভাল লেগে গেল। কারো সঙ্গে এসব কথা আলোচনা করা যায় না। আইলিনকে ভাল শ্রোতা মনে হয়েছে। আচ্ছা, আইলিনকে ডেকে আনলে কেমন হয়? আজকের রোজগার পঞ্চাশ ডলার তো সঙ্গে আছেই।

টিউব থেকে নেমে সে বাইরে বেরিয়ে সামান্য হাঁটতেই, আইলিনের কাজের জায়গায় পৌঁছে গেল। রঙিন হোর্ডিং-এ উত্তেজক শব্দাবলী। নগ্ন মেয়েদের ছবি। ডিসকো লাইট। সে ভেতরে ঢুকতেই কাউণ্টারের লোকটা চেঁচাল, হেই বাডি টোকেন কেনো।

'আমি আইলিনের সঙ্গে কথা বলব। দরকার আছে।'

'সে ওপরে কাজ করছে।'

'একটু ডেকে দাও।'

'অসম্ভব। দশটার পরে এসো।'

'এখনই কথা বলা দরকার।'

লোকটা সোনালি দাঁতে হাসল, 'গোলমাল মনে হচ্ছে! সুবিধে হবে না। হাই জন, লোকটাকে দ্যাখো তো।' হাঁক শুনে বিশাল চেহারার ডোরম্যান এগিয়ে এল।

নায়োরবি হাত বাড়াল, চারটে টোকেন দাও।'

এক ডলারে চারটে কয়েন নিয়ে আলো-আঁধারির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল সে। অর্ধনগ্ন সাদাকালো নারী ঘুরছে। আহা, এখানে কোন রঙের সমস্যা নেই। কী-হোল কোন্‌টা? সে একটা মোটা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, 'আইলিন কোথায়?'

মেয়েটা বুথগুলো দেখিয়ে দিল নিঃশব্দে। ট্যুরিস্টদের ভিড় চারপাশে। তাদের তাড়া লাগাচ্ছে কর্মচারীরা। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। ভেতরে ডায়াস। তার চারপাশে ছোট ছোট বুথে দর্শকরা। একটা বুথ খালি হতেই নায়োরবি ঢুকে গেল। টোকেন ফেলতেই ছোট্ট জানালা উঠে গেল। শুধু তার চোখের মাপে একটা ফাঁক। সে ভেতরে তাকাতেই আইলিনকে দেখতে পেল। বিবস্ত্র আইলিন নেচে যাচ্ছে। গোটা পঁচিশেক বুথ একটা প্ল্যাটফর্মকে ঘিরে সাজানো। দর্শক সেই বুথে ঢুকে টোকেন ফেললে আইলিনকে দেখতে

www.boiRboi.com

পাবে। ভাল করে বোঝার আগেই জানালা বন্ধ হয়ে গেল। দ্বিতীয় টোকেন ফেলতেই আবার জানালা খুলল। বিবস্ত্র আইলিন। চোখ বন্ধ। আহা, নাচে ছন্দ আছে। নাচতে নাচতে এগিয়ে আসতেই সে ছোট্ট জানলায় হাত নাড়তে লাগল। আইলিন সরে গেল। জানালা আবার বন্ধ হয়ে যেতেই নায়রোবির খেয়াল হল। ও নিশ্চয়ই কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ভেতর থেকে। তার চোখ ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না আইলিন। কাঁচের আড়ালে পঁচিশটি বুথের পঁচিশজোড়া চোখের তফাৎ বোঝা সম্ভব নয়। আবার টোকেন ফেলল দরজা খুলল। আইলিন নাচছে। সে চিৎকার করে ডাকল। শব্দ দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এল? দর্শকদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ভেতরে আর একটা কাঁচের দেওয়াল দেওয়া আছে।

চতুর্থ টোকেন শেষ হওয়ামাত্র নায়োরবি আবার টোকেন কিনতে ছুটল। ইতিমধ্যে তার বুথে অন্য দর্শক ঢুকে গেছে। মরীয়া হয়ে সে অন্য খালি বুথের সন্ধান করতে লাগল। পঁচিশ বুথের মাঝখানের প্ল্যাটফর্মে নেচে চলেছে আইলিন। তিরিশ সেকেণ্ডের সুযোগে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাচ্ছে নায়োরবি। টোকেন ফুরোলে আবার কিনছে। ভেতরে যাওয়ার উপায় নেই। শুধু ঘুরে ঘুরে দেখা আর দেখাতে চাওয়া। তার উপার্জিত পঞ্চাশ ডলার খুব দ্রুত কমে যাচ্ছিল। ক্রমশ আইলিন, তার শরীর এবং নগ্নতা ছাপিয়ে ছন্দে এক অসহায় স্বপ্নকে স্পর্শ করার উন্মাদনায় মাতাল হয়ে নায়োরবি খালি বুথের সন্ধানে ঘুরপাক খেতে লাগল।

www.boiRboi.blogspot.com

কেউ বলে বাতিক, কেউ শখ, তবে অনেকেই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কবে আপনার মাথায় এমন ভাবনা এল ?'

কবে এল সুন্দর নিজেই জানে না। যখন প্রথম নিউ মার্কেটের ফুট-পাথে প্যাঁচাটাকে দেখেছিল তখন মনে মনে বলেছিল বাঃ। সত্তর টাকায় সেটা কিনে এনেছিল তার দুঘরের বাসায়। মালিবাগের এই ফ্ল্যাটটায় সে উঠে এসেছিল কিছুদিন আগে। সামান্য আসবাব, একা মানুষের চলে যাওয়ার মত যা দরকার তার বেশী নয়। প্যাঁচাটাকে এনে রেখেছিল টেবিলের ওপর। তাকালে মনে হয় একটা চোখ ঈষৎ বোঁজা। মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে মনে হত দুটো চোখ অন্ধকারে জ্বলছে। যে চোখ বোঁজা তা কি করে অন্ধকারে জ্বলে ? মজা লাগত কিন্তু সেইসঙ্গে ভালও লাগত।

প্যাঁচাটা কাঠের। যিনি ওটাকে তৈরি করেছিলেন তাঁর হাত অবশ্যই শিল্পী। দেখে মনে হয় এইমাত্র উড়ে এসে গাছের ডালে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। সুন্দরের মনে হতে লাগল প্যাঁচাটা বড় একা, ওর সঙ্গী দরকার। আর এই মনে হওয়ার দিনে পুরনো পল্টনের রাস্তায় বিকেল বেলায় একটা ঝকঝকে পেতলের প্যাঁচা পেয়ে গেল। এর গড়ন বেশ শান্ত এবং মিষ্টি। দরাদরি করে কিনে ফেলেছিল। বাসায় এসে আগেরটার পাশে রেখে মনে হয়েছিল, বেশ লাগছে। সেই রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে সুন্দর দেখল আগের প্যাঁচাটার চোখ তেমন জ্বলছে না। বরং খুশীখুশী ভাব।

সেই শুরু। তারপর যেখানেই সে গিয়েছে আর যখনই প্যাঁচা চোখে পড়েছে কিনে এনেছে বাসায়। প্যাঁচারা কত রকমের হয় ? হুতোম প্যাঁচা, লক্ষ্মী প্যাঁচা, দুধসাদা অথবা বিল্লী ময়লা ? কাঠ, পেতল, পোড়ামাটি, থার্মোকোল থেকে শুরু করে হেন জিনিষ নেই যে মানুষের হাতে প্যাঁচার শরীর তৈরী হয় না। হয়তো পাখিদের মধ্যে প্যাঁচার গঠন শিল্পীদের আকর্ষণ করে বেশী তাই যে যা পেরেছে তাই দিয়ে প্যাঁচাকে জীবন্ত করেছে। আর সেইসবের এক একটা খুঁজে পেতে এনে বাসায় রেখেছে সুন্দর। এদের রাখতে আসবাব বাড়াতে হয়েছে।

www.boiRboi.com

টেবিল ছাড়িয়ে সেল্ফ এসেছে একের পর এক। দুই দেওয়াল জুড়ে নানান স্তরে তার প্যাঁচারা চুপচাপ বসে থাকে। বন্ধুরা এলে অস্বস্তিতে পড়েন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের চোখ যখনই এই প্যাঁচাদের ওপর পড়ে তখনই অস্বস্তি বাড়ে। সংগ্রহের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার পর সুন্দরের মনে ধীরে ধীরে এদের সম্পর্কে অদ্ভুত মায়া তৈরী হয়েছে। কেউ সমালোচনা বা বিরূপ কথা বললে তার মন খারাপ হয়। হাত দিতে চাইলে সে তীব্র আপত্তি করে। ফলে তার ঘরে অতিথির সংখ্যা কমে আসে। যে আসে সে অবাক হয়। টিকিট জমানো, মুদ্রা জমানোর মত এই অদ্ভুত হবি নিয়ে তারা আড়ালে কথা বলে।

অফিস থেকে বেরিয়ে বেবি ট্যাক্সিতে এক বন্ধুর বাসায় যাচ্ছিল সুন্দর। শহীদ মিনারের সামনে দিয়ে গেলেই সে দেওয়ালে লেখা লাইনগুলোয় চোখ বোলায়। মনে হয় মনটা স্নান করে উঠল। আজ সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ দেখতে পেল একজন লোক কিছু বিক্রী করছে। জ্যান্ত পাখি? বেবি ট্যাক্সি থামিয়ে সে কাছে গিয়ে দেখল লোকটা কতকগুলো অজানা পাখি বিক্রী করছে। শরীরের মাংস, রক্ত, মেদ বের করে নিয়ে আদলটা ঠিক রেখে দিয়েছে বিশেষ প্রক্রিয়ায়। একটা ধবধবে প্যাঁচা পেয়ে গেল সে। দেখলে কে বলবে এ জ্যান্ত লক্ষী প্যাঁচা নয়। কিনে নিয়ে সোজা সে ফিরে এল বাসায়। অন্য প্যাঁচাদের থেকে একটু আলাদা ওকে বসিয়ে দিতেই মনে হল এতদিনে ঘরটা সম্পূর্ণ হল!

মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল সুন্দরের। মনে হল ডানার শব্দ কানে আসছে। যেন স্বপ্নের পাখিরা নীল জ্যোৎস্নায় অবিরত ডানা ঝাপটে উড়ে যাচ্ছে। চোখ খুলল না সুন্দর। স্বপ্নের পাখি কি কখনও প্যাঁচা হয়? ঠিক বুঝতে পারছিল না সে।

পরের দিন ছুটি। ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে সে অবাক। জানলার কাঁচে একটা সাদা পালক পড়ে আছে। এই ঘরের সবকটা জানলা কাল থেকে বন্ধ। পাখির পালক এল কি করে। পালকটা তুলে সে দেখল তার গোড়া শুকনো। যেন অনেকদিনের পুরানো। হঠাৎ তার খেয়াল হতে পালকটাকে নিয়ে এল গত বিকেলে কেনা প্যাঁচাটার কাছে। মিলিয়ে সে অবাক। ওর শরীরের অন্য পালকগুলো আর খসে পড়ে থাকা এই

www.pathagar.net

পালকটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ঘরে এসে সে ওটাকে যেখানে বসিয়েছিল সেখান থেকে জানলা পর্যন্ত কোন ভাবেই পালকটা আপনা থেকে উড়ে যেতে পারে না। উড়ে যাওয়ার মত বাতাস কাল কখনই ঘরে ছিল না। মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে সে প্যাঁচাটাকে ভাল করে দেখতেই শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। কাল সে এটাকে অন্যদের থেকে একটু আলাদা বসিয়েছিল। কিন্তু আজ সেই প্রথম কেনা রাগী প্যাঁচাটার কাছে ও চলে এল কি করে?

সারাদিন সুন্দর ঘর থেকে বের হল না। তার সংগ্রহে প্যাঁচার সংখ্যা একশো সাত। একমাত্র প্রথমটা ছাড়া সবাই কী নিরীহ হয়ে বসে আছে। সারাদিনে ওদের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ল না। বিকেল নাগাদ সে নিজের চিন্তায় নিজেরই হাসি পাচ্ছিল। এই সব জড় বস্তুকে সে ক্রমশ অন্যমাত্রা দিচ্ছে, মস্তিষ্ক স্থির আছে তো তার?

সেই রাত্রে তাড়াতাড়ি ঘুম এল। হয়তো নার্ভের ওপর ধকল গিয়েছিল বলেই সে ঘুমাতে পারল। মধ্যরাতে সুন্দরের মনে হল ডানায় শব্দ তুলে কেউ যেন তার চারপাশে পাক খাচ্ছে। খুব মরীয়া হয়ে চেষ্টা করেও সফল হচ্ছে না সে। সুন্দর চোখ খুলল। বাইরে বন্ধ কাঁচের জানলার ওপাশে মায়াময় জ্যোৎস্নায় পৃথিবীটা ছিমছিমে হয়ে আছে। আর তার ঘরের দেওয়াল থেকে দেওয়ালে সেই সাদা প্যাঁচাটা উড়ে উড়ে ধাক্কা খাচ্ছে, খেয়ে চলেছে। যেন মুক্তির জন্যে পাখিটা উন্মাদ হয়ে উঠেছে। ঘোরের মধ্যে উঠে দাঁড়াল সুন্দর। পাশের জানালাটা খুলে দেওয়ামাত্র পাখিটা বেরিয়ে গেল বাইরে। জ্যোৎস্নামাখা আকাশে দুধের সরের মত ভেসে থেকে সে উধাও হয়ে গেল। খুব অবাক নয়, দুঃখিত নয় আবার চেতনা এবং অচেতনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দর বিছানায় চলে এল।

সকাল বেড়ে গেলে ঘুম ভাঙল তার। প্রথমেই স্মরণে এল গতরাতের কথা। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে সে অবাক। সাদা প্যাঁচাটা বসে আছে যেখানে সে গতকাল তাকে দেখেছিল। জানালাটা খোলা, তখনও। অথচ যদি ঘটনাটা স্বপ্ন হয় তাহলে জানালাটার বন্ধ থাকার কথা।

ভূতগ্রস্ত মানুষের মত সুন্দরকে দেখাল কিছুক্ষণ। তারপর সে নিজেকে বোঝাতে লাগল, কখন কোন ফাঁকে সে হয়তো নিজেই জানালাটাকে খুলে রেখেছিল। মৃত এবং সাজানো পাখি কোনভাবেই উড়ে

www.boiRboi.com

যেতে পারে না। আর যদি যায়, যে পাখি সাদা জ্যোৎস্নায় উড়ে যায় সে আর কখনই ফিরে আসে না।

সেই বিকেলে এক মহিলা এলেন সুন্দরের বাসায়। যার জন্যে ধান-মুণ্ডির বাসা তাকে ছাড়তে হয়েছিল, যার জন্যে প্রিয় বন্ধু আশ-রাফকে চিরদিনের জন্যে ক্ষমা করে নীরবে সে চলে এসেছিল মালিবাগের এই ফ্ল্যাটে সেই মহিলাটি এখন তার সামনে। বিচিত্র বলেই জীবন এত অদ্ভুত। আশরাফ কানাডায় চলে যেতে চায়। মহিলা যাবেন না। তাঁর সঙ্গে আশরাফের বিরোধ লেগেছে। সুন্দর যদি আরও একটু বড় হয় তাহলে মহিলা কৃতার্থ হবেন। তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন।

আমি আর কত বড় হব? বুকের মধ্যে ডানা ঝটপটানো প্রশ্নটা সে মহিলার ওপর ছুঁড়ে মারতে পারল না। যেন তার চারধারে সব সময় সারি সারি দেওয়াল ও কাঁচের জানালাগুলো বন্ধ। মহিলা তাকে ভাবার সময় দিলেন। তারপর আগ্রহ নিয়ে প্যাঁচাদের দেখলেন, আজকাল তুমি এদের নিয়েই থাকো?'

'হ্যাঁ।'

'অদ্ভুত! হঠাৎ প্যাঁচা কেন?'

'জানি না।'

'কটা আছে?'

'একশ সাত।'

মহিলা তবু গুণতে আরম্ভ করলেন। এক দুই তিন, একশ আটে গিয়ে তিনি থামলেন, 'নিজেরটা তুমি কোনদিন যত্ন নিয়ে জানলে না। একশ সাত নয়, একশ আটটা প্যাঁচা তোমার।'

অসম্ভব। সুন্দর খাতা খুলল। যখনই সে প্যাঁচা কিনে এনেছে তখনই তার বিবরণ সে একটার পর একটা লিখে রেখেছে। শেষতম প্যাঁচা ওই সাদাটা। শেষ সংখ্যা একশ সাত। তবু মহিলার জেদে সে গুণতে শুরু করল। না, মহিলার ভুল হয়নি। একটা বেশী হয়ে যাচ্ছে। কি করে হল?

মহিলা চলে গেলেন ভুল ধরিয়ে দিয়ে বিজয়িনীর মত। মাথা খারাপ হয়ে গেল সুন্দরের। একটার পর একটার সঙ্গে খাতায় বর্ণনা মেলাতে লাগল সে। শেষপর্যন্ত একটা ছোট্ট প্যাঁচাটাকে সে অবিচার করল। এ কোথা থেকে এল? সেই প্রথম কেনা রাগী প্যাঁচার পাশে নির্বিকার

www.boiRboi.net

মুখে বসে আছে। কোনদিন একে চেনেনি সে। প্যাঁচাটা মাটির। পাঁচ টাকাও দাম হবে না। হঠাৎ সে সাদা প্যাঁচাটার দিকে তাকাল। কাল রাত্রে উড়ে গিয়ে কি একে সঙ্গে করে ফিরে এসেছে। রাগী প্যাঁচাটার ওপর চোখ রাখল সুন্দর। আশ্চর্য! আজ ওর দুই চোখই আধবোঁজা। নেশায় বুঁদ হয়ে যাওয়া অবস্থা।

মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙ্গল তার। আজ শোওয়ার সময় সব জানালা বন্ধ করে রেখেছিল সে। দেখল ঘরের সবকটা প্যাঁচা একসঙ্গে উড়ে উড়ে ধাক্কা খাচ্ছে জানলায়। সবাই বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ছটফট করছে। আজ তাঁদের পালাবদল হয়েছে, তায় তেজ বেশ কম। পৃথিবীটা আরও রহস্যময়। প্যাঁচাগুলো ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে যাচ্ছিল প্রথমে ঘরের এখানে ওখানে, শেষে দাঁড়িয়ে ওঠা সুন্দরকে ঘিরে। যেন নির্বাক আবেদন জানিয়ে যাচ্ছিল তাদের স্বপ্নের জ্যোৎস্নায় ছেড়ে দেবার জন্যে। সুন্দর জানলা খুলে দিতেই স্রোতের মত তারা বেরিয়ে গেল। সুন্দর দেখল তার ঘর খালি শুধু একজন বসে আছে একই ভঙ্গীতে।

সে কাছে এগিয়ে গেল। প্রথম দিনের রাগী প্যাঁচাটা এখন মাথা গুঁজে বসে আছে। তার দুই চোখ বন্ধ। যেন পৃথিবীর কোন কিছু সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। অথবা আগ্রহী হবার মত মন তার চলে গেছে। আবার এমনও হতে পারে তার আগ্রহী হবার মন নিয়ে অন্যান্যরা উড়ে গেছে স্বপ্নের জ্যোৎস্নায় ওর জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছিল সুন্দরের।

তার মনে হচ্ছিল নিজের নিজের সব কিছু পাখিটা হারিয়েছে একটু বড় হবে বলেই।

www.boiRboi.blogspot.com

পর্দা উঠলে দেখা গেল মঞ্চ অন্ধকার। কয়েক মুহূর্ত যেতেই আমরা বুঝতে পারলাম এমনটা নাটকে ছিল না। উইংস-এর ওপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করলেন। কথাবার্তা যা ভেসে এল তাতে বুঝলাম বৈদ্যুতিক বিভ্রাট ঘটে গেছে।

আমরা উসখুস করতেই একটা মোমবাতি দেখা গেল। ছোট্ট আলো সামলে যিনি মঞ্চে এলেন তাঁর বয়স আন্দাজ করা মুশকিল।

মুখেই আলো জমায় মোটামুটি বয়স্ক ঠেকছে। ভদ্রলোক এগিয়ে আসতে আধো আলোয় মধ্যবিত্ত আসবাব দেখতে পেলাম।

'উপস্থিত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলারা। আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। এমনটা হবার কথা ছিল না সেটা বুঝতেই পারছেন। কথা তো অনেক কিছুরই থাকে না, হয়ে যায়, এবং হলে আমরা তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।'

'যা হোক, চুপচাপ বসে না থেকে আসুন আপনাদের সঙ্গে আমি একটু আলাপ পরিচয় করে ফেলি। আমরা আজ যে নাটকটি করব সেটি আমার পরিবারের কয়েকজনকে নিয়েই। যেহেতু আমিই একমাত্র রোজগেরে মানুষ, তাই আমাকেই কর্তা বলা হয়। আমার নামে বিয়ের কার্ড এলে স্ত্রী নেমন্তন্ন খেতে যান। তাই এই নাটকের প্রধান চরিত্র হিসেবে আপনাদের সঙ্গে কথা বলার অধিকার আমার আছে।'

ভদ্রলোক মোমবাতিটা একটা টেবিলে সযত্নে রাখলেন। আলো সরতেই বুঝলাম ওঁর বয়স পঞ্চাশের গায়ে। কথা বলার ধরন মন্দ নয়।

'আমার নাম নিরাপদ মিত্র। একেবারে সাদাসাপটা নাম। আমি জীবনে কখনও কোন পাপ করিনি। যাকে বলে অন্যায়, তা কখনও করিনি, মিথ্যে কথা বলিনি। এই কথাগুলো আপনাদের কানে সোনার পাথরবাটির মত শোনাচ্ছে, কিন্তু এটাই সত্যি। আমি রাজ্য সরকারের একজন কর্মচারি এবং এখন পর্যন্ত ঘুষ নিইনি। এই বাড়িটা আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব কিনেছিলেন। গত কুড়ি বছরে হোয়াইট ওয়াশ করাতে পারিনি পয়সার অভাবে। খুব কষ্ট হচ্ছে সংসার চালাতে। এটা নতুন

www.pathagar.com

গল্প নয়। কিন্তু এ-বাড়িতে মনে হয় কষ্টটা আমি একাই করছি। আপনাদের এসব কথা বলছি জানলে বাড়িতে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। আমার বেশী কথা বলা বারণ!'

'আমরা চারজন এই বাড়িতে থাকি। আমার স্ত্রী নন্দিতা—! দাঁড়ান, নন্দিতার সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। পঁচিশ বছর আগে আমরা যখন বিয়ে করেছিলাম তখন ওর বয়স ছিল বাইশ। এই সাতচল্লিশে চেহারাটা খুব খারাপ রাখেনি। হ্যাঁ, আগে খুব ছিপছিপে ছিল, কথাবার্তায় মিষ্টত্ব ছিল। আমারই দোষে সেগুলো নষ্ট হয়েছে। তবে হ্যাঁ, ও যে দুটো বড়বড় ছেলেমেয়ের মা, তা দেখলে বোঝা যায় না। ডাকি ওকে, নন্দিতা, নন্দিতা—!'

'কেন?' ভেতর থেকে গলা ভেসে এল।

'একটু এ ঘরে আসবে?'

প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে উত্তর না পেয়ে নিরাপদ মিত্র আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'আমি অবশ্য সচরাচর এমন ডাকাডাকি করি না। অস্বস্তি হয়। আসলে ছেলে বা মেয়েকে যে গলায় ডাকি, স্ত্রীকে ডাকতে গেলেও তো সেই গলাতেই ডাকতে হয়। ভেবে দেখুন, ব্যাপারটা ঠিক নয়। আমার বাবা তো মাকে কোনদিন নাম ধরেই ডাকেননি।'

এই সময় সালোয়ার কামিজ পরা লম্বা গড়নের একজন ঘরে ঢুকল, 'ডাকছ কেন?'

'তোমাকে নয়, তোমার মাকে।'

'মা সেটাই জানতে চাইল।' মেয়েটার উচ্চারণ খুব স্পষ্ট।

'অ। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'কাজ ছিল!'

'কাজ? ইউনিভারসিটি ছুটি হয় চারটেয় আর রাত সাতটা পর্যন্ত কি কাজ কর?'

'রাত সাতটা নয়, সন্ধ্যে সাতটা।'

'আমার প্রশ্নের এটা উত্তর নয়।'

'বললাম তো কাজ ছিল।'

'না। থাকতে পারে না। বিকেলবেলার পর তোমার বয়সী মেয়ের বাইরে কোন কাজ থাকতে পারে না। যদি দরকার হয়, সেই কাজ দিনের বেলায় করবে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'কেন ?'

'আমার চিন্তা হয়।'

'তোমার ছেলে রাত নটার আগে বাড়ি ফেরে না। তাকে একথা বল না কেন ?'

'আশ্চর্য ! সে ছেলে, নিজের ব্যাপারটা সামলাতে পারে।'

'বাবা, তোমার ধারণা সন্ধ্যে নামলেই কলকাতায় রাস্তায় চিতাবাঘ আর হায়না ঘুরে বেড়ায় ?'

'আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না।'

'না। তুমি আমাকে বোঝাও। সন্ধ্যের পর রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ ঘুরে বেড়ায়। মেয়েরাও কাজের জন্যে বের হয়। তোমার কি মনে হয়, সেইসময় ছেলেরা আমাদের অসম্মান করবে ?'

'করতে পারে।'

'এই ছেলেরা কারা ? শ্যামল বা তোমার মত কারো ভাই অথবা বাবা ?'

নিরাপদ যেন স্তম্ভিত, 'তুমি কি বললে !'

'অবাক হয়ো না। কথাটা সত্যি। যারা মেয়েদের অসম্মান করে তারা আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসে না। আর সেই সব জন্তুগুলো দিনের বেলাতেও সক্রিয় থাকে। বাবা, আমরা এতকাল ভয় পেতাম আর তোমরা সেই ভয়টাকে হাওয়া করতে। কিন্তু এখন দিন বদলে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে তুমি অসুস্থ হলে আমাকেই ডাক্তার ডাকতে বেরুতে হবে। তাই না ?' মেয়েটি বেরিয়ে গেল। নিরাপদ মিত্রকে বেশ বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। নিজেকে সামলে নিতেই বোকার মত হাসলেন। হেসে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার মেয়ে নীপা।'

অবশ্য অতবার বাবা ডাক শুনে আমরা সম্পর্কটা বুঝেই গিয়েছিলাম, তাই এটা না বললেও ওঁর চলত। নিরাপদ মিত্র এক পা এগিয়ে এলেন, 'জানেন মশাই, আজকাল নিজের মেয়েকে ঠিকঠাক বুঝতে পারি না। এমন সব কথা বলে যে, যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা মুশকিল হয়ে পড়ে কিন্তু মানতে কষ্ট হয়। হ্যাঁ, মানি, আজকালকার মেয়েরা আমাদের মা-মাসিমাদের মত নয়, কিন্তু কাগজ খুললেই এত ধর্ষণের ঘটনা চোখে পড়ে যে, বাবা হিসেবে আতঙ্কিত না হয়ে পারা যায় ? বলুন ! যাকগে, মেয়ের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিলাম কিন্তু যাঁকে ডেকেছি

তিনি এখনও এলেন না। শৈশবে দেখেছি ঠাকুর্দা বা বাবার কিরকম কণ্ট্রোল ছিল ফ্যামিলির ওপর। মুখের কথা খসামাত্র কাজ হয়ে যেত। মা বাবার অবাধ্য হয়েছেন, এমন ঘটনার কথা ভাবতেই পারি না। আর আজকাল—। আমিই একমাত্র আর্নিং মেম্বার কিন্তু আমাকেই তোয়াক্কা করে না। মা ভয় পেতেন দেখে আমরাও বাবাকে ভয় পেতাম। এখন ছেলেমেয়েরা মাকে দেখে শিখছে, কি করে বাবাকে অবজ্ঞা করা যায়!'

'ডাকছ কেন?' আধা অন্ধকারে এক মধ্যবয়সিনী প্রবেশ করলেন।

'তোমার মেয়ে আমাকে পাঁচ কথা শুনিয়ে গেল।'

'কেন খোঁচাতে যাও!'

'বাঃ। চমৎকার! রাত করে বাড়িতে ফিরবে আর বললেই দোষ!'

'কেন রাত হল জিজ্ঞাসা করেছ?'

'করেছি। বলল, কাজ ছিল। এটা কোন উত্তর হল?'

'যখন সংসারের কোন কাজ করবে না, তখন ওটাই উত্তর।'

'তার মানে? আমি সংসারের কাজ করি না!'

'কি কর? সকালে বাজারটা আর ইলেকট্রিক বিল জমা দেওয়া টাকা এনে দিচ্ছ বলে সাপের পাঁচ পা দেখেছ! নীপা এ ঘরে আসার আগেই তুমি ডেকেছিলে আমাকে!'

নিরাপদ হাত ছুঁড়লেন, মনে নেই। এ সব শোনার পর কিছু মনে থাকে না। এক এক সময় মনে হয় তোমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিই। এটা কি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। যখনই দেখা হয় তখনই দুরমুশ করছ। আমি যেন পাপোশ, দেখলেই পা ঘষছ।'

'হতে পারে। তোমার সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই। যা বোঝার তা একদিনে বুঝে নিয়েছি। যার সম্পর্কে আগ্রহ নেই তার সঙ্গে প্রেম করা যায় না।'

'ও আচ্ছা! তা তো বলবে। পাবলিক তোমার কথা শুনছে। বুঝে যাচ্ছে তুমি কী চীজ।'

'চীজ! আমাকে তুমি চীজ বললে!'

'নয়তো কি? আমার সঙ্গে যখন কথা বল তখন যেন ড্রাম বাজছে আর যতীন যখন আসে তখন মনে হয় জলতরঙ্গ!

'যতীনবাবু! হাসালে! ওই সিঁড়িঙ্গে লোকটা সম্পর্কে আমার আগ্রহ হবে? তুমি তো এর বেশী ভাবতেও জানো না।' এইসময় কড়া

www.boiRboi.blogspot.com

নাড়ার আওয়াজ হতেই ভদ্রমহিলা দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

নিরাপদ মিত্র আমাদের দিকে তাকালেন, 'এইরকম এক মহিলার সঙ্গে আমাকে ঘর করতে হচ্ছে। আমি অভিযোগ করছি না, নন্দিতা আমি ছাড়া আর সবার কাছে খুব ভাল। কিন্তু আমি আমার দোষটা বুঝতে পারি না। আমি অসৎ নই, মিথ্যে কথা বলি না, কখনও কোন পাপ করিনি। লাস্ট দশ বছর নন্দিতা মেয়ের সঙ্গে শুচ্ছে। মাঝে মাঝে ভাবি আমার সঙ্গে ওর বিয়ে না হলেই ভাল ছিল। ওর সঙ্গে প্রেম করার জন্যে পাড়ার একটি ছেলে ছটফট করত। বাবা মায়ের ভয়ে তাকে প্রশ্রয় দিয়ে পারেনি। এ গল্প বিয়ের দু-বছর বাদে শুনেছিলাম। ছেলেটার নাম কি যেন পার্থ, পার্থ সান্যাল। পার্থর সঙ্গে বিয়ে হলে নন্দিতা সান্যাল হয়ে এখন নিউ জার্সিতে থাকত। নন্দিতাই খবর এনেছে পার্থ এখন আমেরিকান শিল্পপতি। নিরাপদর জায়গায় পার্থ, হতেই পারত। ভাবতেই কেমন লাগে! আচ্ছা, এই নিয়ে নন্দিতার মনে আফসোস নেই তো! মুখে বলেনি কোনদিন, কিন্তু—।'

হঠাৎ ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল, 'বাড়িতে ভূতের মত বসে আছ। সমস্ত পাড়ায় আলো জ্বলছে। ফিউজটা গেছে, এটা চেঞ্জ করতে পারোনি!'

সঙ্গে সঙ্গে নন্দিতার গলা, 'কে করবে? যাঁর করার কথা তিনি তো ওই ঘরে দাঁড়িয়ে কাব্যি করছেন।'

নিরাপদ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এইসময় দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল। ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিলেন তিনি। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার ছেলে ঘরে ফিরলেন। ছেলে না বলে, অপোনেণ্ট বলাই ভাল। ওর সঙ্গে আলাপটা আপনারা নিজেরাই করে নিন। ততক্ষণ আমি হাতমুখ ধুয়ে নিই।'

নিরাপদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমরা চোখ বোলালাম। একটি অতি সাধারণ ড্রইং কাম ডাইনিং রুম। ঘরের দেওয়ালের চুন অনেক জায়গায় খসে খসে গিয়েছে। একটা সস্তা টেবিল এবং চারটে চেয়ার দেখতে পাচ্ছি একপাশে। এ দিকে তিনটে কাঠের চেয়ার মুখোমুখি। নন্দিতা ঘরে ঢুকলেন হাতে দুটো থালা নিয়ে। টেবিলে নামিয়ে রেখে গলা তুললেন, 'খাবার দিয়েছি!' সঙ্গে সঙ্গে নীপাকে দেখা গেল জলের জাগ এবং তিনটে গ্লাস নিয়ে ঢুকতে। ব্যস্ততা বাড়ল। নন্দিতা

কয়েকবার সম্ভবত রান্নাঘরেই গেলেন এবং টেবিলে তিনটে থালায় খাবার ছাড়াও একটা আলাদা পাত্র মাঝখানে রইল। নীপা একপাশে চেয়ার টেনে বসতেই ঘরে শ্যামল এল। মাঝারি লম্বা, ছিপছিপে সুদর্শন, কিন্তু একটু চোয়াড়ে ভঙ্গী আছে। পরনে গেঞ্জি পাজামা। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ঈষৎ ঝুঁকে খাবারের থালার দিকে তাকাল। ওর মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল, 'ওঃ, সেই একঘেয়ে ব্যাপার!'

নন্দিতা বললেন, 'বোস।'

চেয়ার টেনে নিল শ্যামল, 'ধুস্। এ ভাবে খাওয়া যায় না। একদিন একটু ভাল করে রাঁধতে পার না?'

নীপা বলল, 'ওই সয়াবিনের তরকারিটা আমাকে দিও না।'

ছেলে নয়, মেয়ের দিকে তাকালেন নন্দিতা, 'কি দিয়ে খাবে?'

'ডাল দিয়েই হয়ে যাবে।' নীপা হাত বাড়াল।

শ্যামল মায়ের দিকে ফিরল, 'আজ মাংস করতে বলেছিলাম না?'

নন্দিতা হাসার চেষ্টা করলেন, মাংসের কেজি কত করে জানিস?

'যতই হোক, লোকে তো খাচ্ছে!'

'কারা খাচ্ছে, কি ভাবে খাচ্ছে তা আমার জানার দরকার নেই।

তোর বাবা যে টাকা দেয় তা থেকে শেষদিকে মাংস কেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নন্দিতা ঝাঁঝিয়ে উঠে দেখতে পেলেন নিরাপদ ঢুকছে। সেই গলায় তিনি বললেন, 'এ সব কথা রোজ রোজ শুনতে আমার ভাল লাগে না। তুমি জবাবদিহি দাও!'

নিরাপদ চেয়ার টেনে নিলেন। নন্দিতা বসলেন না। নিরাপদ বললেন, 'আমার যা রোজগার তাতে এর চেয়ে বেশী হয় না শ্যামল। তুই পাসটাস করে চাকরি করলে ইচ্ছে মত খেতে পারবি।'

'চাকরি যেন হাতের মোয়া, চাইলেই পাব!' শ্যামল রুটি ছিঁড়ল।

নন্দিতা আরও বিরক্ত হলেন, 'এমন ভাবে কথা বলছিস যখন, তখন কলেজে যাওয়াই বা কেন? তাতেও তো কিছু পয়সা বাঁচে।'

শ্যামল মায়ের দিকে তাকাল, 'আশ্চর্য! তোমরা কেউ সত্যি কথা ফেস করতে চাও না কেন বল তো? আজকাল যেখানে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেও চাকরি পেতে হিমসিম খেতে হচ্ছে, সেখানে আমার কোন চান্স নেই, বুঝলে?'

'ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করার চেষ্টা করছিস কখনও?' নন্দিতা যেন

www.boiRboi.blogspot.com

বাগে পেলেন।

'ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট ইচ্ছে করলেই করা যায় না, তার জন্যে প্রতিভা থাক চাই। বাবা সেকেণ্ড ক্লাসে বি. এ. পাস করেছিল, তুমিও তাই। আমি গাছ থেকে প্রতিভা পেড়ে নেব ?'

শ্যামল কথাটা বলা মাত্র নীপা উঠে গেল খাওয়া শেষ করে। নিরাপদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কি, ওর খাওয়া হয়ে গেল ?'

মাথা নাড়লেন নন্দিতা, আমাকে জিজ্ঞাসা করো না, পাগল হয়ে গেলাম। ওনার সয়াবিনের তরকারিতে গন্ধ লাগে। নবাব কন্যা।'

শ্যামল বলল, 'বাবা মোটেই নবাব নয়। সাধারণ মানুষও বলা যায় না।'

নিরাপদ অবাক হলেন, 'আমি সাধারণ মানুষ নই !'

'না। এখন সাধারণ মানুষ শিখে গেছে বাঁচতে হলে কিভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হয়। যে দুশো টাকা রোজগার করত সে তিনশো পাওয়ার চেষ্টা করে। তুমি যত সব প্রিমিটিভ আইডিয়া নিয়ে বাস করছ। জামাকাপড়ের ইস্ত্রি নষ্ট হয়ে যাবে বাসে চড়লে তাই দু' কিলোমিটার হেঁটে অফিসে যাও। আসলে রোজ দু'টাকা বাঁচাও। কিন্তু তোমার কলিগ শেয়ার ট্যাক্সিতে যায়। সে কি ভাবে টাকা পায় ?'

'যতীন ঘুষ নেয়।'

'তো কি হয়েছে ?'

'তার মানে ? তুই বলছিস কি !'

'আজকাল যখন এ টু জেড ঘুষ নিচ্ছে, তখন তুমি সৎ থেকে আমাদের এই সয়াবিন খাওয়াচ্ছ ! সারা পৃথিবী আজ জেনে গিয়েছে ধরা পড়ে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ঘুষ অত্যন্ত স্বাভাবিক পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে মানুষ একটু সুস্থ-ভাবে বেঁচে থাকতে পারে।'

নিরাপদ স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'শুনছ, ও আমাকে ঘুষ নিতে বলছে ?'

নন্দিতা জবাব দিলেন না।

শ্যামল বলল, 'মানুষের ধ্যানধারণা চিরকাল এক জায়গায় আটকে থাকে না। আজ থেকে দু'শো বছর আগে মেয়েরা পড়বে কেউ ভাবত না। পঞ্চাশ বছর আগে অফিসে চাকরি করার কথা চিন্তা করত না। এখন এ নিয়ে প্রশ্ন কেউ তোলে ? এই যে মা, আচ্ছা, তোমার বয়স এখন

www.boiRboi.blogspot.com

কত বল তো ? পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হবে, তাই না ?'

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওর বয়স নিয়ে তোর কি দরকার ?'

তোমর ঠাকুমা এমন কি তোমার মাকেও ওই বয়সে দেখেছ ? কিভাবে শাড়ি পরত ওরা ! দিদিমা দিদিমা টাইপ না ? অথচ মাকে দ্যাখো ; নীপার সঙ্গে কোন ডিফারেন্স্ পাবে না। এটাই স্বাভাবিক। আর তুমি সেই কথামালা জপে যাচ্ছ।'

নিরাপদ চুপচাপ খাচ্ছিলেন। এবার বললেন, 'দ্যাখো শ্যামল, এইসব কথা, যা তুমি বললে, তা আর আমার সামনে উচ্চারণ করো না। আমি যেভাবে এতদিন চালিয়েছি, বাকি কটা দিন সেইভাবেই চালাবো। শৈশব থেকে তোমাদের যেভাবে বড় করেছি তাতে কষ্ট থাকলেও স্বস্তি ছিল, আনন্দ ছিল। আজ বড় হয়ে যদি তোমার মনে হয়, আমার আচরণের জন্যে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে, তা হলে আমার কিছু করার নেই।'

শ্যামল আর কথা বলল না। নন্দিতা চেয়ার টেনে নিঃশব্দে বসে পড়লেন। কয়েক সেকেণ্ড যাওয়ার পর নন্দিতাই পরিবেশ স্বাভাবিক করার জন্যে বললেন, 'শ্যামল, তোর তো ফাইন্যাল ইয়ার এবার, ইউনিয়ন করা ছাড়।'

খেতে খেতে মুখ না তুলে শ্যামল জিজ্ঞাসা করল, 'চাকরি দেবে কে ?'

'মানে !' নন্দিতা অবাক।

'তোমার কোনো ক্ষমতাবান দাদা বাবা ভাই আছে ?'

'না।' মাথা নাড়লেন নন্দিতা।

'তোমার ?' নিরাপদর দিকে তাকাল শ্যামল।

'আমাকে কেউ হেল্প করেনি কখনও।'

'কারণ তাঁরা সবাই অর্ডিনারি। আজকাল ইনফ্লুয়েন্সিয়াল সোর্স না থাকলে যে চাকরি পাওয়া যায় না তা একটা শিশুও বোঝে। আমার কেউ নেই তাই আমি ইউনিয়ন করছি। নিচু তলার নেতাদের সঙ্গে ভাবসাব হয়ে গেছে। আরও একটু ওপরে উঠলে সোর্সটা অনেক বড় হয়ে যাবে। এখন কেউ ইউনিয়ন রাজনীতি বুঝে যাওয়ার জন্যে করে না, গুছিয়ে নেবার গ্রাউণ্ডওয়ার্ক এটা। উঠছি।' শ্যামল খাওয়া সেরে উঠে দাঁড়াল, 'তোমার সঙ্গে আমার কোনদিন বনবে না বাবা।'

নিরাপদ বললেন, 'হয়তো।'

'কিন্তু আমি আমার কর্তব্য করে যাব।'

'ভাল। তবে না করলেও আমি দুঃখিত নই। তোমাদের বড় করা কর্তব্য, করেছি। কিন্তু তার বদলে আমার কোন প্রত্যাশা নেই। যে যারটা বুঝে নিয়ে ভাল থাকলেই হল।'

শ্যামল আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল। নন্দিতা স্বামীর দিকে তাকালেন, 'কথাটা ভেবে চিন্তে বললে?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়ের বিয়ে দেবার পর তোমার হাতে কিছু থাকবে? রিটায়ারমেণ্টের আর ক'বছর দেরি খেয়াল রাখো! তারপর যদি ছেলে না খাওয়ায়—।'

'তোমাকে খাওয়াবে!'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, একশবার খাওয়াবে। কারণ তোমার মত হাড়ে দুব্বো গজানো কথা ওদের সঙ্গে আমি বলি না। তখন দেখব তুমি কি কর!' রাগত নন্দিতা থালা গ্লাস তুলতে তুলতে কথাগুলো বলে ওগুলো নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিরাপদর হাতে তখন জলের গ্লাসটা। তাঁর থালা ভেতরে চলে গিয়েছে। জলটা গলায় ঢেলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কয়েক পা এগিয়ে এলেন আমাদের সামনে, 'এই হল আমার সংসার। সবাই সবার মত ভাল। কিন্তু। তা এরকমটা চলে যেত। কিন্তু আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। আজ সকালে একটা পোস্টকার্ড পেয়েছি। ওটা এসেছে কুচবিহার থেকে। যখন অফিসে বেরুচ্ছিলাম তখন পিওন আমার হাতে দিল। ওটা পাওয়ার পর আমি যাকে বলে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। কাউকে বলতে পারছি না। কি বলব? বললে তো অনেক কথা বলতে হয়। আমি মিথ্যে কথা বলি না। কিন্তু এই সত্যি কথাগুলো কেউ বিশ্বাস করবে? ধ্যানধারণা বদলাচ্ছে! ঘেঁচু। মানুষ আদ্যিকালেও সন্দেহ করতে ভালবাসত এখনও বাসে। কিন্তু চেপে যাওয়ার উপায় নেই। সর্দি অথবা বসন্ত যেমন শরীর থেকে বের হবেই, এও তেমন। এখন যে চিঠি লিখে বারণ করব তার উপায় নেই। নিজের মুখে বললে অনেক কথা বলতে হয় তাই সন্ধ্যেবেলায় পোস্টকার্ডটা আমাদের লেটারবক্সে ফেলে এসেছি। ওরাই বাক্সটা খুলুক, দেখুক। তারপর যা হয় হবে।'

মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। আবার আলো ফুটলে দেখলাম পেছনের জানালা খোলা। ওই একই ঘর কিন্তু জানলার বাইরে সকালের কচি

www.boiRboi.blogspot.com

আলো। সময়টা সকাল বলেই মনে হচ্ছে। একটা পোস্টকার্ড পড়তে পড়তে নীপা ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল, 'চিঠি এসেছে।'

নন্দিতার গলা পাওয়া গেল, 'কার?'

নীপা মন দিয়ে পড়তে লাগল। জবাব দিল না।

ঘুমঘুম চোখে শ্যামল ঘরে ঢুকল, 'কার চিঠি রে?'

'অদ্ভুত!' নীপা বলল, 'মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। মা, এ ঘরে এসো!'

নন্দিতা ঢুকলেন। নীপা বলল, 'বাবার নামে চিঠি এসেছে।'

'কে লিখেছে?'

'কল্যাণী।'

'সে আবার কে? কোথায় থাকে?'

'কুচবিহার।'

'কুচবিহার! ওখানে ওর কেউ থাকে বলে জানতাম না তো! কি লিখেছে? পড়!'

নীপা পড়তে শুরু করল, শ্রীচরণকমলেষু, আশাকরি ভাল আছ। দীর্ঘ তিরিশ বছর পর নিতান্ত বাধ্য হয়ে তোমাকে চিঠি লিখছি। অনেক কষ্টে তোমার ঠিকানা পেয়েছি। আশা করছি তুমি আমাকে ভুলে যাওনি। আমার একমাত্র মেয়ে মালবিকা অসুস্থ। এখানকার ডাক্তার রোগ ধরতে পারছে না। তারা কলকাতায় যেতে বলছে অথচ সেখানে আমার কোনও ভরসা নেই। তাই তোমার সাহায্য চাই। আমরা আগামী মঙ্গলবার তিস্তা তোর্সায় রওনা হব। যদি তোমার আপত্তি থাকে তাহলে অবিলম্বে জানাও। প্রণাম নিও। ইতি, কল্যাণী।'

নন্দিতার মুখ থেকে শব্দ ছিটকে বের হল, 'কি আশ্চর্য! এখানে এসে উঠছে নাকি?'

নীপা বলল, 'বাবার কাছে সাহায্য চেয়েছে।'

শ্যামল বলল, 'আর লোক পেল না? বাবা কাকে চেনে?'

নন্দিতা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন, 'কোথাকার কে, ফস করে লিখে দিল যে আসছে!'

নীপা বলল, 'বাবার কোন দূর সম্পর্কের আত্মীয়া?'

নন্দিতা অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাত উল্টে বললেন, 'কে জানে!'

এই সময় বাজারের ব্যাগ হাতে নিরাপদ ঘরে ঢুকে বললেন, কাঁচা

www.amarboi.blogspot.com

লঙ্কা আবার আকাশছোঁয়া হয়ে গেল।'

'কল্যাণী কে?' নন্দিতা প্রশ্নটা ছুঁড়ল।

'কল্যাণী—!'

'চিঠিটা দে নীপা।'

নীপা চিঠিটা এগিয়ে দিতে নিরাপদ সেটায় চোখ রাখলেন।

'কল্যাণী বলে কাউকে চেন না?'

'চিনতাম।'

'সে কে?'

'মালদায় থাকত। কুচবিহারে গিয়াছে জানতাম না।' নিরাপদ বললেন, মালদার মোকদমপুরে আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত। আমি তখন কলেজে পড়ি আর ও, কত হবে ক্লাস নাইন টেন—। অবশ্য সেই কল্যাণী আর এই কল্যাণী এক কিনা বলতে পারব না।'

নীপা বলল, 'লিখেছে তিরিশ বছর পরে চিঠি লিখেছে, তাহলে এক হতেই পারে। বিয়ের পর মালদা থেকে কুচবিহার চলে গেছে।'

'হতে পারে। ওর বিয়ের আগেই আমরা কলকাতায় চলে আসি।'

নন্দিতা আর পারছিলেন না, 'তোমার সঙ্গে কি সম্পর্ক ছিল?'

'সম্পর্ক? তখন আর কি সম্পর্ক হবে! আমায় কাছে অঙ্ক করতে আসত।'

'তুমি ওকে পড়াতে?'

'টাকা নিতাম না, দেখিয়ে দিতাম।'

'কোন সম্পর্ক না থাকলে এতদিন পরে এখানে এসে ওঠে?'

'এখানে ওঠার কথা তো লেখেনি।'

'আর কি লিখবে? শোন, এখানে ওর ওঠা চলবে না। আজই লিখে দাও।'

'বেশ। কিন্তু—।'

'আবার কিন্তু কিসের!'

'যা লিখেছে তাতে তিস্তা তোর্সায় আজই পৌঁছবার কথা। মঙ্গলবার রওনা হলে বুধবার, বুধবার তো আজই। চিঠি আসতে অনেক সময় লেগেছে।'

'সে কি!' নন্দিতা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'তাহলে কি হবে?'

শ্যামল বলল, 'চেঁচাচ্ছ কেন? যদি আসে, চা খেতে দিও, ফ্রেস হয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

গেলে নিজেরাই বলবে কোথায় যাবে! আফটার অল বাবার পরিচিত।'

'তিস্তা তোর্সা কখন আসে বাবা?' নীপা জিজ্ঞাসা করল।

'সকালে।' নিরাপদ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

নীপা চোখ বড় করল, বাবা ট্রেনের টাইম পর্যন্ত জানে।'

'গার্ল ফ্রেন্ড আসছে তো! শ্যামল আস্তে করে বলল।

'আসাচ্ছি। উঃ। পেটে পেটে এত! এতবছর ঘর করছি, কখনও বলেনি। নন্দিতা গজগজ করতে করতে চলে গেলেন।

শ্যামল বলল 'আমার না কেমন সন্দেহ হচ্ছে বাবা পোস্টকার্ডটার খবর জানত!'

হ্যাঁ রে! সিলমোহর না দেখেই সব বলে দিল চিঠি আসতে সময় লেগেছে।'

'প্লাস, তিস্তা তোর্সার সময় আগে থেকে জানার কোন কারণ নেই। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে। একটা ট্যাক্সির শব্দ হল মনে হচ্ছে! দাঁড়া, দেখি।'

'মুখ ধুসনি, ভূতের মত বাইরে যাচ্ছিস? তুই বাথরুমে যা, আমি দেখছি। ও হ্যাঁ, বাবার ঘরে একটা নতুন তোয়ালে আছে, ওটা বাথরুমে রেখে দে। গামছাগুলোর যা অবস্থা!' নীপা ভাইকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

শ্যামল গালে হাত বোলালো, তারপর জানলায় গিয়ে দাঁড়াল, আই বাপ! তারপর উত্তেজিত গলায় ডাকল, 'মা, মা।'

নন্দিতা এলেন, 'কি হল?'

'এসে গেছে!'

'সেকি!'

'হ্যাঁ, বেডিং নিয়ে এসেছে। তোমার বয়সী মহিলা। ফর্সা, সঙ্গে একটা মেয়ে। দেখে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে না।'

'মনে হচ্ছে না?'

'না। দিব্যি নীপার সঙ্গে কথা বলছে।'

'বলাচ্ছি।'

'মা, তুমি আবার ওদের সামনে রাগ করো না। আফটার অল দে আর কামিং ফ্রম কুচবিহার। নীপা সুটকেশ নিয়েছে, ভদ্রমহিলা বেডিং।

'তুই এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?'

www.boiRboi.blogspot.com

'বাথরুমে যাব। যাচ্ছি।' শ্যামল হড়বড়িয়ে চলে গেল ভেতরে।

নন্দিতা কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ছেঁড়া কাপড় তুলে টেবিল পরিষ্কার করতে লাগলেন, চেয়ার-গুলো ঝাড়লেন। এবং তখনই নীপা স্যুটকেশ হাতে ঢুকল, 'মা!'

বেডিং নিচে নামিয়ে কল্যাণী হাত জোড় করলেন, 'নমস্কার!'

নন্দিতা প্রতিনমস্কার করলেন। তাঁরই বয়সী হতে পারে কিন্তু ভারী চেহারা। মাথায় সিঁদুর নেই, লক্ষ্য করলেন। নীপা বলল, 'আমি বলেছি আমরা আজই চিঠি পেলাম।'

কল্যাণী বললেন, শুনে খুব খারাপ লাগছে—।'

'না, ঠিকই আছে, বসুন। তোমার নাম কি?'

সতেরো আঠারোর মেয়েটি শান্ত গলায় জবাব দিল, 'মালবিকা।'

'ওরই চিকিৎসার জন্যে আসা। আপনাদের তো চেনার কথা নয়, যিনি চিনতেন তিনি এখন আমাকে দেখলে চিনতে পারবেন কিনা সন্দেহ হচ্ছে। অনেককাল আগের কথা তো?'

'বাবা চিনতে পেরেছেন। আপনি বাবার কাছে পড়তে যেতেন তো!

'যাক, মনে আছে তাহলে!'

'মা, বাবা কোথায়? বাবা, বাবা!' নীপা চেঁচালো।

নন্দিতা বললেন, 'বসুন।'

এই সময় নিরাপদ ঘরে এলেন। তাঁর চোখে মুখে বিস্ময়। বিস্ময় কল্যাণীর মুখেও। প্রথম কথা বললেন কল্যাণীই, 'তুমি প্রায় একই রকম আছ নিরাপদদা।'

'একই রকম কি থাকা যায়, বয়স হচ্ছে না।'

'আমাকে চিনতে পারছ?'

'মুখ পাল্টায়নি, মোটা হয়ে'ছে।

'এই আমার মেয়ে। বাঁ হাতে প্রণাম করা ঠিক নয়, তাই প্রণাম করতে পারছে না।'

'কেন? ডান হাতে কি হয়েছে?'

'ওই তো মুশকিল। ডাক্তাররা ধরতে পারছে না। ডানহাত নাড়তেই পারেছে না ও। যা করার বাঁ হাতে করতে হচ্ছে। অথচ ডান হাত একটুও অবশ হয়নি।'

নীপা বলল, 'মালবিকা, তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

www.boiRboi.blogspot.com

মালবিকা তার মায়ের দিকে তাকাল। কল্যাণী বললেন, 'নিরাপদদা কলকাতায় আমার কোন আত্মীয়স্বজন নেই। ওর চিকিৎসার জন্যে আমাকে কিছুদিন এখানে থাকতে হবে। একজন ভাল ডাক্তার আর থাকার ব্যবস্থা তুমি করে দাও।'

'আমি তো তেমন কাউকে—!' বিড়বিড় করলেন নিরাপদ।

'ব্যবস্থা হয়ে যাবে। শ্যামলের গলা পাওয়া গেল। পরিষ্কার হয়ে সে ঘরে ঢুকল, 'আমাদের ইউনিয়নের একটি ছেলের বাবা নামকরা নার্ভের ডাক্তার, আপনি চিন্তা করবেন না। মা, এঁরা এখনও দাঁড়িয়ে আছেন, কিরে নীপা—।'

'আপনার ছেলে? কল্যাণী নন্দিতার দিকে তাকালেন।

শ্যামলই জবাব দিল, 'হ্যাঁ। ও বড় আমি ছোট। এবার বি. এ দেব।'

নন্দিতা কিছুই বলতে পারলেন না, তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

শ্যামল বলল, 'মা ওনাকে নিয়ে যাও। কতদূর থেকে এসেছেন ফ্রেস হওয়া দরকার।'

কল্যাণী শ্যামলের দিকে তাকিয়েছিলেন। এবার নন্দিতার কাছে এলেন, 'আপনার ছেলে কিন্তু নিরাপদদার ধরনটা পায়নি, বরং মেয়ের সঙ্গে খুব মিল আছে। আচ্ছা বউদি, আমি এভাবে এসে পড়ায় আপনার তো কোন অসুবিধে হয়নি?'

'ওমা! আমার অসুবিধে হবে কেন? আসুন। আসলে এখানে জায়গার বড় সমস্যা। সেই আদ্যিকালের বাড়িটাকে বাড়াবার কোন চেষ্টা করেননি আপনার দাদা।' নন্দিতা উঠলেন। কল্যাণীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মালবিকার বাবা—?'

'পাঁচ বছর।'

'ও!' নন্দিতাকে সত্যি বিমর্ষ দেখাল। তিনি কল্যাণীকে নিয়ে চলে গেলেন।

শ্যামল বেডিংটাকে নিয়ে এল একপাশে। এইসময় নিরাপদ ঢুকলেন। ছেলেকে বেডিং সরাতে দেখলেন, 'তোর মাকে জিজ্ঞাসা কর বাজার থেকে কিছু আনতে হবে কিনা।'

'এই তো বাজার করে নিয়ে এলে!'

'হ্যাঁ, তবু, মানে ওরা—।'

www.boiRboi.blogspot.com

'হলে মা বলবে।' শ্যামল বেরিয়ে গেল।

নিরাপদ চেয়ারে বসলেন। চোখ বন্ধ করলেন। নন্দিতা যে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তা টের পাননি। নন্দিতা বললেন, 'বসে না থেকে বেরোও।'

চমকে চোখ খুললেন নিরাপদ, 'মানে?'

'একটা মোটামুটি হোটেল খুঁজে এসো।'

'হোটেল? এ পাড়ায় হোটেল আছে নাকি?'

'যে পাড়ায় আছে, সেখানে যাও।'

'আমার অফিস?'

'খুঁজতে দেরি হলে যাবে না। সি এল নেবে।'

'বেশ। কিন্তু ওরা দুটি মেয়ে হোটেলে থাকবে, ঠিক হবে?'

'বাঃ, চমৎকার! আমাকে যখন একা আড়িয়াদহে যেতে বল, তখন এমন দুশ্চিন্তা হয় না! আমি কোন কথা শুনতে চাই না, আজ বিকেলেই ওদের বিদায় করো।

'আস্তে কথা বল নন্দিতা!'

'তোমাদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন ভিলেনের মত আচরণ করছি।' নন্দিতা গলা নিচে নামালেন, 'আমি তোমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করিনি বিয়ের আগে কতটা প্রেম ছিল? সেই প্রেম স্বর্গে ছিল না মাটিতে নেমেছিল! বুক জ্বলে যাচ্ছে তবু জিজ্ঞাসা করিনি। কারণ কি জানো?'

নিরাপদ নীরবে মাথা নেড়ে না বললেন।

'ওই যে, আমি কখনও মিথ্যে বলি না, পাপ করি না—! ফস করে যদি সত্যি কথাটা বলে ফেল তা হলে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো!'

'সত্যি কথা?'

'নইলে কোন জোরে এত বছর বাদে এখানে এসে ওঠে? তার ওপর স্বামী নেই, সোনায় সোহাগা।'

'স্বামী নেই মানে?'

'পাঁচ বছর আগে বিধবা হয়েছেন। তার আগে থেকেই স্কুলে পড়ান।'

'ও।'

'শুনে দুঃখু উথলে উঠছে?'

www.boiRboi.blogspot.com

'যা তা বকছ !'

'শোন, আমার এখানে তিনটে ঘর। একটায় আমি আর নীপা শুই আর একটাতে তুমি আর শ্যামল। এই ঘরটায় কেউ শুতে পারে না। পারে ?'

'এমনিতে পারার কথা নয়। রাত্তিরে আরশোলা বের হয়। ওদের আমি আমার শোওয়ার ঘরে ঢোকাতে পারব না।'

'আচ্ছা !'

'যাও, ওঠো, হোটেল খুঁজে এসো। যাও !'

নিরাপদ উঠলেন এবং নীপা ঢুকল, 'মা, মেয়েটা খুব ভাল।'

নিরাপদ মেয়ের দিকে তাকালেন।

'ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছে। চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। আমি অনেক বলতে একটু শোনাল। বেচারা ডান হাতটা একদম নাড়াতে পারে না। কথা বলে নিচু গলায়। খুব কষ্টে আছে।'

'আর কিছু ?' নন্দিতা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আহা, একটা ভাল মেয়েকে ভাল বলব না ?'

নিরাপদ বললেন, 'যাই ?'

'শ্যামল এল ঘরে, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

'হোটেল খুঁজতে।'

'ইটস টু মাচ। অসুবিধে হলে আমাকে বল আমি গেস্ট হাউস ঠিক করে দেব।'

'গেস্ট হাউস ?' নিরাপদ অবাক।

'হ্যাঁ। পার্টির লোকেদের ওসব জানাশোনা আছে। খরচ কম হবে।'

'তাহলে তো হয়ে গেল।'

'মা, মালবিকাকে আজ যাতে ডাক্তার দেখানো যায় তার ব্যবস্থা করছি। বুঝলে।'

নন্দিতা কোন কথা না বলে ভেতরে চলে গেলেন। নিরাপদ বললেন, 'কী যে সব হয়ে গেল বল তো।'

নীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কি আবার হবে !'

'ওরা এল, তোদের মায়ের অসুবিধে হবে বুঝতে পারছি— !'

'মা প্রথম প্রথম ওরকম করে, পরে ঠিক হয়ে যাবে। তোমার বন্ধু, বিপদে পড়েছে— ।'

www.boiRboi.blogspot.com

'বন্ধু ?'

'বাঃ, একই পাড়ায় থাকতে, তোমার চেয়ে তো বেশী ছোট নয়।'

'আমাদের সময়ে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের বন্ধুত্ব হত না।'

'কেন ?'

'বড়রা সেটা স্বাভাবিক চোখে দেখত না।'

'তাহলে মেলামেশা করলে কি বলা হত ?'

'ভাইবোনের সম্পর্ক ভাবা হত।'

'উনি তোমাকে দাদা বলে চিঠি লিখেছেন, ওই নিয়মেই ?' নীপা হাসল।

'নিয়ম আবার কি ! যখনকার যা চল।'

শ্যামল হেসে ফেলল, 'সমবয়সী হলে ?'

'কথাই হত না। হলে সেটা স্বাভাবিক বলে গণ্য করা হত না।'

নীপা হাসল, 'তাহলে কল্যাণীপিসিকে তোমার গার্লফ্রেন্ড বলা যাচ্ছে না ?'

'বললাম তো, আমাদের সময় ওসবের রেওয়াজ ছিল না।'

শ্যামল ঝাঁকিয়ে উঠল, 'তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন মান্ধাতার বাবার আমলের লোক। তিরিশ বছর আগে, মানে নাইনটিন সিক্সটি টু, উত্তমকুমার সুচিত্রা সেনের ছবি সুপারহিট, 'এই পথ যদি না শেষ হয়' গান গাওয়া হয়ে গেছে। গুল মারছ। আমি বেরুলাম। মালবিকার ডাক্তার ঠিক করে আসি।' শ্যামল চলে গেল।

নীপা পাশে এসে দাঁড়াল 'হ্যাঁ বাবা, ষাট একষট্টিতে অপুর সংসার বেরিয়ে গেছে।'

'তো কি হয়েছে ?'

'যুগটা প্রাচীন ছিল না।'

'ওটা সিনেমায়, জীবনে নয়। তখন সন্ধ্যের পর কোন মেয়েকে ট্রামে দেখা যেত না।'

'তোমার কথা শুনলে মনে হচ্ছে সতীদাহ প্রথা যখন চালু ছিল তার থেকে ওই সময়টা খুব বেশী এগোয়নি।' নীপা চলে যাচ্ছিল। নিরাপদ তাকে ডাকলেন, 'শোন।'

নীপা দাঁড়াল।

নিরাপদ বললেন, 'কখনও কখনও এগোয় না। এই যেমন তোর মা।

www.boiRboi.blogspot.com

রামমোহনের সময় একজন মা যেভাবে রিঅ্যাক্ট করতেন বিরানব্বইতে ইনি একইভাবে করছেন।'

'ছাই। মা ভয় পাচ্ছে খরচ কুলোতে পারবে না ভেবে। তুমি এক্সট্রা দেবে না।' নীপা বেরিয়ে গেল। একটু চুপ করে বসে নিরাপদ পাঞ্জাবিটা খুলতে গিয়ে সামলে নিলেন কল্যাণীকে ঢুকতে দেখে। হাসার চেষ্টা করলেন।

'তোমার অফিসের দেরি হচ্ছে না তো নিরাপদদা?'

'না, না।'

'বিশ্বাস করো কোন উপায় ছিল না।'

'আরে ঠিক আছে।'

'তুমি কিন্তু বেশী পাল্টাওনি। শুধু চুল কমে গিয়েছে। কী সুন্দর কোঁকড়া চুল ছিল তোমার! ঢেউ খেলানো, সামনে সিঙাড়া। আমরা উত্তমকুমার বলতাম, মনে আছে।'

'হুঁ।'

'সব চলে যায়।' নিঃশ্বাস ফেললেন কল্যাণী, আমার কথা তোমার মনে ছিল?'

নিরাপদ ঢোঁক গিললেন, 'ওই, মানে, ছেলেবেলার কথা মনে হলে—।'

'ব্যাস?'

'আসলে সংসারের চাপে দম ফেলার উপায় নেই।'

'তোমার ছেলেমেয়ে দুটি খুব ভাল। ওদের মা-ও।'

'মালবিকার বাবার কি হয়েছিল?'

'আট বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। দুবার স্ট্রোক হয়েছিল। তৃতীয়বারে চলে গেলেন।'

'ও। সব একাই সামলাতে হচ্ছে?'

'দোকা কোথায় পাব? মেয়েটার বিয়ে দেব ভাবছিলাম, তা দ্যাখো এই কাণ্ড। ওই মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে?'

'কি করে হল?'

'হঠাৎই।'

'নিরাদা, তোমার মনে আছে, তুমি আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলে?'

'চিঠি?'

'হ্যাঁ। আমি যেন মন দিয়ে পড়াশুনা করি, বাচাল না হই, পাড়ার

www.boiRboi.blogspot.com

যেসব ছেলে আমার সম্পর্কে আগ্রহী তাদের পাত্তা না দিই, এসব উপদেশ দিয়েছিলে। চিঠিটা আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। খুব রাগ হয়েছিল, তাও।'

'হ্যাঁ, তুমি খুব ছটফটে ছিলে।'

'আর ?'

'মাথায় গোবর ছিল। তিনচারবার করে বোঝাতে হত।'

'আমি জানি নিরাদা আমাকে দেখে তুমি খুশী হয়েছ। কিন্তু তুমি ভাল নেই।'

'যা বাজার, তাতে ভাল থাকা যায়! বড় চাকরি তো পেলাম না।' নিরাপদ উঠে দাঁড়ালেন। নীপা চায়ের দুটো কাপ নিয়ে এল, 'মালবিকা চা খায় তো ?'

'মাঝে মাঝে।' কল্যাণী জবাব দিলেন।

'মালবিকা, এঘরে এসো।' নীপা চেঁচালো।

'বাবাকে চা দেবে না ?'

'বাবা এককাপ খেয়েছে আর খাবে না। পিটপিটে আছে তো।'

'মালবিকা এল। নীপা বলল, নাও, তোমার চা।'

মাথা নাড়ল মেয়েটি, লাজুক হাসল।

'তাহলে কি খাবে ?'

'কিছু না।'

নিরাপদ বললেন, 'ওকে মুড়ি এনে দে। আর চা বেশী হলে আমাকেই দিতে পারিস!'

নীপা অবাক হয়ে বাবাকে কাপটা দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে নিরাপদ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি নাকি খুব ভাল গান গাও ?'

'না, না।' লজ্জা পেল মালবিকা।

'শুনলাম। একদিন শুনতে হবে তোমার গান।'

কল্যাণী বললেন, 'কুচবিহারে ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রথম হয়েছে। এই হাতের ব্যাপারটা হওয়ার পরই সব থামাতে হচ্ছে।'

নীপা এল একবাটি মুড়ি নিয়ে। টেবিলে রেখে ইশারা করল মালবিকাকে। কল্যাণী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি পড় ?'

'এম. এ.। জি আর ই দিয়েছি।'

boiRboi.blogspot.com

'সেটা কি ?'

নিরাপদ জবাব দিলেন, 'পাগলামি। আমেরিকায় পোস্টগ্র্যাজুয়েট পড়তে যাওয়ার জন্যে একটা পরীক্ষা দিতে হয়। ও জোর করে দিয়েছে।'

'জোর করে কেন ?'

'আমাদের ঘরের মেয়ে কি আমেরিকায় পড়তে যেতে পারে ?'

'ওরা পড়ার খরচ দেবে না। মানে স্কলারশিপ ?'

'তা হয়তো দেবে। কিন্তু প্লেন ভাড়া দেবে কে ?'

'যদি পাস করে তাহলে তোমার দেওয়া উচিত নিরাপদদা।'

কল্যাণীর কথার শেষে নন্দিতা ঢুকলেন, 'কেন ? এদেশে এম. এ. পড়া যায় না ?'

নীপা বলল, 'যায়। তারপর আর কিছু হয় না। আর ওদেশে পড়াশুনা করে কেউ বেকার বসে আছে এমন একটা উদাহরণ দেখাতে পারবে না।'

নন্দিতা মাথা নাড়লেন, 'অদ্ভুত। দেখুন তো ভাই, ওই একা মেয়ে অদ্দুরে যাবে ? কোনদিন একা বর্ধমানেও যায়নি। আমি তো প্রার্থনা করছি ও যেন পাস না করে।'

'তা তো করবেই। মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু হয়।'

কল্যাণী বললেন, 'অবশ্য খরচের দিকটাও দেখতে হবে।'

'খরচ ?' নীপা মুখ ফেরাল, 'আমার বিয়েতে বাবা খরচ করত না ?'

কল্যাণী মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, করতেই হবে।'

'সেটা না করে প্লেন ভাড়া দিয়ে দিক, অনেক কমে হয়ে যাবে।'

'অদ্ভুত কথা! তারপর বিয়ের সময় কি হবে ?' নন্দিতা চেঁচিয়ে উঠলেন।

'সেটা আমি বুঝব। তোমাদের চিন্তা করতে হবে না।' নীপা গম্ভীর মুখে বলল, 'মেয়েরা বড় হলে বিয়ে ছাড়া তোমরা চিন্তা করতে পার না ? যেন বিয়ে দিলেই কাঁধ থেকে বোঝা নামাতে পারলে। সেই বিয়ে ক্লিক না করলে তো জীবনটাই নষ্ট তা ভাবতে চাও না। তা ছাড়া, বিয়ে ছাড়া মেয়েদের অনেক কিছু করার আছে, এটা বুঝতে চেষ্টা কর।'

নন্দিতা রেগে গেলেন, 'ঠিক আছে ও যদি পাস করে তাহলে প্লেন ভাড়া দিয়ে দিও। তারপর কোন প্রয়োজন হলে আমাদের কাছে এসো না।'

www.boiRboi.blogspot.com

কল্যাণী বললেন, ওদেশে যদি আত্মীয়স্বজন থাকে, তাহলে একা গেলে তেমন অসুবিধে হবার কথা নয়। কেউ নেই ?'

নিরাপদ মাথা নাড়লেন, 'আমাদের ফ্যামিলির কেউ বিদেশে যায়নি।'

নীপা বলল, 'আমার মামার বাড়ির দিকেও কেউ নেই। অথচ আমার বন্ধুদের কেউ না কেউ লণ্ডনে অথবা নিউ ইয়র্কে থাকে।'

'নিউ ইয়র্ক। না, নিউ জার্সি—।' উচ্চারণ করেই থেমে গেলেন নিরাপদ।

'নিউ জার্সি মানে ?' নীপা জিজ্ঞাসা করল।

'ওটা আমেরিকার একটা জায়গার নাম।'

'সেটা জানি। সেখানে তোমার পরিচিত কেউ থাকেন ?'

'আমার নয়।' নিরাপদ ফাঁপরে পড়লেন, 'তোর মায়ের পাড়ায় একজন থাকত, সে এখন ওখানে আছে। খুব বড় শিল্পপতি।' নিরাপদ বলে ফেললেন।

'আমার পাড়ায় ? কি যা তা বলছ ?' নন্দিতা খেঁকিয়ে উঠলেন।

নিরাপদ স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'তোমার এখন মনে নেই।'

'আশ্চর্য ! আমার মনে নেই আর তুমি মনে রেখে বসে আছ ! তুমি দেখেছ তাকে ?'

'না। তুমি বলেছিলে।'

'আঃ, নামটা বলবে তো ?'

'পার্থ। পার্থ সান্যাল।' নিরাপদ স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করলেন।

'অসম্ভব।' শব্দটা ছিটকে এল নন্দিতার মুখ থেকে।

'অসম্ভব কেন ?' নীপা জানতে চাইল।

'ওঃ। তুমি ! তুমি এখনও মনে করে রেখেছ ? ওর ওখানে নীপা যাবে ?'

নিরাপদ মাথা নাড়লেন, 'যাবে বলিনি। কারো নাম মনে পড়ছিল না বলে ওর কথা মনে এল। তা ছাড়া, ভদ্রলোক তো আমারই বয়সী। ওখানে এখন প্রতিষ্ঠিত।'

'আপনাদের আত্মীয় ?' কল্যাণী জানতে চাইলেন।

'না, না। পাড়ায় থাকত। বাজে টাইপের ছেলে। মেয়েদের দেখলেই পেছনে লাগত।' নন্দিতার গলায় একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ল।

www.boiRboi.blogspot.com

'ছেলে বলছেন ?' কল্যাণী একটু অবাক।

'তিরিশ বছর আগে ছেলে ছিল, এখন প্রৌঢ়।' নিরাপদ বললেন।

নীপা হেসে উঠল শব্দ করে, 'মা তুমি একটা যাচ্ছেতাই! তিরিশ বছরে মানুষ সব কিছু পাল্টে যায়। ভদ্রলোক ওদেশে প্রতিষ্ঠিত মানে কি বোঝ না ?'

নন্দিতা বলতে বাধ্য হলেন, 'এতগুলো বছর আমি যাকে জানি না, তার কাছে তুই যাবি। তার ঠিকানাও আমার জানা নেই।'

'ঠিকানা বের করতে অসুবিধে কি ? আড়িয়াদহে নিশ্চয়ই ওঁর আত্মীয়স্বজন থাকেন। তাঁরাই বলে দেবেন। আমি ঠিকানা জোগাড় করে আনছি তুমি একটা চিঠি লিখবে মা ? প্লিজ।' নীপা আবদার করল।

'মরে গেলেও না।'

এই সময় শ্যামল ঢুকল, 'গম্ভীর ব্যাপার মনে হচ্ছে!'

নীপা বলল, 'দ্যাখ না শ্যামল, মায়ের ছেলেবেলার একজন এখন আমেরিকায় থাকে, একবারও বলেনি। আমি যদি পাস করে ওখানে যাই ভদ্রলোকের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। মাকে বলছি একটা চিঠি লিখে ভূমিকা করে রাখতে, মা রাজি হচ্ছে না।'

'নো কমেণ্টস। বাবাকে ওই ব্যাপারে কথা বলে অনেক জ্ঞান শুনেছি আর ফারদার ভিক্টিম হতে চাই না। হ্যাঁ, পিসিমা আপনার ব্যবস্থা হয়েছে।'

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল শ্যামল ?'

'আজ বিকেলে ডক্টর এস কে সেন মালবিকাকে দেখবেন। ভদ্রলোকের এক মাস আগে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পাওয়া যায় না। ম্যানেজ করেছি। আর আমার বন্ধুর বাবার একটা গেস্ট হাউস আছে, সেখানে দিন কয়েক থাকতে পারবেন। খুব সামান্য চার্জ।'

'এখনই যাওয়া যাবে তো ?' কল্যাণী খুব খুশী।

'ইচ্ছে হলে যেতে পারেন।' শ্যামল যেন রাজ্যজয় করে এসেছে।

'সে কি ? এখনই যাবেন মানে ?' নন্দিতা প্রতিবাদ করলেন।

'না, ও বলছে যখন—।' কল্যাণী থতমত।

'বলুক। এ বাড়িতে পা দিয়ে ভাত না খেয়ে যাওয়া চলবে না। আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে বুঝলেন ?' নন্দিতা জোর গলায়

www.boiRboi.net

বললেন।

'পিসিমা থাকুন, কিন্তু আমি বিয়ে করব না মা। শুধু তুমি চিঠিটা লেখ।'

সবাই হেসে উঠল। নন্দিতা রাগ করে ভেতরে চলে গেলেন। শুধু হাসলেন না নিরাপদ। তাঁকে চোর চোর দেখাচ্ছিল।

এখন বিকেল। দৃশ্যান্তর হওয়ায় দেখা গেল সেই একই ঘর। নন্দিতা চুপচাপ বসে আছেন। কোথাও কোন শব্দ নেই। নিরাপদ প্রবেশ করলেন, 'গেস্ট হাউসটা খারাপ নয়। শ্যামল আর নীপা ওখানেই থেমে গেল। পরে আসবে।'

নন্দিতা কথা বললেন না। নিরাপদ এক পা এগোলেন, 'কি হয়েছে?'

'এইভাবে নিজের গায়ের জ্বালা মেটালে?'

'মানে?'

'ছেলেমেয়ে, এমনকি ওই মহিলার সামনে অপমান করলে?'

'কি বলছ?'

'কি বলছি তা বুঝতে পারছ না, না? এতকাল ভাবতাম সরল গোবেচারা। ভুল ভাবতাম। পেটে পেটে তোমার এত ছিল? ছিঃ!'

'নন্দিতা—?'

'তুমি আমাকে অপমান করেছ!'

'কিভাবে?'

'ওই মহিলাকে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে বলায় তুমি প্রতিশোধ নিলে পার্থর কথা তুলে। তুমি আমাকে সন্দেহ কর?'

'না।'

'নিশ্চয়ই কর। তিরিশ বছর ধরে তুমি আমার সঙ্গে অভিনয় করে এসেছ ভালমানুষের, মনে মনে সন্দেহ করেছ। আজ সুযোগ বুঝে সেটা ব্যবহার করলে।'

'তুমি ভুল করছ।'

'ভুল? আমার মেয়েকে তুমি পার্থ সান্যালের সাহায্য নিতে পরামর্শ দিচ্ছ! তুমি জানো, পার্থকে আমি কোনদিন প্রশ্রয় দিইনি। সে যখন জানবে আমার মেয়ে তার কাছে যাচ্ছে তখন—। ওঃ, আমি ভাবতেও পারি না। শোন, তোমার সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

pathagar.blogspot.com

'কি বলব।'

'ওই মহিলা আসায় তুমি খুশি হওনি? আমি তোমার কাঁটা?'

'দ্যাখো, তুমি তো প্রায়ই বল আমার সম্পর্কে তোমার কোন আগ্রহ নেই। দশ বছর তুমি এক বাড়িতে থেকেও আলাদা। তাহলে আমাকে নিয়ে এত জ্বলো কেন তুমি?'

'এর উত্তর আমি তোমাকে দেব না। উঃ। ছেলেমেয়েরা ভাবল তোমার মত আমারও একজন বয়ফ্রেন্ড ছিল। বুড়ো বয়সে দাঁত পড়ে গেলে লোকে মাড়ি দিয়ে চিবোয়। তুমি সেই কাজটা করলে।' নন্দিতা কান্না চাপতে চাপতে বেরিয়ে গেলেন।

নিরাপদ তাঁর যাওয়া দেখলেন। তারপর থপথপে পায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন, কি নাটক করার কথা ছিল, কি নাটক হয়ে গেল! নন্দিতা বলে গেল আমি ইচ্ছে করে ওকে অপমান করেছি। ওকে সন্দেহ করি। আমি জানতাম না। এখন মনে হচ্ছে হয়তো তাই। তাহলে আমি সত্যি কথা বলি, পাপ করিনি—এ সব বলার কোন মানে হয় না। নন্দিতা আমাকে ভালবাসে না অথচ কাউকে ভালবাসতে দেবে না। আমিও নন্দিতাকে ছেড়ে থাকতে পারব না, অসহ্য হলেও। আচ্ছা, ধরুন, না, খামোকা ধরতে যাবেন কেন, নিজের চোখেই দেখুন, আজ যে নাটকটা করার কথা ছিল তাতেই অভিনয় করছি আমরা। তবে একটু ছোট করে নিতে হচ্ছে, অনেকটা সময় চলে গেছে তো! তবে তার আগে একটু বিরতি দেব। পাঁচ মিনিটের।

নিরাপদ ইঙ্গিত করতেই পর্দা পড়ে গেল। বাইরে বেরিয়ে সিগারেট খেতে খেতে আমরা ঠিক করতে পারছিলাম না নিরাপদ পাপ করেছেন কিনা! বস্তুত সবাইকে আমাদের খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। নিরাপদ একটু ভালমানুষ, ওরকম স্বামী হলে বিয়ের কিছুদিন বাদে স্ত্রীরা একটু হম্বিতম্বি করবেনই। তবে পার্থ সান্যালের ব্যাপারটা তোলা নিয়ে আমরা দ্বিমত হলাম।

বিরতির পর মঞ্চটির কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। নন্দিতা খাবারের ব্যবস্থা করছেন। সময়টা রাত। নীপা তাকে সাহায্য করছে। নন্দিতা বললেন, 'ওদের ডাক।'

নীপা চেঁচালেন, 'খাবার দেওয়া হয়েছে।'

নিরাপদ ঢুকলেন। ধোপদুরস্ত। চেয়ার টেনে নিয়ে বললেন,

boiRboi.blogspot.com

'শ্যামল কোথায় ?'

নন্দিতা মাথা নামিয়ে বললেন, 'এই ফিরল। বাথরুমে গিয়েছে।'

'রাত সাড়ে ন'টায় বাড়ি ফেরা তুমি অ্যালাউ করছ নন্দিতা! দিস ইজ টু মাচ। কলেজে পড়া ছেলের এতখানি স্বাধীনতা আমি বরদাস্ত করব না।'

'বলি, কিন্তু শোনে না।'

নিরাপদ মাথা নেড়ে চেয়ারে বসলেন, 'আমার ওষুধটা।'

নীপা একটা কৌটো এগিয়ে দিলে তিনি সেটা থেকে ক্যাপসুল বের করে মুখে দিয়ে জল খেতেই শ্যামল ঢুকল, 'আজকের মেনু কি ?'

'চিকেন কারি, রুটি, স্যালাড আর পায়েস।'

'কাল পুডিং করো তো।' শ্যামল বলল।

'বাপের পয়সায় পায়েস পুডিং প্যাঁদাচ্ছ অথচ কোন কথা কানে যাচ্ছে না!' নিরাপদ ছেলের দিকে তাকালেন।

'তার মানে ?'

'তোমাকে বলেছি এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকবে না।'

'ইউনিয়নের কাজে দেরি হয়ে যায়।'

'ওঃ! শোন শ্যামল, এ বাড়িতে থাকতে হলে তোমাকে ইউনিয়ন ছাড়তে হবে।'

'কেন ?'

'কারণ, আমি চাই না আমার ছেলে একটা হ্যাগার্ড হোক। ময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি আর কাঁধে ব্যাগ। ভবিষ্যতের বারোটা বাজানোর পক্ষে যথেষ্ট।'

'তুমি বুর্জোয়াদের মত কথা বলছ।'

'তাই ? কোন সর্বহারা চিকেনকারি আর পায়েস খায় ?' নিরাপদ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তোমাদের সর্বহারার নেতার ছেলে তো ক্যাপিটালিস্ট!'

এইসময় দর্শকরা উসখুস করে উঠল। একজন চেঁচিয়ে উঠলো, 'পার্সোনাল অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে। নাটক বন্ধ করে দেব।'

নিরাপদ আমাদের দিকে তাকালেন, তা আপনারা পারেন। হিটলার কিংবা মুসোলিনি ডিক্টেটার ছিলেন। এখন একটা কমিটি সেই ভূমিকায় চলে গিয়েছে। কিন্তু ভাই আপনারাই তো হাসমিকে নায়ক করেছেন, খামোকা ভিলেন হবেন কেন ? আমার ছেলে আমার পয়সায় বাউণ্ডুলে-

www.boiRboi.blogspot.com

পনা করলে, তাকে বলার অধিকার আমার আছে।' নিরাপদ ছেলের দিকে মুখ ফেরালেন, 'শ্যামল, তোমার নেতাদের চেহারা ছিয়াত্তরের আগে দেখেছি।' সিড়িঙ্গে ছিল। এখন শাঁসে-জলে। দাদাদের নাম ভাইদের নামেই হয়। কোনরকমে গ্র্যাজুয়েট হও, তোমার চাকরি হয়ে যাবে। ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

শ্যামল কথা বলল না। নীপা বলল, 'বাবা, জি আর ই পাস করলে আমি আমেরিকায় যাব তো?'

নন্দিতা বললেন, 'অসম্ভব। ওসব চিন্তা মাথা থেকে ছাড়।'

নীপা বলল, 'বাবা!'

নিরাপদ বললেন, 'আগে পাস করো তারপর দেখব।'

নন্দিতা বললেন, 'তুমি ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছ! ওদেশে ও একা থাকবে?'

'একা কেন থাকবে? আমাদের বোস সাহেবের ভাই থাকেন নিউ ইয়র্কে। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর।'

'বাবা, তুমি গ্রেট।'

খেতে খেতে নিরাপদ বললেন, 'যতীন খুব ঝামেলায় পড়েছে।'

নন্দিতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কি? কেন?'

'আরে রেখে ঢেকে নে। চোখের পর্দা বলে তো একটা কথা আছে! পার্টিদের ট্রাবল দিয়ে টাকা নিলে কমপ্লেন হবে না?'

'তোমার কিছু হবে না তো গো?'

'দূর! আমি অত বোকা নাকি!'

শ্যামল উসখুস করে বলল, 'বাবা, তুমি অন্যায় করছ।'

'তা তো বলবেই। উপরির পয়সায় তুমি ফুটুনি করছ আর নিচ্ছি বলে আমার দোষ হয়ে গেল! তা ছাড়া আমি ঘুষ নিই না।'

'নাও না?'

'না। এটাকে ঘুষ বলে না। টিপ্‌স দেয়। ঘুষ নেয় বড়কর্তারা, মন্ত্রীরা। তারা দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে। সেই ক্ষমতা আমার নেই। মাংস দাও।'

নন্দিতা মাংস দিলেন। নীপা বলল, 'মা আমি পায়েস খাবো না।'

'কেন?' নিরাপদ জানতে চাইলেন।

নন্দিতা হাসলেন, 'মিষ্টি খেলে ফিগার নষ্ট হয়ে যাবে।'

'তোরা আজকাল কত কনসাস হয়ে গিয়েছিস। ওকে একটু ফল

www.boiRboi.blogspot.com

দিও নন্দিতা।'

'আচ্ছা।'

হঠাৎ নীপার মনে পড়ে গেল, 'ওই যাঃ।'

'কি হল?' শ্যামল জিজ্ঞাসা করল।

'একটা চিঠি এসেছে মায়ের নামে। দিতে ভুলে গিয়েছি।'

'কার চিঠি?'

'খুলিনি। দাঁড়াও আনছি।' নীপা উঠে দাঁড়াল।

'খাবি না?'

'আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।' নীপা বেরিয়ে গেল।

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে আবার কে চিঠি লিখল?'

'জানি না। হয়ত মেজ মাসিমা টাকা চেয়েছেন।'

'দ্যাখো। দিতে দিতে তো ফতুর হয়ে যাব।' নিরাপদ ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উপরি আছে বলে তোমার গা জ্বলে কিন্তু কত লোককে দিতে হয় তার খবর রাখো? ননসেন্স। শ্যামল, একটু প্রাকটিক্যাল হও।'

নীপা ফিরে এল রঙিন খাম হাতে।

নন্দিতা বললেন, 'খুলে পড় না।'

নীপা খামটা ছিঁড়ল। তারপর ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও মা, নিউ জার্সি থেকে লিখেছে। সুচরিতাসু, আশা করি ভাল আছ। আমাকে তোমার মনে রাখার কথা নয়। আড়িয়াদহে তোমাদের পাড়ায় আমি থাকতাম। তোমাদের বিয়ের সময় আমি বেকার ছিলাম। তারপর ঘটনাচক্রে আমেরিকায় আসি। এখন ব্যবসাপত্তর করে আমি সচ্ছল। দেশে যাইনি আঠাশ বছর। সম্প্রতি আমার বোন ভগ্নিপতি আমার কাছে বেড়াতে এসেছিল। তাদের কাছে তোমার ঠিকানা পেলাম। আমি এই মাসে দেশে যাচ্ছি। সবার সঙ্গে দেখা করব। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। যদি আপত্তি থাকে তাহলে আড়িয়াদহের ঠিকানায় জানিয়ে দিও। তরুণ বয়সে বিরক্ত করতাম বলে ক্ষমা চেয়ে আসব। আপত্তি থাকলে যাব না। আশা করি তোমার স্বামী অখুশী হবেন না। শুভেচ্ছা সহ, পার্থ সান্যাল।'

'লোকটা কে মা?' শ্যামল জানতে চাইল।

'বাজে লোক। আমি যখন ক্লাস টেনে পড়তাম তখন রকে বসে

www.boiRboi.blogspot.com

খুব আওয়াজ দিত। গায়ে পড়ে কথা বলতে চাইত। আমি পাত্তা দিইনি।'

নীপা হাসল, 'রকবাজ রোমিও?'

'ইয়ার্কি মারিস না। তুই লিখে দে আসার দরকার নেই।'

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?'

'বাঃ। চিনি না জানি না, এখানে এসে কি করবে?'

'তুমি চেন না! তোমাকে তো চেনেন। আঠাশ বছর বিদেশে আছেন, দেশে এসে সবার সঙ্গে কথা বলতে তো ইচ্ছে করবেই।

নীপা বলল, 'তা ছাড়া নিউ ইয়র্কে থাকেন, আমার উপকার হতে পারে।'

নন্দিতা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না। সে এ বাড়িতে আসবে না।'

নীপা বলল, 'কেন? তুমি মিছিমিছি রাগ করছ।'

নিরাপদ হাসলেন, 'নীপা ঠিকই বলছে।'

নন্দিতা আচমকাই চলে গেলেন ঘর ছেড়ে। নিরাপদ বললেন, 'তোদের মা ভাল অভিনেত্রী নয়, বুঝলি!'

শ্যামল বলল, 'মায়ের পরিচিত এবং মা আপত্তি করছে যখন, তখন ভদ্রলোকের আসা উচিত নয়। তোমরা যে যাই বল।'

দৃশ্য পরিবর্তন হল। কথাটা ঠিক বলা হল না। ঘর এক রইল শুধু সময় পাল্টে গেল। এখন সকাল। নিরাপদ খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আর তখনই বেল বাজল। নিরাপদ চেঁচালেন 'কে এল দ্যাখ।'

শ্যামলের গলা পাওয়া গেল, 'নীপা দ্যাখ।'

একটু বাদে নীপার গলা, 'কাকে চান?'

'নন্দিতা আছেন?'

'হ্যাঁ। উনি রান্না করছেন। আপনি?'

'তুমি নন্দিতার মেয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি পার্থ সান্যাল। আমেরিকা থেকে আসছি।'

'ও। আসুন আসুন। আমরা আপনার চিঠি গতকাল পেয়েছি।'

নীপা ঘরে ঢুকল এক চকচকে প্রৌঢ়কে নিয়ে, 'আমার বাবা। বাবা, ইনি পার্থ সান্যাল।'

www.boiblogspot.com

নিরাপদ নমস্কার করলেন। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নিরাপদকে জড়িয়ে ধরলেন, 'অনেকদিন বাদে দেশে এলাম। আপনাদের বাড়িতে এসেছি বলে কিছু মনে করেননি তো ?'

নিরাপদ হাসলেন, 'না না, মনে করব কেন ?'

'আমি পার্থ সান্যাল। কুইনসে থাকি। ব্যবসা করি। আপনি ?'

'আমি নিরাপদ মিত্র। সরকারি চাকরি করি।' নিরাপদর গলা মিনমিনে শোনাল। নীপা বলল, 'বসুন।'

পার্থ বললেন, 'দেশে তো আসাই হয় না। তুমি কি কর ?'

'পড়ি। এম. এ. দিচ্ছি। জি আর ই দিয়েছি।'

'তাই ? আমেরিকায় যাওয়ার ইচ্ছে আছে নাকি ?'

'যদি সুযোগ পাই—।'

'আলবাত পাবে। আমি আছি ওখানে। আমার কাছে উঠবে। তোমরা কয় ভাই বোন ?'

'দুই ভাই বোন। মা, মাগো, মা এদিকে এসো।'

নন্দিতা এলেন। একপাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়ালেন। পার্থ তাঁর দিকে অবাক চোখে তাকালেন, 'আমাকে চেনা যাচ্ছে ?'

মাথা নাড়লেন নন্দিতা, 'না।'

'আমার ভাইই চিনতে পারেনি। বলল, দাদা তুই এত ফর্সা, মোটা আর টাক ফেলেছিস মাথায় যে, চেনা যায় না। তবে চেহারা দেখছি খুব একটা বদলায়নি। সামান্য মোটা, সেটা স্বাভাবিক। তবে মেয়ে একদম মায়ের ধাত পেয়েছে।'

'আপনি তো আমার আগে ওকে দেখেছেন।' নিরাপদ বললেন।

'দূর মশাই দূর থেকে দেখতাম। কথা বলার চান্স দিত নাকি! ওহো, তোমার নাম কী যেন!'

'নীপা।'

'হ্যাঁ, নীপা, এই নাও।' পার্থ সান্যাল অ্যাটাচি কেস খুললেন। একে একে বিদেশি পারফিউম, আফটার শেভিং লোশন, চুল শুকোবার ব্লোয়ার বের করে টেবিলে রাখলেন, এসব তোমাদের জন্যে।'

নীপা বলল, 'সব ?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ নন্দিতা বললেন, 'না। ওগুলো আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।'

www.boiRboi.blogspot.com

'কেন ?' পার্থ সান্যাল অবাক।

'আপনার সঙ্গে আমাদের তেমন কোনও সম্পর্ক নেই যে, ওগুলো নেওয়া যেতে পারে !'

'আমি কিন্তু একদম সরল মনে এনেছি।' পার্থ সান্যাল বললেন।

'ঠিকই করেছেন।' নিরাপদ কথা বললেন, ভালবেসে কেউ কিছু দিলে নিতে হয়।'

'থ্যাঙ্কু মিস্টার মিত্র। আজ আমাকে উঠতে হচ্ছে !'

'সে কি ! চা খেয়ে যাবেন না ?' নিরাপদ জিজ্ঞাসা করল।

'নাঃ। আমি কাল দিল্লি যাচ্ছি। ওখান থেকেই ফিরে যাব। আজ বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। নীপা, আমার কার্ডটা রাখো। যদি ওদেশে পড়তে যাও একটা চিঠি আগেভাগে পোস্ট করো। তারপর তোমার সব দায়িত্ব আমার।' পার্থ উঠলেন। কার্ডটা টেবিলে রাখলেন।

নিরাপদ বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভাল লাগল।'

'একই কথা আমিও বলছি। আচ্ছা, আপনাদের ছেলেকে দেখলাম না ?'

নিরাপদ নীপাকে বললেন, শ্যামলকে এ ঘরে আসতে বলো।'

নীপা চলে গেল। পার্থ সান্যাল একটু ইতস্তত করে বললেন, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে পারছি না। আমার চিঠি পেয়ে অথবা আমি এ বাড়িতে আসায় আপনাদের মনে কোনও প্রশ্ন দেখা দেয়নি ?'

নন্দিতা অন্য দিকে মুখে ফেরালেন। নিরাপদ হাসলেন, 'না, না। আপনারা এক পাড়ায় থাকতেন, আলাপ পরিচয় ছিল, এতকাল বাদে দেশে ফিরছেন, দেখা করতে আসাটা স্বাভাবিক ভদ্রতার মধ্যেই পড়ে। তাই না ?'

মাথা নাড়লেন পার্থ সান্যাল, 'না। আপনি ঠিক জানেন না।'

'বুঝলাম না।'

'নন্দিতার সঙ্গে আমার কখনও কথাবার্তাই হয়নি। আমি যে ওঁর নাম ধরে কথা বলছি, সেটা বয়সের অ্যাডভাণ্টেজ থেকে।'

'আচ্ছা !'

'আমার এখানে আসার কারণ এক ধরনের কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'কৃতজ্ঞতা ?' নিরাপদ স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ। আমি খুব সাধারণ ছেলে ছিলাম। রকে আড্ডা মারতাম আর মেয়েদের দেখলে টিটকিরি মারতাম। ওইভাবে আর কিছুকাল চললে এদেশের আর একজন ব্যর্থ নাগরিক হওয়া ছাড়া আমার কপালে অন্য কিছু ঘটত না। তা নন্দিতাকে দেখে ওর সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করল। যেচে কথা বলতে গিয়ে দেখলাম, ও ঘৃণা বা অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। সেদিন ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিলাম। বুঝতে পারলাম আমাকে একজন ভাল মেয়ে কী চোখে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমাকে বড় হতে হবে। যোগ্য হতে হবেই। ওই ধাক্কা আমাকে তাড়িয়ে বেড়াতে বেড়াতে শেষপর্যন্ত আমেরিকায় পৌঁছে দিল। তারপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। আপনার স্ত্রী না জেনে আমার বিরাট উপকার করেছিল। জানি এভাবে আসা ঠিক নয়, তবু না এসে পারলাম না।'

'আপনি কি একা এসেছেন ?' নিরাপদ জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ। আমার বৃদ্ধা মা আমার কাছেই আছেন। উনি আসতে চাইলেন না।'

'আপনার স্ত্রী ?'

'কপালে নেই মশাই। এক বঙ্গললনাকে বিয়ে করেছিলাম তিনি অকালে চলে গেলেন।' পার্থ সান্যাল ম্লান হাসলেন। নীপা এবং শ্যামল ঢুকল।

নীপা বলল, 'ও আমার চেয়ে দু' বছরের ছোট। ওর নাম শ্যামল।'

'আচ্ছা ! কি পড় তুমি ?'

'কলেজে পড়ছি।'

নীপা হাসল, 'বামপন্থী ইউনিয়ন করে।'

'আচ্ছা ! এই যে বুশ সাহেব হারলেন। দেশজুড়ে নির্বাচন হল। ওই সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া দেশে নীরবে ব্যালট বাক্সে বিপ্লব হয়ে যায়। তোমরা কি বল ?'

'আমাদের কাছে বুশ বা ক্লিন্টন-এর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।'

'ঠিক। এখন পৃথিবীতে যারা রাজনীতি করে তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সবাই কিছু পাওয়ার জন্যে করে। আচ্ছা, চলি। নমস্কার মিস্টার মিত্র। নন্দিতা, নীপা এলাম।' পার্থ সান্যাল

www.boiRboi.blogspot.com

হাসিমুখে বিদায় নিলেন।

শ্যামল বলল, 'এইসব জিনিস ওই লোকটা এনেছে?' সে টেবিলের দিকে তাকিয়েছিল।

নীপা বলল, 'হ্যাঁ। লোকটা বলছিস কেন?'

'ঘুষ দিয়ে গেল।'

নিরাপদ হঠাৎ ধমকে উঠলেন, 'শ্যামল!'

শ্যামল অবাক হয়ে তাকাল। নিরাপদ রাগত গলায় বললেন, 'একজন ভদ্রলোক ভাল মনে উপহার দিয়ে গেলেন আর তুমি তাকে ঘুষ বলছ?'

'কেউ এমনি এমনি উপহার দেয় না।'

'তোমরা তা হলে এমনি এমনি কিউবার জন্যে সাহায্য সংগ্রহ করছ না?'

'বাবা, দুটো ব্যাপার এক করো না। আমেরিকা যাকে এক্সপ্লয়েট করছে আমরা তার পাশে দাঁড়াচ্ছি। পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত মানুষ এখন এক প্লাটফর্মে।' শ্যামল চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে থেকে নিরাপদ বললেন, 'আর কদিন পরে বুঝবে। সবে দাঁত গজালে খুব সুড়সুড় করে। নীপা, এগুলো ভেতরে নিয়ে যা।'

'আমি এই পারফিউমটা নিচ্ছি।'

'ঠিক আছে। শোন, ওই আফটার শেভ লোশনটা শ্যামলের টেবিলে রেখে দিবি।' ঘাড় নেড়ে নীপা উপহারগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ঘরে এখন নন্দিতা আর নিরাপদ। আমরা নন্দিতাকে চুপচাপ কাঁদতে দেখলাম। ওঁর পাশে এসে নিরাপদ সেটা বুঝতে পারলেন, 'একি! তুমি কাঁদছ?'

নন্দিতা হঠাৎই স্বামীর হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'আমার ভীষণ ঘেন্না করছে।'

'ঘেন্না?'

'ওই লোকটা আমাকে অপমান করে গেল।'

'কি যা-তা বলছ?'

'যাকে আমি অবজ্ঞা করতাম তার দান নিলে তোমরা!'

'আঃ, এভাবে ভাবছ কেন!'

'কিন্তু শ্যামল বলল, এমনি এমনি কেউ কাউকে উপহার দেয় না।

www.boiRboi.blogspot.com

শোন, তুমি আমাকে সন্দেহ করছ না তো। বিশ্বাস করো, ওর সঙ্গে আমি কখনও কথা বলিনি।'

'ইটস অলরাইট। তিরিশ বছর আগে তুমি কি করেছ, তাতে আমার বিন্দুমাত্র যায় আসে না। উনি আসায় আমাদের বরং উপকার হল।'

'তার মানে?'

'নীপার একটা চ্যানেল তৈরি হয়ে গেল। আর আমরা জানলাম তোমার একজন ভাল বন্ধু আছে। ইটস অলরাইট।'

নন্দিতা উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি স্পষ্ট বল, আমাকে বিশ্বাস করছ?'

'না করে উপায় আছে?'

'তার মানে?'

'সকাল দুপুর বিকেল কাটিয়ে দিয়েছি। এখন এই সন্ধ্যেবেলায় এসে তোমাকে অবিশ্বাস করলে আমি যে একা হয়ে যাব নন্দিতা। ছেলেমেয়েরা যে যার মত জীবন কাটাবে। রাত নেমে আসা পর্যন্ত সময়টায় আমাদের একসঙ্গে থাকা দরকার। অবিশ্বাসে জ্বলেপুড়ে মরার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকাও ঢের ভাল। তাই না?'

নন্দিতা অবাক হয়ে স্বামীর দিকে তাকালেন। তারপর মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিরাপদ তাঁর যাওয়া দেখলেন। এবার এগিয়ে এলেন মঞ্চের সামনে। হাতজোড় করে বললেন, 'ভদ্রজনেরা, এটা নাটক। সময়াভাবে ছোট করে নিয়েছি। এই নাটকের আমি সৎ নই, ঘুষ নিই, দাপটে থাকি। তবু নন্দিতা আমার কাছে জানতে চাইছে, আমি তাকে সন্দেহ করি কিনা! বিশ্বাস করুন আমি নিজেই সেটা বুঝতে পারছি না। সৎ বা অসৎ যে কোনও জীবন যাপনের পরে একটা সময় আসে, যখন পুরুষ মানুষ একা হয়ে যায়। মেয়েরা হয় কিনা জানি না। তখন সব কিছু মানিয়ে নিতে হয়। মেনে নিতে হয়। শান্তি না হোক স্বস্তি হবে তাতে। এটুকুই বা কম কী!'

নিরাপদ ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গেলেন। পর্দা পড়ল না আলো জ্বলে উঠল।

—

www.boiRboi.blogspot.com